প্রথম প্রকাশ
১ ফেব্রুআরি ১৯৭২
১৩ ফাল্গুন ১৩৭৯



প্রকাশক : চিত্তরঞ্জন সাহা, মুক্তধারা [স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ], ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১। মুদ্রণ : প্রভাংশুরঞ্জন সাহা, ঢাকা প্রেস, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১, বাংলাদেশ। প্রচ্ছদ : আবুল বারক আলভী। [স্ব] জীনান শম্পা।

সূচীপত্র

১ কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার

শরৎ চন্দ্র কোঙার এবং সত্যবালা দেবীর জ্যেষ্ঠ্য পুত্র হরেকৃষ্ণ কোঙার ১৯১৫ সালের ৫ই আগস্ট বর্ধমান জেলার রায়না থানার কামারগড়িয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার সহিত কোঙার অল্প বয়সেই মেমারী থানার দক্ষিণ রাধাকান্তপুর গ্রামে চলে আসেন এবং সেখানেই লেখাপড়া শুরু করেন। মেমারী বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দিরের নবম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র কোঙার ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে ৬ মাস কারাদন্ড ভোগ করেন। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করে তিনি কলকাতার বংগবাসী কলেজের ছাত্র থাকাকালীন ১৯৩২ সালে একটি মামলায় গ্রেপ্তার হন এবং ৬ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ১৯৩৩ সালে আন্দামানের সেলুলার জেলে নির্বাসিত হন।

১৯৩২ সালে গ্রেপ্তারের আগেই কমরেড আবদুল হালিম, কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি, ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখের সংগে কোঙারের পরিচয় হয়। আন্দামান জেলে তিনি কমরেড সতীশ পাকড়াশী, নারায়ণ রায়, নিরঞ্জন সেন প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন এবং কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনে যোগদান করেন। ১৯৩৮ সালে জেল থেকে মুক্ত হয়ে কোঙার কমরেড মুজফ্ফর আহমদ ও কমরেড আবদুল হালিমের সংগে যোগাযোগ করেন, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন এবং পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই পর্য্যায়ে তিনি প্রথমে হাওড়া ও কলকাতা জেলায় শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় হন এবং কয়েক মাস পরে কমরেড বিনয় চৌধুরী কমরেড কোঙারকে ১৯৩৮ সালের শেষাশেষি বর্ধমান জেলায় নিয়ে আসেন ও মূলতঃ কৃষক আন্দোলন গড়ার কাজে সচেষ্ট হন।

১৯৩৯ সালে বর্ধমান জেলার ক্যানেল কর বন্ধের আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন।

১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে কমরেড কোঙার প্রথমে আসানসোল—বার্ণপুর এলাকা থেকে এবং পরে বর্ধমান জেলা থেকে বহিস্কৃত হন। তৎসত্ত্বেও তিনি আত্মগোপন করে বর্ধমান জেলাতেই কাজ করতে থাকেন এবং একবার গ্রেপ্তার হয়ে কয়েক মাস কারাবাস করেন।

১৯৪৩ সালে তিনি একটি মামলায় গ্রেপ্তার হন এবং জামিনের

শর্ত অনুযায়ী বর্ধমান শহরের বাইরে যাওয়া তাঁর নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৩-৪৪ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ের অজয় বাঁধ আন্দোলনে, ১৯৪৬-৪৭ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্যানেল আন্দোলনে কমরেড কোঙার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে আসানসোলে কলিয়ারি এলাকায় নির্বাচনী কাজে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে তিনি শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং তাঁর পা ভেঙে যায়।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার সংগে সংগেই তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ৩ মাস জেলে থাকার পর মুক্ত হয়েই আত্মগোপন করেন। এইভাবে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি মুখ্যত: কলকাতা, বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। এই সময় আউসগ্রাম এলাকায় তিনি আবার শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং তাঁর কয়েকটি দাঁত ভেংগে যায় ও কান জখম হয়।

১৯৫৩ সালে খাদ্য মিছিল নিয়ে হাওড়া স্টেশনে পেঁীছানোর সংগে সংগে তিনি গ্রেপ্তার হন। এর পর ১৯৫৭ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি গ্রেপ্তার বরণ করেন।

১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় তিনি ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে ১ বছর, ১৯৬৪ সালে পুনরায় ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে প্রায় দেড় বছর জেলে আটক থাকেন।

১৯৫৭ সাল থেকে কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং ১৯৬৪ সাল থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ছিলেন এবং ১৯৬৪ সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কমরেড কোঙার ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদক এবং ১৯৬৮ সাল থেকে আমৃত্যু ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার সভাপতি।

১৯৫৪ সাল থেকে তিনি সারা ভারত কৃষক সভার কেন্দ্রীয় কৃষক কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ১৯৬৮ সালে যখন কমরেড কোঙার আত্মগোপন করে কাজ করছিলেন, তখন তিনি সারা ভারত কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং সেই পদেই শেষ পর্যন্ত আসীন থাকেন।

কমরেড কোঙার ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় এবং ১৯৬৯-৭০ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় তিনি ছিলেন ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি-আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয় এবং খেতমজুর-কৃষকের সেই ঐতিহাসিক গণ-জাগরণে তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

১৯৬০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একজন প্রতিনিধি হিসাবে কমরেড কোঙার ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং চীন ভ্রমণ করেন। ১৯৭০ সালে সাইপ্রাসের নিকোসিয়ায়, ১৯৭১ সালে ইতালির রোমে, ১৯৭২ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগে, ১৯৭৩ সালে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বার্লিনে আন্তর্জাতিক কৃষি, বন ও বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রশাসনিক কমিটির সভায় তিনি যোগদান করেন।

২ সংশোধনবাদ ও মার্কসবাদের মধ্যে ঐক্য হতে পারে না

সাম্রাজ্যবাদের নয়া ঔপনিবেশিক নীতি এবং দেশের ধনতান্ত্রিক বিকাশের পটভূমিকায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বুর্জোয়া প্রভাব দীর্ঘদিন ধরে ধাপে ধাপে পুষ্টিলাভ করেছে এবং পার্টির মধ্যে মার্কসবাদ বর্জনকারী এক সংশোধনবাদী-গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে। এক দিকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে শক্তিশালী সংশোধনবাদের আবির্ভাব ও অন্যদিকে পার্টির মধ্যে মার্কসবাদী আদর্শগত সংগ্রামের দুর্বলতা—এই উভয় ঘটনা উপরোক্ত বুর্জোয়া প্রভাব ও সংশোধনবাদী-গোষ্ঠীকে বিপজ্জনকভাবে শক্তিশালী করে তুলেছে এবং পার্টি নেতৃত্ব দখল করতে সাহায্য করেছে। দেশের মধ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং শাসকশ্রেণী কর্তৃক উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচারের মুখে এই সংশোধনবাদী-গোষ্ঠী আরো নীচে নেমে নিজেদের বুর্জোয়া লেজুড়ে পরিণত করেছে; তারা মার্কসবাদের সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। ১৯৫৭ সালের মস্কো ঘোষণা ও ১৯৬০ সালের মস্কো বিবৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়েছে এবং শাসকশ্রেণীর নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছে।

গত দেড় বৎসরের ইতিহাস

কমরেড লেনিনের মতে সংশোধনবাদী চক্র হোল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া বাহিনী। ধনিকশ্রেণীর নিজেদের লোক অপেক্ষা এরা অনেক সময় ভালভাবে বুর্জোয়া স্বার্থরক্ষা করে। এরা মুখে মার্কসবাদের কথা বলে ও জনগণের দাবি-দাওয়া নিয়ে কিছু সংস্কারবাদী আন্দোলন করে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখে এবং তাকে ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গত দেড় বৎসরের ইতিহাস সংশোধনবাদ সম্বন্ধে এই বক্তব্যের যথার্থ প্রমাণিত করেছে। বিভিন্ন বিষয়ে শাসক চক্রের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করা, যে সব মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সংশোধনবাদী নীতির বিরোধীতা করেছে ও করছে তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করা, কার্যত কোন বন্দী মুক্তি আন্দোলন না করা এবং অন্যরা এইরূপ আন্দোলন করলে পার্টি শৃংখলার নামে তার বিরোধিতা করা, তাদের শাস্তি দেওয়া, পার্টির মধ্যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতিকে বর্জন করে পার্টি যন্ত্রকে কুক্ষিগত করা এবং জোর করে পার্টির মধ্যে সংশোধনবাদী নীতি চাপিয়ে দিয়ে পার্টিতে

জাগন সৃষ্টি করা প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে এই সংশোধনবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে। কমিউনিস্ট পার্টি যথার্থ্য কমিউনিস্ট পার্টি থাকতে পারে একমাত্র মার্কসবাদের ভিত্তিতে, পার্টির ঐক্য একমাত্র এই ভিত্তিতেই হতে পারে। তাই, মার্কসবাদ ছেড়ে দিলে এবং মার্কসবাদকে রক্ষার জন্য যারা সংগ্রাম করে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে সেই সংগে পার্টিকে ভাঙা হয়। সংশোধনবাদী-গোষ্ঠী তাই করেছে। কিন্তু সরকারী দমণনীতি সত্ত্বেও প্রকৃত কমিউনিস্টরা এই সবের নিকট আত্মসমর্পণ করেনি, বরং তাঁরা মার্কসবাদ ও পার্টিকে রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে এবং তারই মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী শক্তিকে সংহত করেছে।

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির গত জানুয়ারী মাসের সভায় সংশোধনবাদ ও মার্কসবাদের মধ্যে সংগ্রাম আরো স্পষ্ট ও তীব্র হয়েছে। প্রতিটি প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দুই পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার সংঘাত ঘটেছে। এই সভায় সংশোধনবাদীদের চরিত্র আরো নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে। তাদের দুটি উদ্দেশ্য পরিষ্কার দেখা গেছে। একটি হোল বুর্জোয়া অনুচর-বৃত্তি ও শাসকশ্রেণীর সংগে রাজনৈতিক সহযোগিতা। অন্যটি হোল পার্টি যন্ত্রের ওপর নিজেদের আধিপত্যকে উপদলীয়ভাবে কাজে লাগিয়ে হাজার হাজার পার্টি সভ্যকে বাদ দিয়ে বে-আইনী ও কৃত্রিমভাবে নিজেদের মিথ্যা সংখ্যাধিক্য সৃষ্টি করে পার্টি কংগ্রেস করা এবং এইভাবে পার্টিকে ভাঙার পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হওয়া। নীচের ঘটনাগুলি হতে তা বোঝা যাবে।

তামিলনাডুর ঘটনা

তামিলনাডু পার্টির সংশোধনবাদী নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত করে যে শ্রীকামরাজের ব্যক্তিত্বের ফলে শাসক পার্টি কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্ত ঘাঁটি গাড়তে পারে নাই, মূলতঃ তামিলনাডু কংগ্রেস গণতান্ত্রিক শক্তির আধার। তারা আরও ঠিক করে যে যদিও ডি. এম. কে. পার্টি গণতান্ত্রিক দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে ও পৃথক দ্রাবিড়িস্তানের দাবি ছেড়ে দিয়েছে, তবুও আসলে এটা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং স্বতন্ত্র পার্টি ও মুসলিম লীগের সংগে সমঝোতা করে, এই পার্টি এক চরম বিপজ্জনক জোট সৃষ্টি করেছে। তাই, পার্টির রাজ্য কমিটি স্থির করেছিল, যে কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে কংগ্রেসের সংগে কার্যতঃ মিতালী করে এই জোটের হাত হতে "গণতন্ত্র রক্ষা" করতে হবে। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে এটা যে আসলে কংগ্রেসের নির্লজ্জ অনুচর-বৃত্তি তা কার্য ক্ষেত্রে দেখা

গেছে। মাদ্রাজ সহরের আগের কর্পোরেশনে ১০০ জন কাউন্সিলারের মধ্যে ৪ জন পার্টি সদস্য ও ১ জন দরদী নিয়ে কমিউনিস্ট গ্রুপ ছিল। এই দরদী কমরেড কৃষ্ণমূর্তি হলেন মাদ্রাজ প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের সহ-সভাপতি এবং তিনিই ছিলেন কমিউনিস্ট গ্রুপের নেতা। বাৎসরিক মেয়র নির্বাচনে প্রথা হিসাবে এবারে জনৈক ব্রাহ্মণের মেয়র হবার কথা ছিল। ডি. এম. কে. কৃষ্ণমূর্তিকে সমর্থন করে মেয়র করতে চায় এবং তা সম্ভবও ছিল। কিন্তু "গণতন্ত্র রক্ষার" নামে সংশোধনবাদী পার্টি নেতৃত্বের আদেশে পার্টির কাউন্সিলাররা কৃষ্ণমূর্তির বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দিয়ে মেয়র নির্বাচন করে এবং পার্টি দৈনিক "জনশক্তি" তাকে গণতন্ত্রের জয় বলে জাহির করে। পরবর্তী কর্পোরেশন ও বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে এই অনুচর বৃত্তি নীতিকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

মাদ্রাজ সহরে কংগ্রেসের সম্মতিতে পার্টি মাত্র ৪টি আসনে প্রার্থী দিয়ে বাকী আসনে কংগ্রেসের ভলান্টিয়ারী করে। কিন্তু যে সব মিউনিসিপ্যালিটিতে (যেমন মাদুরাই, কোয়েম্বাটুর) আমরা ভাল শক্তিশালী ছিলাম সেখানে কংগ্রেস আমাদের বিরুদ্ধে লড়ে। ফলে মাদ্রাজে আমরা মাত্র ১টি (১০০ এর মধ্যে) পেয়েছি এবং অন্যান্য সর্বত্র আমরা দুর্বল হয়েছি। তামিলনাডু সংশোধনবাদী নেতৃত্বের এই আত্মবিলোপকারী বুর্জোয়া লেজুড়-বৃত্তি নীতির বিরোধিতা করে এবং আরো আলোচনা সাপেক্ষে স্বাধীনভাবে নির্বাচন সংগ্রাম পরিচালনার দাবি করে পার্টির "বামপন্থী" নেতারা কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতিতে প্রস্তাব আনেন, কিন্তু কমিটির সংখ্যাধিক সংশোধনবাদীগণ ভোটের জোরে তা হারিয়ে দিয়ে তামিলনাডু শাখার লেজুড়-বৃত্তি নীতিগতভাবে সমর্থন করে প্রস্তাব পাস করেন। সংশোধনবাদীরা পার্টিকে কোন্ পথে নিয়ে যেতে চান তা এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই নীতি শুধু মার্কসবাদ-বিরোধীই নয়, ইহা পার্টি কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্তেরও বিরোধী। তাই তামিলনাডুর মার্কসবাদীরা এই পার্টি বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন। অন্য দিকে মার্কসবাদের সমর্থনে দাঁড়ানোর "অপরাধে" তামিলনাডুর সংশোধনবাদী চক্র এঁদের বিরুদ্ধে শৃংখলাভঙ্গের অভিযোগ আনছে।

দক্ষিণ পন্থীদের কৌশল

মার্কসবাদ ও তার ভিত্তিতে পার্টি ঐক্য রক্ষা জরুরী হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতিতে "বামপন্থীরা" এক দলিল পেশ করে দেখান যে, দক্ষিণপন্থীরা শুধু পার্টি নীতিকেই বিসর্জন করেন নাই বিভিন্ন প্রদেশে

তাঁরা নানা অ-গণতান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারমূলক ও উপদলীয় সাংগঠনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে পার্টিকে ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। কার্যতঃ পার্টি আজ দ্বিধা-বিভক্ত। এই অবস্থায় "বামপন্থীরা" দাবি করেন—যে অবিলম্বে এই উপদলীয় পদ্ধতি বন্ধ করা হোক, পার্টিতে যখন গুরুতর ও মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, তখন গায়ের জোরে কোন আদর্শগত ও রাজনৈতিক মত না চাপিয়ে সমগ্র পার্টির মধ্যে অবাধ আলোচনা হোক, কালবিলম্ব না করে জুন-জুলাইয়ের মধ্যে পার্টি-কংগ্রেস ডাকা হোক এবং ইতিমধ্যে আশু কাজকর্ম সমঝোতার ভিত্তিতে চালানো হোক। দক্ষিণপন্থীরা এই ন্যায়সঙ্গত দাবিকে বাতিল করে দিয়েছেন এবং আগামী অকটোবরে পার্টি কংগ্রেস ডাকা হবে বলে কালহরণের নীতি গ্রহণ করেছেন। যে ভিত্তিতে এই পার্টি কংগ্রেস ডাকা হবে বলে তাঁরা স্থির করেছেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মার্কসবাদী-দের বিরুদ্ধে আক্রমণকে তীব্রতর করা ও পার্টিকে ভাঙ্গাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

জরুরী অবস্থা ও দমণনীতির মধ্যে পার্টির কাজ স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে না ও কার্যতঃ তা পারে নাই। হাজার হাজার পার্টি সভ্যের চাঁদা ঠিকমত আদায় করা হয় নাই, আবার অনেক ক্ষেত্রে চাঁদা দিলেও নানা অজুহাতে দক্ষিণপন্থীরা (সর্বত্র পার্টি যন্ত্র তাঁদের দখলে ছিল) হাজার হাজার সভ্যকে তালিকা হতে বাদ দিয়েছেন। বাংলাদেশে এটা ব্যাপকভাবে করা হয়েছে। কিন্তু শুধু এখানে নয়, সর্বত্রই হয়েছে। আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে এমনও দেখা যাচ্ছে—যে জরুরী অবস্থার মধ্যেও পার্টি সভ্য তালিকাকে শতকরা ৫০ ভাগ বা আরও বেশী বাড়ানো হয়েছে। এমনি নূতন সভ্য নিয়েও বর্তমানে খাতায়-কলমে মাত্র ১ লাখ ৩০ হাজারের মত সভ্যকে স্বীকার করা হচ্ছে, যেখানে আগে ছিল প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার। এমনি ভিত্তিতে কোন পার্টি কংগ্রেস হলে তা মোটেই গণতান্ত্রিক হবে না, তা হবে বে-আইনী ও উদ্দেশ্যমূলক।

তাই "বামপন্থীরা" ন্যায়সঙ্গতভাবেই দাবি করেছিলেন—যে পুরাতন পার্টি সভ্যদের কোন নামমাত্র আনুষ্ঠানিক অজুহাতে বাদ দেওয়া যাবে না, চাঁদা বাকী থাকায় যাদের বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের চাঁদা দেবার জন্য এক মাস সময় দিতে হবে। যে সব এলাকায় নূতন সভ্য সংগ্রহ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠবে সেখানে উভয় পক্ষের মিলিত কমিশনের দ্বারা তার তদন্ত করতে হবে। এইভাবে প্রকৃত পার্টি সভ্য তালিকার ভিত্তিতে পার্টি কংগ্রেস করতে হবে। কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা এই প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছেন। শুধু বিশেষ বিশেষ সভ্যের ক্ষেত্রে তাঁরা বলেছেন নিজেরা পুনর্বিবেচনা করবেন।

এই সিদ্ধান্তকে শুধুমাত্র একটি সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত হিসাবে দেখলে ভুল হবে। এর অর্থ হোল কৃত্রিম সংখ্যাধিক্য সৃষ্টি করে পার্টি যন্ত্রকে

স্থায়ীভাবে কুক্ষিগত রাখা, সংশোধনবাদকে বিধিসম্মত করা এবং মার্কসবাদী শক্তিকে ছত্রভঙ্গ করা। রাজনৈতিক ও আদর্শগত ক্ষেত্রে বুর্জোয়া অনুচরবৃত্তির আনুষঙ্গিক হিসাবে সংগঠনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে বুর্জোয়া দুর্নীতির পথই সংশোধনবাদীরা গ্রহণ করেছে। এই অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে মার্কসবাদকে রক্ষা করার গুরু দায়িত্ব আজ সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের বহণ করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে পার্টি গঠনতন্ত্র অমান্য করে বে-আইনীভাবে পার্টির রাজ্য পরিষদকে বাতিল করে এক ক্ষুদ্র সংশোধনবাদী-গোষ্ঠীকে পি. ও. সি. নামে এখানে চাপানো হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ কমরেডগণ শাসকশ্রেণীর কুৎসা ও দমননীতি উপেক্ষা করে এই বে-আইনী পি. ও. সি-কে বর্জন করেছেন এবং মার্কসবাদ ও পার্টি গণতন্ত্র রক্ষার জন্য প্রশংসনীয় সংগ্রাম করেছেন। তারই জন্য সংশোধনবাদীদের পক্ষে পি. ও. সি.-কে স্থায়ী করা সম্ভব হয় নাই, যদিও পি. ও. সি. নেতারা তাই চেয়েছিলেন। সাধারণ কমরেডদের তীব্র বিরোধীতার জন্যই এখানে পাঞ্জাবের মত তথাকথিত বিশেষ সম্মেলন করে নিজেদের মনোমত মাইনরিটিকে মেজরিটিতে পরিণত করে তাঁরা স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারেন নাই। তাই কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সভায় সংশোধনবাদীরা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পরিষদকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু, এই স্বীকৃতির মূল্য স্বরূপ তাঁরা চেয়েছিলেন, যে রাজ্য পরিষদ সাধারণ কমরেডদের গত এক বছরের মাকর্সবাদী কাজকে নিন্দা করুক, লক্ষ মানুষের জমায়েতের সংগঠক গণতান্ত্রিক কনভেনশনকে নিন্দা করুক, অর্থাৎ সংশোধনবাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করুক। স্বভাবতঃই রাজ্য পরিষদ তা মেনে নিতে পারেন নাই, ভারতের মার্কবাদীরা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ কমরেডরা এই আশাই করেছিলেন, যে রাজ্য পরিষদ সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদীদের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে।

কিন্তু রাজ্য পরিষদের কিছু কিছু নেতা মুখে নিজেদের বামপন্থী বললেও বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে "বামপন্থীদের"—বিরোধিতা করে ও সংশোধনবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে এই আশাকে বানচাল করে দিচ্ছেন। সংশোধনবাদ যখন প্রধান ও মারাত্মক বিপদ হিসাবে পার্টির ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সর্বনাশ করছে, তখন কোন অজুহাতে তাকে পুষ্ট করা বা তার সঙ্গে সহযোগিতা করা নিছক সুবিধাবাদী দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এই পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নতুন জটিলতা ও বাধা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ

নাই যে এখানের মার্কসবাদীরা এই জটিলতা ও বাধাকেও অতিক্রম করে এগিয়ে যাবেন।

পাঞ্জাবে

পাঞ্জাবে নির্বাচিত রাজ্য পরিষদের জনপ্রিয় নেতাদের গ্রেপ্তারের পর সংশোধনবাদীরা এখানে পার্টি অফিস দখল করেছিলেন। নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতিতে এবং অসম প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে (সভ্য সংখ্যা নির্বিশেষে শুধু জেলা কমিটির সদস্যদের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল) সংশোধনবাদীরা এখানে হঠাৎ এক বিশেষ সম্মেলন করে স্থায়ীভাবে কমিটি বদলে দিয়েছেন এবং নিজেরা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও পার্টি কমিটিকে দখলে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সভায় "বামপন্থীরা" ন্যায়সংগতভাবে আগের রাজ্য পরিষদকে চালু করার দাবী জানিয়েছিলেন, কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা তা বাতিল করে দিয়েছেন।

কমরেড লেনিনের শিক্ষা

সংশোধনবাদ ও মার্কসবাদের মধ্যে সংগ্রাম আজ আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে। এই দুইয়ের মধ্যে কোন ঐক্য বা সমঝোতা হতে পারে না। বুর্জোয়া অনুচর-বৃত্তির ও শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক পথের মধ্যে কোন আপস হতে পারে না। ফরম ও শৃংখলার নামে সংশোধনবাদকে মেনে নেবার অর্থ হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মূল নীতিকে বিসর্জন দেওয়া। যারা নিজেরা মার্কসবাদ বর্জন করেছে তারা মার্কসবাদীদের উপর নিজেদের মতকে পার্টির মত বলে চাপাতে পারে না। সংশোধনবাদ ও সংশোধনবাদী চক্র হতে মুক্ত হয়েই মার্কসবাদ তার গৌরবোজ্জ্বল বৈপ্লবিক নীতিতে ভাস্বর হয়ে উঠতে পারে এবং কমিউনিস্ট পার্টি তার কর্তব্য পালনের উপযোগী হতে পারে, এই হোল কমরেড লেনিনের শিক্ষা। সংশোধনবাদীদের পায়ের তলা হতে মাটি সরে যাচ্ছে। তারা ক্রুদ্ধ হবেন, ধনিকশ্রেণীর অনুকরণে তাঁরা মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে কুৎসাকে তীব্রতর করবেন। মার্কসবাদ বর্জন করে তাঁরা নিজেরা বিভেদ সৃষ্টি করেছেন, অথচ তারাই মার্কসবাদীর বিরুদ্ধে বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগ এনে তাঁদের বশ্যতা দাবি করেছেন। বৃহৎ বুর্জোয়া পরিচালিত সরকারও প্রকৃত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দমননীতি ও কুৎসার অভিযান কেন্দ্রীভূত করে সংশোধনবাদীদের সাহায্য করছে। আজও অনেক নেতাকে জেলে আটকে রাখা হয়েছে, কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এই সব কিছুই ব্যর্থ হতে বাধ্য। মার্কসবাদের জয় অনিবার্য।

—"দেশহিতৈষী", ৩রা এপ্রিল, ১৯৬৪

৩ তেনালী কমিউনিষ্ট কনভেনশনের তাৎপর্য

১৯৬৪ সালের ৭ই জুলাই হতে ১১ই জুলাই পর্যন্ত অন্ধ্র প্রদেশের তেনালীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট কনভেনশন ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ধনিকশ্রেণীর লেজুড়-বৃত্তি করার ঘৃণ্য কাজে নিযুক্ত ডাংগে-গোষ্ঠীর পাপ-চক্রকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈপ্লবিক মতাদর্শের ভিত্তিতে ও ভারতের জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে শক্ত ভিত্তিতে গড়ে তোলার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এই কনভেনশনে নেওয়া হয়েছে। যে আদর্শের জন্য অসংখ্য কর্মী আত্মদান করেছেন ও অশেষ নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং যে আদর্শকে ডাংগে গোষ্ঠী পরিত্যাগ করে পার্টিকে কুলষিত করেছিল, সেই আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই এই কনভেশনের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে।

কনভেনশনের সাফল্যে দিশেহারা হয়ে শাসক-গোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীল-চক্র এর মধ্যে "দেশদ্রোহিতার" গন্ধ আবিস্কার করতে চাইছে। কমরেড মাও সে-তুং এর ফটো ও সীমান্ত বিরোধ সম্বন্ধে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত প্রস্তাবকে অবলম্বন করে এই কুৎসা ছড়ানো হচ্ছে। সীমান্ত বিরোধকে অবলম্বন করে "দেশ রক্ষার" নামে যেভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আক্রমণ করে আসা হচ্ছে, এই কুৎসা তার স্বাভাবিক অঙ্গমাত্র। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বৈজ্ঞানিক মতবাদের নেতা ও প্রবক্তা হিসাবেই মার্কস, এংগেলস্, লেনিন, স্টালিন ও মাও সে তুং-এর প্রতি মার্কসবাদীরা শ্রদ্ধা জানায়। কোন বিশেষ দেশের বিশেষ নেতা হিসাবে কমিউনিস্টরা এঁদের দেখেন না। চীনের সংগে আমাদের সীমান্ত বিরোধ আছে বলেই এ সত্যকে অস্বীকার করা যায় না, যে মাও সে-তুং এর নেতৃত্বে পৃথিবীর ৬৫ কোটি মানুষের দেশে মার্কসবাদের সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। তাছাড়া, মাও সে-তুং চীনের সরকারের কোন কর্মাধ্যক্ষ নন। তাই মার্কসবাদী মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর সংগে সীমান্ত বিরোধকে জড়িত করা এক দুরভিসন্ধি ছাড়া আর কিছু নয়।

সীমান্ত বিরোধ আমাদের দেশের সামনে এক গুরুতর সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের প্রস্তাবের মাধ্যমে আমরা আগ্রহ প্রকাশ

করছি। আমরা অতীতে বারে বারে ঘোষণা করেছি—যে যুদ্ধের দ্বারা এই বিরোধের মীমাংসা হবে না ও হতে পারে না। এই বিরোধ শুধু এশিয়ার শান্তি ও অগ্রগতির পক্ষেই ক্ষতিকারক নয়—ইহা চীন ও ভারত উভয়ের দেশের পক্ষেই অমংগলজনক। এই বিরোধের ফলে আমাদের দেশের অর্থনীতির উপর প্রবল আঘাত পড়ছে, জনগণের জীবনে বোঝা বাড়ছে, ভারতের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের চাপ বাড়ছে। তাই, সবতোভাবে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করা আমাদের দেশের স্বার্থেই কাম্য। আমাদের প্রস্তাবে সেই মনোভাবই ব্যক্ত করা হয়েছে।

শ্রীমতী বন্দর নায়েকের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টাকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি। ভারত সরকার বলেছেন, যে এইরূপ প্রস্তাব অনুকুলভাবে বিবেচনা করবেন তাও আমরা উল্লেখ করেছি। যখন মীমাংসা আমাদের দেশেরও কাম্য, তখন এমনি অনুকুল পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের উচিত সোজাসুজি চীনের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে শ্রীমতী বন্দরনায়েকের প্রস্তাব অথবা অন্য কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলাপ আলোচনা শুরু করবার উদ্যোগ নেওয়া। কথাবার্তা চালানোর জন্য উদ্যোগ নিতে বলার মধ্যে "দেশদ্রোহিতা" কোথায়? টাইমস অব ইণ্ডিয়া পত্রিকা, পার্লামেন্টের কংগ্রেসী সদস্য শ্রীখাদিলকর, সর্বোদয় নেতা বিনোবা ভাবে প্রভৃতিও ভারত সরকারকে উদ্যোগ নেবার জন্য অনুরোধ করেছেন। তাই, যাঁরা আসলে সীমান্ত বিরোধকে জীয়য়ে রাখতে ও একে জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চান, একমাত্র তাঁরাই আমাদের প্রস্তাবের মধ্যে "দেশদ্রোহিতা"-র গন্ধ পেতে পারেন। কিন্তু কুৎসা প্রচারের দ্বারা তাঁরা জনগণের কাছে সত্য কথা লুকিয়ে রাখতে পারবেন না।

তেনালী কনভেনশনের জন্য স্থির হয়েছিল—যে সারা ভারতবর্ষ হতে কমপক্ষে ১০০ জন ও বেশীপক্ষে ১৫০ জন প্রতিনিধি যোগ দেবেন। কার্যতঃ দেখা গেল যে প্রায় সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিনিধিই (১৪৬ জন) এতে যোগ দিয়েছেন। ত্রিপুরা ও মনিপুর ছাড়া সমগ্র রাজ্য হতেই প্রতিনিধি এসেছেন। এ হতে কনভেনশন সম্বন্ধে কমরেডদের আগ্রহই ফুটে ওঠে। সারা ভারতে ও বিভিন্ন রাজ্যে যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়ে তুলেছেন, তার বেশীর ভাগই কনভেনশনে এসেছেন। পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফফর আহমদ, কেরলের সর্বজনপ্রিয় নেতা ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ ও এ.কে. গোপালন, তামিলনাড়ুর পি. রামমুর্তী ও এম. আর. ভেংকটারামন, অন্ধ্র প্রদেশের পি. সুন্দরাইয়া, এম. বাসবপুন্নাইয়া ও নাগি রেড্ডি, পাঞ্জাবের হরকিষণ সিং সুরজিত ও জগজিৎ সিং লায়ালপুরী, উত্তর প্রদেশের শিব

বর্মা, শংকর দয়াল তেওয়ারী, পি. কে. ট্যান্ডন ও শিউকুমার মিশ্র, আসামের বীরেশ মিশ্র, অচিন্ত্য ভট্টাচার্য ও নন্দেশ্বর তালুকদার, মহারাষ্ট্রের এস. ওয়াই. কোলহাতকর ও অহিল্যা রংগনেকর, গুজরাটের চিন্ময় মেহতা, বিহারের সিয়াবর এস শ্রীবাস্তব, রাজস্থানের মোহন পুনামিয়া, পশ্চিমবাংলার জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং উড়িষ্যার জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি কনভেনশনে হাজির ছিলেন।

১৪৬ জনের মধ্যে ১৩৫ জনই হলেন পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী [এই ১৪৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে]। ১৯৪৭ সালের মধ্যে পার্টিতে যোগ দিয়েছেন ১১৮ জন, ১৯৪৩ সালের মধ্যে ৯৩ জন, ১৯৩৯ সালের মধ্যে ৫৯ জন ও ১৯৩৫ সালের আগে এসেছেন ১০ জন। প্রতিনিধিদের মধ্যে ১৩০ জন জেল খেটেছেন ৬১৭ বৎসর, তার মধ্যে একা গণেশ ঘোষ জেলে ছিলেন ২৬ বৎসর। ১২০ জন মোট ৩৮৮ বৎসর আত্মগোপনে থেকে কাজ করেছেন, তার মধ্যে কেরলের চন্দ্রানন্দব সাড়ে ১২ বৎসর থেকেছেন। এই সব থেকে বোঝা যায়, যে পার্টির দীর্ঘ দিনের পরিক্ষিত ও নির্যাতিত নেতারাই কনভেনশনে এসেছেন। প্রতিনিধিদের রিপোর্ট হতে এটাই ফুটে ওঠে যে, সত্যকার কমিউনিস্ট পার্টি এই তেনালীতেই জড়ো হয়েছে। আর দিল্লীতে ডাংগে-গোষ্ঠীর যে পার্টি আছে তা কমিউনিস্ট পার্টি নয়, তা হলো ধনিকশ্রেণীর অনুগৃহীত একটি পায়ের তলা হতে মাটি সরে যাওয়া ক্ষুদ্র চক্র মাত্র।

কনভেনশনে বিভিন্ন রাজ্য হতে যে রিপোর্ট পেশ করা হয় তাতেও এই একই চিত্র ফুটে ওঠে। ডাংগে-গোষ্ঠীর শ্রেণী-সহযোগিতার নীতি উপদলীয় চক্রান্ত ও দুর্নীতির হাত হতে পার্টিকে বাঁচাবার অন্য কোন পথ না পেয়েই জাতীয় পরিষদের ৩২ জন সদস্য গত ১৪ই এপ্রিল সমগ্র পার্টির নিকটে ডাংগে-গোষ্ঠীকে অস্বীকার করার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই আহ্বান যে সঠিক ও সময়োপযোগী ছিল তা অল্প সময়ের মধ্যে বেশীর ভাগ পার্টি সদস্যের অভূতপূর্ব সাড়া হতেই বোঝা যায়। কমরেডরা যেন এই আহ্বানের জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন। ২৯-৩০ শে এপ্রিল দিল্লীতে কার্যকরী সমিতির সদস্যদের যে বৈঠক হয়েছিল তাতেই দেখা গিয়েছিল—যে সারা ভারতে তখনই বেশীর ভাগ কমরেড ৩২ জনের আহ্বানে প্রকাশ্যে সাড়া দিয়েছেন। তেনালী কনভেনশনের রিপোর্টে দেখা গেল যে এই প্রক্রিয়া আরো এগিয়েছে।

কেরলে ৯টি জেলাতেই বেশীর ভাগ সদস্য এবং মোট সদস্যের শতকরা ৮০ ভাগ, তামিলনাড়ুতে শতকরা ৭৫ ভাগ, অন্ধ্রে ৭০ ভাগ, কর্ণাটকে ১৯০০

সভ্যের মধ্যে প্রায় ১৫০০, পাঞ্জাবে ৯৫০০ সভ্যের মধ্যে প্রায় ৬০০০, হিমাচল প্রদেশে ৩০০-এর মধ্যে ২০০ ; জম্বু ও কাশ্মীরে প্রায় সব, গুজরাটে শতকরা ৭৫ ভাগ, উত্তর প্রদেশে ১৩,০০০ এর মধ্যে প্রায় ৭-৮০০০, রাজস্থানে ২৫০০ এর মধ্যে ২০০০ ; পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক সংখ্যক কমরেড এবং আসামে ৩০০০ এর মধ্যে অর্ধেকের বেশী না হলেও অন্ততঃ অর্ধেক সদস্য ইতিমধ্যেই দৃঢ়ভাবে ডাঙ্গে-চক্রকে পরিত্যাগ করে ৩২ জনের সমর্থনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এমন কি মধ্য প্রদেশেও প্রায় অর্ধেক কমরেড এগিয়ে এসেছেন। একমাত্র মহারাষ্ট্র, বিহার, দিল্লী ও ওড়িষ্যাতে এখনও ডাঙ্গে-গোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য আছে। কিন্তু, এই সব রাজ্যে কমরেডরা দ্রুত সরে আসছেন। মহারাষ্ট্রে ৮০০০ এর মধ্যে ২৫০০ , বিহারে ১৩০০০ এর মধ্যে ২৫০০ এবং দিল্লীতে ১০০০ মধ্যে ৪০০ জন ইতিমধ্যেই এগিয়ে এসেছেন। তাই কনভেনশন বিশ্বাস রাখে যে, আগামী দিনে এই পক্রিয়া আরো এগোবে।

ডাঙ্গে-গোষ্ঠী নিজেরাই জানে যে তারা সাধারণ পার্টি সদস্যদের মধ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তারা জানে যে এই অবস্থায় যদি প্রকৃত পার্টি সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিকভাবে পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং উপদলীয় মনোভাব ত্যাগ করে প্রকৃত ঐক্যবদ্ধ পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে তারা ও তাদের রাজনীতি ভেসে যাবে। তাই, তারা আমাদের যুক্তি সম্মত সমস্ত ঐক্য প্রচেষ্টাকে সোজাসুজি বাতিল করে দিয়েছে। পার্টি ঐক্য সকল সৎ কমরেডেরই কাম্য। কিন্তু, উপদলীয় চক্রান্তের নিকট মাথা নত করে কখন ঐক্য করা যায় না। ৩২ জন জাতীয় পরিষদের সদস্য ঐক্যবদ্ধ পার্টি কংগ্রেসের জন্য যে সব প্রস্তাব রেখেছিলেন এবং যা বেশীর ভাগ পার্টি সদস্য সমর্থন করেছেন, তা কোন দর কষাকষির মনোভাব নিয়ে নয়, তাতে কোন রাজনৈতিক শর্ত ছিল না। তাতে ছিল—যাতে পার্টি কংগ্রেস গণতান্ত্রিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, পার্টিতে অবাধ আলোচনা সম্ভব হয়, পার্টির বৈপ্লবিক সততা বজায় থাকে এবং পার্টি কংগ্রেস পর্যন্ত মোটামুটি সমঝতার ভিত্তিতে কাজ হয়, তার জন্য কয়েকটি একান্ত প্রয়োজনীয় প্রস্তাব রাখা হয়েছিল।

কিন্তু দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আলোচনায় ডাঙ্গে-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা প্রত্যেকটি প্রস্তাবকে বাতিল করেছে এবং পার্টিতে তারা সংখ্যালঘু হলেও জাতীয় পরিষদে তাদের কৃত্রিম সংখ্যাধিক্যের অজুহাতে বেশীর ভাগ সদস্যের আত্মসমর্পণ দাবি করেছে। তারা অজুহাত দেখিয়েছেন, যে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করা নাকি "নীতি বিগর্হিত"। অথচ, এই "নীতি-বিগর্হিত" সাহায্যেই তারা অন্ধ্র প্রদেশের বেজওয়াড়া পার্টি কংগ্রেসে গঠিত জাতীয় পরিষদে

কৃত্রিম সংখ্যাধিক্য অর্জন করেছে। ১৯৬২ সালের এপ্রিলের গঠনতন্ত্র অমান্য করে চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করে তা দখল করেছে। জরুরী অবস্থায় দমণ-নীতির সুযোগ ও স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা এই দখলকে পোক্ত করেছে। তাই, তাদের তথাকথিত যুক্তি "দুরাত্মার ছল" ছাড়া আর কিছু নয়। পরিষ্কার হয়ে গেছে, ডাঙ্গে-গোষ্ঠী কোন মতেই পার্টি-ঐক্য চায় না; ঐক্যবদ্ধ পার্টি কংগ্রেসের সমস্ত প্রচেষ্টাকে তারা বাতিল করে দিয়েছে।

এই অবস্থায় তেনালীতে সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দ এই অনিবার্য সিদ্ধান্তে আসেন যে, আর ঐক্য আলোচনা চালাবার বা অনিশ্চয়তা বজায় রাখার কোন অবকাশ নেই; সোজাসুজি দৃঢ়ভাবে সপ্তম পার্টি কংগ্রেসের আহ্বান দেওয়া এবং তার জন্য প্রস্তুতি করা ছাড়া পার্টিকে বাঁচাবার ও সুদৃঢ় করার অন্য কোন পথ নেই। একমাত্র বাংলাদেশের ৩ জন প্রতিনিধি মনে করেছিলেন—যে ঐক্য আলোচনা চালাবার এখনও সুযোগ আছে এবং এই মর্মে তাঁরা সংশোধনীও দিয়েছিলেন, কিন্তু স্বভাবতঃই অন্য কোন প্রতিনিধি তা সমর্থন করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত পার্টি কংগ্রেস আহ্বান ও তার সময় এবং বিষয়সূচী সংক্রান্ত প্রস্তাব দুটি বিনা বিরোধিতায় প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে গৃহীত হয়। শুধু মাত্র ১ জন কমরেড ভোটদানে বিরত থাকেন। এ হতেই কনভেনশনে সমবেত প্রতিনিধিদের ঐক্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

কোন কোন বুর্জোয়া সংবাদপত্র কনভেনশনের আগে ও পরে ই. এম. এস. এর সঙ্গে অন্যান্য কমরেডদের মধ্যে কাল্পনিক মতপার্থক্যের কথা তুলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। কিন্তু এরূপ সংবাদের কোন ভিত্তি নেই। কমরেড ই. এম. এস. ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ সকলে একমত হয়েই বিভিন্ন মূল প্রস্তাবের খসড়া রচনা করেছেন এবং সেগুলিই কনভেনশনে গৃহীত হয়েছে। শুধু পার্টি কংগ্রেস ডাকাই নয়, পার্টি কংগ্রেস কখন ও কোথায় হবে, কী তার প্রতিনিধিত্বের ভিত্তি হবে এবং কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, এই সব বিষয়েই একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মতপার্থক্য আমাদের মধ্যে আছে, কিন্তু তা উপরোক্ত কোন বিষয়ে নয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মতাদর্শের ক্ষেত্রে আজ যে বিরোধ চলছে, সে বিষয়ে সমগ্র পার্টির মধ্যে আরো অনেক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, আরো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তাই তাড়াহুড়ো করে আগামী পার্টি কংগ্রেসে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। আরো আলোচনার পর পরবর্তীকালে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এ সিদ্ধান্ত কোন সুবিধাবাদী সিদ্ধান্ত নয়। নীতিগত প্রশ্নে কোন সুবিধাবাদী আপস না করেও পার্টি ঐক্যের জন্য এখনই কোন বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না করে তাকে আলোচনার স্তরে

কিছু দিন রেখে দেওয়া নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রতিক্রিয়াশীল চক্র, সংশোধনবাদীরা এবং অন্যান্য কেউ কেউ এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চাইছেন—যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মতবাদের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ও চীনের পার্টির মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে, তারই প্রত্যক্ষ প্রতিফলন হিসাবে ডাংগে-গোষ্ঠীর সংগে আমাদের বিরোধ দেখা দিয়েছে। ডাংগে-গোষ্ঠীর এই অপ-প্রচারের আড়ালে আত্মরক্ষা করতে চাইছে। শুধু তাই নয়, তারা তারস্বরে সাম্রাজ্যবাদের অনুকরণ করে আমাদের "চীনের অনুচর" বলে কুৎসা রটনা করছে। সংশোধনবাদীরা এই অপ-প্রচার করবে তাতে আমরা আশ্চর্য নই। কিন্তু আমরা দুঃখিত, যখন দেখি যে অন্য কোন কোন কমরেড মুখে নিজেদের ডাংগে নীতির বিরোধী বলেও আমাদের পার্টির বিরোধকে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বিরোধের প্রতিফলন হিসাবে প্রচার করে ডাংগে-গোষ্ঠীর যুক্তিকেই পুষ্ট করছেন। আন্তর্জাতিক বিরোধ সম্বন্ধে আমাদের কনভেনশনের উপরোক্ত সিদ্ধান্তই প্রমাণ করে যে, এই প্রচার মিথ্যা।

ডাংগে-গোষ্ঠীর সংগে যে সব বিষয়ে আমাদের বিরোধ, তাদের এখনই ঝেড়ে ফেলে দিতে বাধ্য করেছে, তা হোল : "সরকারের সংগে কমিউনিস্ট পার্টি মূলতঃ সহযোগিতার পথে যাবে, না বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠী পরিচালিত এই সরকারের অবসানের জন্য কাজ করে যাবে? ধনিকশ্রেণীকে নেতৃত্বের আসনে রেখে শ্রমিকশ্রেণী তার সংগে অংশীদারিত্বের ও সহযোগিতার চেষ্টা করবে না। ধনিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব হতে অপসারিত করেই শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে? কমিউনিস্ট পার্টির মূল নীতি হবে শ্রেণী সহযোগিতা, না, শ্রেণী সংগ্রাম? কমিউনিস্ট পার্টি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার আদর্শে চলবে, না, উপদলীয় চক্রান্তের বলি হবে? কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি হবে -বৈপ্লবিক নিষ্ঠা ও সততা, না অন্যান্য বুর্জোয়া পার্টির মত দুর্নীতি গ্রস্থ? এই সব বিষয়ে ডাংগে-গোষ্ঠীর সংগে বিরোধই আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং আদর্শগত প্রশ্নে মত-পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের এই ঐক্য তেনালী কনভেনশনে আরো শক্ত হয়েছে। তাই আমরা একমত হয়েই সিদ্ধান্ত করতে পেরেছি, যে আদর্শগত মত পার্থক্য সম্বন্ধে আমরা আরো আলোচনা চালিয়ে যাব।

কনভেনশনে সঠিকভাবেই স্থির করা হয়েছে, যে পার্টি প্রোগ্রামকে ফেলে রাখা যাবে না। আগামী পার্টি কংগ্রেস এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কারণ, পার্টি প্রোগ্রামই হবে আমাদের দিগ্‌দর্শন, বড় রকমের ভুল হতে তা আমাদের রক্ষা করবে। কনভেনশনের সকলেই সচেতন ছিলেন, যে এই

প্রোগ্রাম হয়ত সর্বাংগসুন্দর ও নিখুঁত হবে না। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একে হয়ত পরে আরো উন্নত করতে হবে। কিন্তু নিখুঁত না হলেও আমাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে হবে। কমরেড এম. বাসবপুন্নাইয়া ও অন্যান্য ৩০ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের দ্বারা যে খসড়া প্রোগ্রাম রচিত হয়েছে এবং কমরেড ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদের যে নোট আছে, তার উপর কনভেনশনে কিছু প্রাথমিক আলোচনা হয়। প্রায় ৩০ জন কমরেড আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনা বেশ প্রাণবন্ত ও কাজের হয়।

কমরেড এম. বাসবপুন্নাইয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বা কমরেড নাম্বুদিরিপাদের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে কোন কোন কাগজে যে সংবাদ বেরিয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। বেশীর ভাগ কমরেড খসড়া প্রোগ্রামের মূল বক্তব্যের সংগে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন। কমরেড নাম্বুদিরিপাদের অনেক বিষয়ে সহমত আছে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাঁর ভিন্ন বক্তব্য আছে। সকলেই একমত—যে এই সরকার হোল বৃহৎ ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার; এই সরকারের অনুসৃত ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে দেশের কোন ভবিষ্যত নেই; এই পথের মারাত্মক পরিণতি সম্বন্ধেও সকলে একমত।

একচেটিয়া পুঁজির শক্তি বৃদ্ধি, বিদেশী পুঁজির সহিত ক্রমবর্ধমান জোট বাঁধা, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অনুপ্রবেশ ও জনগণের উপর ক্রমবর্ধমান বোঝা সম্বন্ধে সকলে একমত। আমাদের দেশের বিপ্লবের বর্তমান চরিত্র হোল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী ও একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী। এই কর্তব্য সমাধা করেই দেশ সমাজতন্ত্রের পথে যেতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন এই সরকারের অপসারণ। এই কর্তব্য শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সমাধা হতে পারে না। শ্রমিকদের নেতৃত্বে ও শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে এক ঐক্যবদ্ধ মোর্চায় সংহত করতে হবে। এই সব বিষয়ে সকলে একমত এবং এই সব বিষয়েই ডাংগে-গোষ্ঠীর সংগে মূল বিরোধ। ডাংগে-গোষ্ঠীর বক্তব্য হোল এই সরকার বৃহৎ ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত নয়, জাতীয় ধনিকশ্রেণীই এতে প্রধান শক্তি। এই সরকার মূলতঃ একচেটিয়া পুঁজির বিরোধী, যদিও এতে তাদের কিছু প্রভাব আছে। তাই, এই সরকারের অপসারণ নয়, শ্রমিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই, শুধু প্রয়োজন শ্রমিক-কৃষক শক্তির সাহায্যে জাতীয় ধনিকশ্রেণীর হাতকে শক্তিশালী করা। ডাংগে-গোষ্ঠীর লেজুর-বৃত্তির মতবাদগত ভিত্তি এই খানে এবং একেই আমরা সকলে বর্জন করেছি।

কমরেড নাম্বুদিরিপাদের যে সব বিষয়ে ভিন্ন মত হল তা হোল, প্রথমতঃ বিপ্লবের নামকরণ কী হবে? জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, না জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব? বেশীর ভাগ কমরেড মনে করেন, যে বিপ্লবের যা কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে তাতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারণা সংগতিপূর্ণ নয়; এর চরিত্র হোল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। কমরেড ই. এম. এস-এর এ বিষয়ে বক্তব্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, বৃহৎ ধনিকশ্রেণীর ভূমিকা কী হবে? সকলেই একমত, যে বৃহৎ ধনিকশ্রেণীর সংগেও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ আছে এবং গণতান্ত্রিক শক্তি নিশ্চয়ই একে ব্যবহার করবে। কিন্তু বেশীর ভাগ কমরেড মনে করেন যে, এই বিরোধের চরিত্র ভিন্ন প্রকৃতির। এই বিরোধ সত্ত্বেও বিপ্লবের রণনীতিগত শ্রেণী সমাবেশে বৃহৎ বুর্জোয়াদের কোন স্থান হতে পারে না। যেহেতু এই বিপ্লবের অন্যতম চরিত্র হোল একচেটিয়া পুঁজির বিরোধী। তাই, বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠী এই বিপ্লবের শ্রেণী সমাবেশে আসতে পারে না। কিন্তু বৃহৎ পুঁজিপতিদের সম্বন্ধে এই রূপ ঢালাও-ভাবে বলা সম্বন্ধে কমরেড ই. এম. এস-এর বক্তব্য আছে।

একটি বিষয়ে কমরেড ই. এম. এস. খসড়া প্রোগ্রামের দুর্বলতা সঠিক-ভাবেই দেখিয়েছেন। পুঁজিবাদী পথের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে দেশে সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক, গোষ্ঠীগত নানা বিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে, জাতীয় ঐক্যের প্রশ্ন দেশের সামনে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। খসড়া প্রোগ্রামে এই সমস্যার বিষয় তুলে ধরা হয় নাই। সকলেই মনে করেন যে, এ ত্রুটি সংশোধন করতে হবে।

মোটের উপর প্রোগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা প্রাথমিক হলেও তা হয়েছে গঠনমূলক। সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন স্তরে পার্টি সম্মেলনে আলোচিত হবে ও তার ভিত্তিতে পার্টি কংগ্রেসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সকলেই এই বিশ্বাস নিয়ে এসেছেন যে আমরা নিশ্চয়ই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারব।

তেনালী কনভেনশনে পার্টি কংগ্রেস সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রধান আলোচ্য বিষয় হলেও জনগণের আশু সমস্যা ও আন্দোলনের কথা বাদ যায় নাই। তাই খাদ্য সংকট, উচ্চ মূল্য, বন্দী-মুক্তি ও অন্যান্য বিষয়েও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

কিন্তু তেনালী কনভেনশনের মূল তাৎপর্য হোল—সপ্তম পার্টি কংগ্রেসের জন্য উদাত্ত আহবান,—ডাংগে-গোষ্ঠীর পাপ চক্র থেকে মুক্ত হয়ে পার্টির নবজন্মের ঘোষণা। বেশীর ভাগ পার্টি সভ্য এই আহবানে সাড়া দিয়েনেছ। এখনও যাঁরা সিদ্ধান্ত করতে পারেন নি তাঁদের কাছে কনভেনশন আবেদন জানিয়েছে যে, এই মহান কর্তব্যে তাঁরা আমাদের শরিক হোন।

আজ প্রত্যেক কমরেডের কর্তব্য হোল সপ্তম পার্টি কংগ্রেসকে সার্থক করে তোলা এবং পার্টির পুনর্গঠনের সঙ্গে আমাদের অন্যান্য কাজের উপর সংস্কারবাদের প্রভাব দূর করা ; সংকীর্ণতার বিপদ সম্বন্ধে সচেতন থাকা ; এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গণ-আন্দোলন ও শ্রমিক-কৃষকের মূল শ্রেণীগত গণ-সংগঠনগুলি গড়ে তোলা। এই শেষোক্ত কাজগুলি সহজ নয় ; কিন্তু দৃঢ়তা নিয়ে শুরু করলে নিশ্চয়ই তা আমরা করতে পারব।

সংশোধনবাদীরা ১৯৪৮-৪৯ সালের হঠকারিতার জুজুর ভয় দেখিয়ে আমাদের সংগ্রামকে বানচাল করতে চাইছেন। তাঁদের আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৯৪৮-৪৯ সালের হঠকারিতায় যাঁরা নেতা ছিলেন তাঁদের বেশীর ভাগই আজ আপনাদের সংশোধনবাদী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সব সময়ে সঠিক পথের বিরোধিতা করার ব্যাপারে আপনারাই সিদ্ধহস্ত। আমরা যারা অনেক ঠেকে শিখে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি তারা নিশ্চয়ই সংশোধনবাদের অপর দিক হঠকারিতা সম্বন্ধেও সচেতন থাকব।

—দেশহিতৈষী, জুলাই ২৪, ১৯৬৪

৪ কৃষক আন্দোলনের নতুন গতিধারা ও তার তাৎপর্য

মধ্যবর্তী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ কংগ্রেসকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্টকে বিপুলভাবে জয়যুক্ত করেছে। বিজয়ী যুক্তফ্রন্টের গঠনের বিশেষ চরিত্র হোল এই যে, এর মধ্যে প্রধান শক্তি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। অন্য রাজ্যের যুক্তফ্রন্টের ফলাফলের সংগে পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল তুলনা করলে এর তাৎপর্য বোঝা যাবে। এই বিশেষ শক্তি সমাবেশের ভিত্তিতে গঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গণ-আন্দোলনের অগ্রগতির যে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার ফলে সারা পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আন্দোলনে এক অভূতপূর্ব জোয়ার দেখা দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ গরীব কৃষক ও খেতমজুর অপূর্ব উন্মাদনা, উন্নত চেতনা, লক্ষণীয় সাহস ও দৃঢ়তা এবং শ্রেণীগত ঐক্যবোধ নিয়ে গ্রামাঞ্চলে কৃষক সংগ্রামে এক বিশেষ গতিবেগ ও গভীরতা এনে দিয়েছে। এ কোন বিশেষ জেলার ঘটনা নয়, জেলায় জেলায় কিছু তারতম্য থাকলেও এ সংগ্রাম কার্যতঃ সারা পশ্চিমবঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করেছে। যেন কোন যাদু মন্ত্র বলে লক্ষ লক্ষ গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর দীর্ঘদিনের জড়তা ও দ্বিধা কাটিয়ে এবং নতুন চেতনা ও সংঘ শক্তির সন্ধান পেয়ে গ্রাম্য রাজনীতির রংগমঞ্চে প্রধান ভূমিকায় নেমে পড়েছে। আগেও গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর আন্দোলন করেছে। কিন্তু সংখ্যা, ব্যাপ্তি, গভীরতা ও চরিত্রের দিক দিয়ে আজকের সংগে তার কোনই তুলনা হয় না। যাঁরা ঐতিহাসিক তে-ভাগা আন্দোলন দেখেছেন তাঁরাও স্বীকার করছেন, যে এখনকার কৃষক সংগ্রাম তার চেয়েও অনেক ব্যাপক, অনেক শক্তিশালী, অনেক গভীর।

তে-ভাগার সংগ্রাম ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রামের পটভূমিকায় ফসলের সংগ্রাম। এখনকার সংগ্রাম হচ্ছে, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পরিবর্তনের দিকে অগ্রসরমাণ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ঘনীভূত অর্থনৈতিক সংকটের পটভূমিকায় জমির জন্য সংগ্রাম। সক্রিয় কৃষক সংগ্রামের সহায়তা পেয়ে গত ৬ মাসে যুক্তফ্রন্ট সরকার শুধু সরকারী প্রচেষ্টায় তিন লক্ষাধিক বিঘা অতিরিক্ত বেনামী জমি বড় জমিদার-জোতদারদের কবল থেকে উদ্ধার করেছে। (১৯৬৭ সাল হতে আজ পর্যন্ত এমনি উদ্ধার করা বেনামী জমি সাড়ে সাত লক্ষ বিঘারও বেশী। তাছাড়া আগে হতে সরকারে ন্যস্ত জমি

আরো আছে।) এই জমি বিলির ব্যাপারে কৃষকেরা সরকারী শাসনযন্ত্রের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে নি, সরকারকে জমি বিলিতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে। এ ছাড়া কৃষকরা নিজেদের উদ্যোগে আরো কয়েক লক্ষ বিঘা (সঠিক হিসাব দেওয়া মুস্কিল) বেনামী জমি উদ্ধার করেছে। জমিদার-জোতদারদের চক্রান্ত, আঘাত ও তাদের দ্বারা আইনের প্রক্রিয়ার ব্যভিচার একে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। গ্রামের ও গরিবের পর্ণকুটিরে বাইরের বিষাদময় চেহারায় কোন পরিবর্তন চোখে দেখা যাবে না। কিন্তু, এই সব কুটিরে যারা বাস করে সেই মানুষগুলির মধ্যে, তাদের চিন্তা ও কাজের ধারার মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিনের প্রতারণা, বঞ্চণা ও আঘাতের বিরুদ্ধে তাদের চোখেমুখে দেখা দিচ্ছে দৃঢ় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা। অনেক ব্যাথা বেদনার স্মৃতি বহন করে এই শস্য উৎপাদনকারী সৃজনশীল মানুষগুলি যখন নূতন জীবনবোধ নিয়ে কিছু করার জন্য এগিয়ে আসে, তখন তাতে কোন ক্ষেত্রে একটু বেশী উচ্ছ্বাস ও কিছু কিছু বাড়াবাড়ি থাকতে পারে বৈকি এবং তা কিছু হয়েছেও।

কিন্তু এ সব হোল খুব সামান্য ও গৌণ। আসল কথা হোল গ্রামের গরীবেরা নূতন ইতিহাস সৃষ্টি সুরু করেছে এবং তার মধ্য দিয়ে নিজেরাও বদলাচ্ছে। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এখনই সামন্তবাদের পূর্ণ অবসান করা সম্ভব নয়, তা আশু কার্যক্রম হতেও পারে না; কিন্তু লক্ষ লক্ষ গ্রামের গরীবের অভিযান সামন্তবাদের শিকড়গুলিকে নড়িয়ে দিচ্ছে, জোতদার-জমিদার ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি আতংকিত হয়ে উঠেছে। কত লক্ষ বিঘা জমি গরীবেরা পেল বা কত লক্ষ মণ ধান তারা ঋণ বা খোরাকি হিসাবে আদায় করতে পারল, একমাত্র তারই মাপ কাঠিতে আজকের পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনের চরিত্র বিচার করতে গেলে সবটা বোঝা যাবে না। যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা দরকার তা হোল লক্ষ লক্ষ গরীব কৃষক—কমরেড লেনিন যাদের বিপ্লবী ভূমিকার কথা বারে বারে বলেছেন—তারা নূতন চেতনা ও সংঘ শক্তিতে পুষ্ট হয়ে উঠেছে। সমাজের মৌলিক রূপান্তরের জন্য যে শক্তি সমষ্টির প্রয়োজন তারই একটা বড় অংশ এর মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করছে। "তোমাদের বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে"—এই কথাটি নূতন অর্থে এখানে প্রয়োগ করা যায়। 'যুক্তফ্রন্ট সংগ্রামের হাতিয়ার',—মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এই মূল্যায়নের তাৎপর্য বোঝা যাচ্ছে।

১৯৬৭-৬৮ সালের অভিজ্ঞতা

এই পরিস্থিতিকে বুঝতে সুবিধা হবে যদি আমরা একটু পিছনে গিয়ে

১৯৬৭ সালের দিকে তাকাই। ১৯৬৭ সালে স্বল্পায়ু ও অপেক্ষাকৃত অনেক দুর্বল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলের অভিজ্ঞতা আজকের অগ্রগতির ভিত তৈরী করতে সাহায্য করেছিল। ঐ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা জনগণের কোন সমস্যার সামান্য সুরাহা করতে পারে নি। খুব সামান্য হলেও সরকারী কর্মচারী শিক্ষকেরা কিছু আর্থিক সুবিধা ও মর্যাদা পেয়েছিল। কিন্তু, শ্রমিক-কৃষক ঐ রকমের সাক্ষাৎ কোন অর্থকরী সাহায্য পায় নি। এমন কি কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ ও জোতদার-মজুতদারদের চক্রান্তে যে গভীর খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল—যার ফলে গ্রামের গরীবদের ৩ টাকা সাড়ে তিন টাকা কিলো চাল কিনতে হয়েছিল—তা হতেও গরীবদের কোন নিস্কৃতি দেওয়া যায় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ সময়ে রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতার গন্ডীর মধ্যে সরকারের হাতে ন্যস্ত জমির দখল ও বন্টন, ঐ কাজে কৃষক সংগঠনের সাহায্য গ্রহণ, বেনামী জমি উদ্ধার, উচ্ছেদ বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে যে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তা গ্রামের গরীবদের মধ্যে নুতন চেতনা সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানেন—যে ইংরেজ আমলের আগে গ্রামাঞ্চলে জমিহীন কৃষক বিশেষ ছিল না। ইংরেজের শোষনের সংগে জমিদার-মহাজন-দের নির্মম বল্গাহীন শোষণ মিলে কৃষকদের অনেককে দ্রুত জমিহারা কৃষকে পরিণত করতে লাগল। সদ্য মার খাওয়া দুঃস্থ কৃষকের দল এই নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নানা বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা, মেদিনীপুরের চুয়াড় বিদ্রোহ এরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু ইংরেজের কামানের গোলার সামনে এই সব খন্ড খন্ড ও বিচ্ছিন্ন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ববিহীন বিদ্রোহগুলি অংশ গ্রহণকারীদের বীরত্ব সত্ত্বেও বিধ্বস্ত হয়ে গেল। পরাজিত কৃষক বাস্তবকে মেনে নিল। সময়ের প্রলেপ ঐ কৃষকদের পুত্র-পৌত্রদের অন্তরের জমি হারানোর জ্বালাকে প্রশমিত করে দিল। যে জমিদার—মহাজনদের বিরুদ্ধে একদিন তারা বিদ্রোহ করেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাদেরই কাছে গিয়ে সামান্য ভাগের জমি ও মজুরীর কাজ পাবার জন্য তারা অনেক হাতজোড় করে দাঁড়াত। তারপর নূতন পরিস্থিতিতে জাতীয় চেতনা উন্মেষের সংগে তাল রেখে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে যেমন ধাপে ধাপে গভীরতা ও তীব্রতা আসতে লাগল, কৃষকদের মধ্যেও নূতনভাবে তার প্রভাব পড়তে লাগল।

কিন্তু ১৯৩০-৩২ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে কৃষকের অন্তরে তা সত্যকার সাড়া জাগাতে পারে নি। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সে অবাক হয়ে

শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে, ১৯২১-২২ বা ১৯৩০-৩২ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ বা লবণ, বিলাতী কাপড়, মদ প্রভৃতি নিয়ে আইন অমান্য আন্দোলনকে সে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে। কিন্তু এ সব জিনিষ তার জীবনের সংগে নিবিড় সংযোগ সাধন করতে পারে নি, তাই তাকে এর সক্রিয় সরিক করা যায় নি। তার জমি ও ঋণের সমস্যার কথা সে এ সবের মধ্যে খুঁজে পায় নি। তৎপরবর্তীকালে একদিকে দেশব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাব, রুশ বিপ্লবের কাহিনী, অন্যদিকে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী ও কংগ্রেসী আইন অমান্য আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার অভিজ্ঞতা কৃষকদের মধ্যে তাদের নিজেদের দাবী নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত হবার জন্য নূতন চেতনার সঞ্চার করতে লাগল। অনেক বছর সময় লাগলেও ধাপে ধাপে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন বিস্তার লাভ করতে লাগল, সংগে সংগে গভীরেও যেতে লাগল। জমিদারী উচ্ছেদের ও জমির দাবী তাদের মধ্যে সত্যকার সাড়া জাগাল।

কিন্তু প্রথমে এটা সম্ভব বলে তারা বিশ্বাস করে নি, তবু তারা স্বপ্ন দেখতে লাগল। খাজনা, ঋণ, প্রজাস্বত্ব, ক্যানেল কর প্রভৃতি দাবীর স্তর পেরিয়ে তে-ভাগার দাবী কৃষক আন্দোলনকে নূতন স্তরে নিয়ে গেল, বর্গাদার ও খেতমজুরেরা বিশেষ শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। স্বাধীনতার পর জমির দাবি তার কাছে বাস্তব হিসাবে দেখা দিল। কংগ্রেস সরকারের জমিদারী উচ্ছেদ আইনের প্রহসন তাদের হতাশ করেনি, বরং তাদের জমির জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাবোধ সৃষ্টি করেছে। ১৯৫৬-৫৭ সালের পর হতে উচ্ছেদ-বিরোধী সংগ্রামের সংগে সংগে বেনামী জমি উদ্ধারের সংগ্রাম কৃষক আন্দোলনে বিশেষ তাৎপর্য এনেছে। কিন্তু যুক্তফ্রণ্ট সরকার হবার আগে পর্যন্ত এই জমির সংগ্রাম অল্প এলাকার মধ্যে ও প্রধানতঃ বর্গাদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যত্র জমির ক্ষুধা থাকলেও তা বাহ্যিক রূপ নিতে পারে নি।

জমির প্রশ্নে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের প্রচেষ্টা এই সীমাবদ্ধতার বাধাকে অনেকটা শিথিল করে দিল,—সমস্ত জেলার জমির প্রশ্ন বাস্তব সংগ্রামের প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিল। কৃষকদের মনে অতীতের জমি হারানোর ব্যথা নূতন করে জেগে উঠল এবং সেই সংগে জমি পাবার স্বপ্ন তাঁদের চোখে মুখে নূতন চেহারা এনে দিল। এই জমি হারানোর ব্যথা ও জমি পাবার স্বপ্নই তাঁদের তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা কিলো চাল খাবার ব্যথাকে চাপা দিয়ে দিল। গরীব কৃষক রাজনৈতিক চেতনায় অনেক সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্বের এই বৈপ্লবিক তাৎপর্য প্রতিক্রিয়াশীল ও অতি বিপ্লবীরা স্বভাবতঃই বুঝতে পারে নি। তাই কংগ্রেসের ৩ টাকা

কিলো চালের স্লোগান ও অন্য দিকে হঠকারী বালখিল্যদের নির্বাচন বর্জনের স্লোগান মধ্যবর্তী নির্বাচনে পর্যুদস্ত হয়ে গেল। যুক্তফ্রন্ট আমলে কৃষকদের লব্ধ চেতনা পরবর্তীকালে দমণনীতির আগুনে পুড়ে আরো শক্ত হয়ে উঠল। যে অধিকার তারা অর্জন করেছিল তা রক্ষার জন্য তারা গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে অনেক ব্যাপক ও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করল। অতীতের এই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাই বর্তমানের কৃষক সংগ্রামে দুর্বার গতিবেগ এনে দিয়েছে।

গভীর সংকটের পটভূমিকায় কৃষক সংগ্রাম

পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনের এই বিশেষ বিকাশকে দেখতে হবে, সারা ভারতে ঘনীভূত অর্থনৈতিক সংকটের পটভূমিকায়। তা না হলে এই সংগ্রামের শক্তি ও দুর্বলতা কোনটাই বোঝা যাবে না, কোন পথে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সে বিষয়েও স্বচ্ছ ধারণা হবে না। বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকটের যুগে ভারতে বড় বড় পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে পরিচালিত পুঁজিপতি জমিদার শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক অনুসৃত পুঁজিবাদী বিকাশের নীতি কিভাবে দেশকে ক্রমশঃ গভীরতর অর্থনৈতিক সংকটে ডুবিয়ে দিচ্ছে সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা বা তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা এই প্রবন্ধের বিষয় বস্তু নয়। এখানে যে কথা বুঝতে হবে তা হ'ল এই যে, এই সংকট স্থায়ী রোগে পরিণত হয়েছে এবং তা দিন দিন জটিল ও গভীর হচ্ছে। সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর ছাড়া কোন টোটকা দাওয়াই দিয়ে এর কিছুটা হেরফের ছাড়া সত্যকার সমাধান করা যাবে না। এই মৌলিক রূপান্তর আসতে পারে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী মানুষের তীব্র ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই কথা মনে রেখেই পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান কৃষক সংগ্রামকে দেখতে বা বুঝতে হবে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের সামনে এগিয়ে যাবার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এই রাজ্য সরকারের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; এর দ্বারা জনগণের সমস্যার কোন মৌলিক সমাধান করা যেতে পারে না। দেশের আর্থিক সংগতির উপর কেন্দ্রের একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকার ফলে সামান্য গঠনমূলক কাজ বা জনগণকে সামান্য সুবিধা দেওয়া অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। তাই, যুক্তফ্রন্ট সরকার জনগণের সকল সমস্যার সমাধান করে দেবে, এমন চিন্তা করা অবাস্তব। কিন্তু, এই সীমাবদ্ধ শাসন ক্ষমতাকে গণ-আন্দোলনের বিকাশের স্বার্থে ব্যবহার করা সম্ভব। এ কথা ঠিক যে শাসনযন্ত্রের ও আমলাতন্ত্রের শ্রেণী চরিত্রের রূপান্তর ঘটাতে পারা

যাবে না। কিন্তু তা হলেও একে এমন ভাবে কাজে লাগানো যায়, যার সদ্‌ব্যবহার করে শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী জনসাধারণ কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এটাই হলো যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্য ভূমিকা। অবশ্য ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হলেও কিছুটা আর্থিক বা অন্যান্য সুবিধা দেওয়া যায়, কিন্তু নিঃসন্দেহে এগুলি হবে গৌণ। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সঠিক ভাবে বলেছিল, যে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। গত ৬ মাসের ঘটনাবলী এই ভূমিকার তাৎপর্য মেহনতী মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে যে গণ-আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তা হতে এটা বোঝা যায়।

কৃষক সংগ্রামের চরিত্র ও বিশেষত্ব

সাম্প্রতিককালের কৃষক আন্দোলনকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, সরকারী ব্যবস্থাবলী বিশেষ পরিমানে সাহায্য করলেও দেশের গরীব কৃষকদের সক্রিয় ভূমিকাই এই অবস্থার সৃষ্টি করতে পেরেছে এবং তার মধ্য দিয়ে কিছু আংশিক দাবিও আদায় করতে পেরেছে। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে, যে জনসাধারণ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নেবে আর সরকার উপর থেকে জনকল্যাণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এমনি ধারণা খুবই ভুল। অন্য দিকে যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলি ইতিবাচক ভূমিকাকে অস্বীকার করে বা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে রক্ষার জন্য মিলিত সংগ্রামকে উপেক্ষা করে একমাত্র গণ-সংগ্রামের দ্বারা বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি করা সম্ভব হত না। জমির ব্যাপারে চলিত আইনের কোন বড় রকমের সম্ভাব্য পরিবর্তন এখনও করা যায় নি, কিন্তু এ বিষয়ে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে (যেমন উচ্ছেদ বন্ধ, বাস্তু ভিটার অধিকার, পতিত জমির চাষ প্রভৃতি)। সেই সঙ্গে চলতি আইনের বিভিন্ন বিধানকে যতটা সম্ভব কৃষকের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য বিশেষ তৎপরতা নেওয়া হয়েছে। শাসনযন্ত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা সত্ত্বেও তাকে এই কাজে লাগানোর কিছুটা চেষ্টা হয়েছে এবং গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিসী দমণনীতির ব্যবহারকে সংযত করবার নীতি নেওয়া হয়েছে। এইগুলি কৃষক সংগ্রামকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে ও দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

কিন্তু এ কথাও বুঝতে হবে—যে গরীব কৃষকদের সম্মিলিত শক্তির ভূমিকা যদি না থাকত তাহলে উপর থেকে নেওয়া সরকারী ব্যবস্থাগুলি বিশেষ কিছু করতে পারত না। এও লক্ষ্য করতে হবে, যে গরীব কৃষকদের

এই অভিযান শুধুমাত্র সরকারী ব্যবস্থাকে কার্যকর করার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে নি, তা থেকেও এগিয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সরকারী প্রচেষ্টায় যতটা বেনামী জমি উদ্ধার করা হয়েছে, কৃষক তার চেয়েও বেশী জমি উদ্ধার করেছে। পরিবার ভিত্তিতে জমির সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করা নীতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু তা এখনও আইনে পরিণত হয় নি। কৃষকেরা কিন্তু তার জন্যে বসে নেই, তারা ইতিমধ্যেই একে কার্যকরী করবার জন্য কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। এ হতেই গণ-সংগ্রামের মুখ্য ভূমিকা পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। আইন-কানুনের সরকারী ব্যবস্থা এবং সক্রিয় গণ-সংগ্রামের এই পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

কৃষক সংগ্রাম শুধুমাত্র খাস জমি বিলি বা বেনামী জমি উদ্ধারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আজ তা ঋণ, খাদ্য, মজুরি প্রভৃতির প্রশ্ন নিয়েও গরীব কৃষকেরা আন্দোলনে নেমেছে। দেনার দায়ে জমি চলে যাওয়ার সমস্যা এবং জমি ফেরৎ পাওয়ার প্রশ্ন অনেক দিন ধরেই কৃষক আন্দোলনের কর্মীদের ভাবিত করে তুলেছে। বর্তমান সীমাবদ্ধতার মধ্যে শুধুমাত্র আইন করে এর সমাধান করা সম্ভব নয়। এমনভাবে দলিলে বেশী টাকা লিখে জমিগুলি বিক্রীকোবলা করা হয়েছে, যে তা আইন করে ঠিকমত উদ্ধার করাও মুস্কিল। সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে যে, সংগ্রামী কৃষকেরা এই সমস্যার সমাধানের একটা পথ খুঁজে পেয়েছে। প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনের চাপ সৃষ্টি করে কিছু কিছু জমি ফেরৎ পাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। কোন রকম আইন করার চেষ্টা নিশ্চয়ই করতে হবে। কিন্তু, এই সমস্যার সঠিক সমাধানের জন্য যে রাস্তার সন্ধান ইতিমধ্যেই কৃষকেরা পেয়েছে তাকে বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে।

গ্রামাঞ্চলে অভাবের কয়েক মাস গরীব কৃষকদের পক্ষে খাদ্য কর্জ পাওয়া এক কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বাংলা ১৩৫০ (ইংরেজী ১৯৪৩) সালের মন্বন্তর এবং তারপর মজুতদারদের কার্যকলাপের ফলে গ্রামাঞ্চলে সহজ সুদে ধান অথবা টাকা কর্জ পাওয়ার ব্যবস্থা ধাপে ধাপে কার্যতঃ উঠে গেছে। অতীতে এর সমাধানের প্রশ্ন নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, কিন্তু সত্যিকারের পথ খুঁজে পাওয়া যায় নি। বর্তমানে কৃষক সংগ্রাম তারই পথের ইঙ্গিত দিয়েছে। সংগঠিত আন্দোলনের চাপ দিয়ে স্থানে স্থানে কৃষকেরা সহজ শর্তে ধান কর্জ পেয়েছে। খাস জমি বিলি ও বেনামী জমি উদ্ধারের পর কৃষক কর্মীদের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছিলো—যে গরীব কৃষকেরা সামান্য আধ বিঘা করে জমি পেয়ে কিভাবে সেই জমি সরকারী ঋণের অপ্রতুলতার মধ্যে

চাষ করবে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা বার বার একটা কথা প্রচার করেছে যে, এক এক জনকে সংসার চালানোর জন্য পর্যাপ্ত জমি না দিলে দুঃস্থ কৃষকদের পক্ষে এক আধ বিঘা জমি চাষ করা মুস্কিল এবং তাতে ফসল উৎপাদনও ব্যাহত হতে বাধ্য। যুক্তফ্রন্ট সরকার বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের এই মতকে সব সময় ভুল বলে মনে করেছে। অল্প অল্প করে জমি দিতে পারলেও তা অগণিত দুঃস্থ কৃষকদের মধ্যে কিছুটা নিরাপত্তার অবস্থা ও সেই অনুপাতে উৎসাহ সৃষ্টি করে।

এই কথা মনে রেখে যত বেশী সংখ্যক সম্ভব লোকের মধ্যে জমি বিলি করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু, এই সব জমি দুঃস্থ কৃষকেরা কীভাবে চাষ করবে ও তাতে ফসল কী হবে, তা এক বিশেষ সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছিল। কৃষক আন্দোলনের কোন কোন কর্মীও এই সব প্রশ্নে বিচলিত বোধ করেছেন! কিন্তু, সংগঠিত কৃষক আন্দোলন নিঃসন্দেহে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে এবং আমাদের ধারণাটাকে নির্ভুল বলে প্রমাণ করেছে। লাখ লাখ বিঘা জমি বিলি করা হয়েছে বা উদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু কোন জমি পতিত পড়ে নেই। চাষের অবস্থাও অপেক্ষাকৃত খারাপ নয়। মেহনতী কৃষকদের সৃজনী শক্তি কিছুটা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। বিভিন্ন দেশের কৃষি বিপ্লবের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায়া যে, বড় বড় জমির মালিকানা ভেংগে দিয়ে এক এক জনকে অল্প অল্প করে জমি বিতরণ করলেও মেহনতী কৃষকদের মধ্যে সৃজনীশক্তির এমন এক বিকাশ ঘটে, যে তাতে একটা স্তর পর্যন্ত কৃষির উৎপাদন বিশেষভাবে বেড়ে যায়। তারই কিছুটা ইংগিত পশ্চিমবংগ কৃষক আন্দোলনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে।

আমাদের পশ্চিমবংগে খেতমজুরের সংখ্যা কম নয় এবং দিন দিনই এই সংখ্যা বেড়ে চলেচে। এরা কিন্তু আসলে উন্নত পুঁজিবাদী দেশের স্বাধীন মজুর নয়। এদের চরিত্র হলো মূলতঃ জমিহীন দুঃস্থ কৃষকের চরিত্র। এদের সামনে জমির প্রশ্ন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বর্তমানে ন্যায্য মজুরী পাওয়া। কিন্তু দুঃস্থ কৃষকদের অন্যান্য অংশের মত বা তার চেয়ে বেশী এরা বঞ্চিত ও প্রতারিত হয়ে আসছে। কাজের অভাব, মজুরীর স্বল্পতা, সামন্তবাদী বিভিন্ন শোষণ এদের অনেককেই কার্যতঃ ভূমিদাসের অবস্থায় রেখেছে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে গ্রামাঞ্চলে এরাই হোল সবচেয়ে বিপ্লবী অংশ—অবশ্য যদি এদের সেই অবস্থার মতন করে গড়ে তোলা যায়। গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে এই খেতমজুরদের কৃষক সংগ্রামের সামনে নিয়ে আসতে না পারলে সমাজের মৌলিক রূপান্তরের কথা শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনের মধ্যে খেতমজুরেরা কম বেশী সামিল থেকেছে বটে, কিন্তু তাদের সংগঠিত করা ও সামনে এগিয়ে নিয়ে আসার কাজ অনেকটা অবহেলিত হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আন্দোলনের যে জোয়ার এসেছে, সেই জোয়ারের মধ্যে কৃষক আন্দোলনের এই দুর্বলতা কাটাতে শুরু করেছে। সংগ্রামী খেতমজুরেরা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয় উপরন্তু নিজেদের দাবি নিয়েও তারা বহু স্থানে প্রাণবন্ত আন্দোলনে নেমেছে এবং কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে। এই মজুরদের আন্দোলনে কিছুটা পরিপক্কতার লক্ষ্যও দেখা যাচ্ছে এবং বড় বড় জমির মালিকদের বিরুদ্ধে একে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু, এ কথা স্বীকার করতে হবে—যে এখানো পর্যন্ত খেতমজুরদের আন্দোলন অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থার মধ্যে রয়েছে, সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের সামনে এই দুর্বলতা প্রকাশ করার প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাম্প্রতিককালে কৃষক সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই যে, খেতমজুর ও গরীব কৃষকেরা কৃষক আন্দোলনের পুরোভাগে প্রধান শক্তি হিসাবে এগিয়ে এসেছে। মাঝারি কৃষকের স্তর হতে গরীব কৃষকদের স্তরে কৃষক আন্দোলনের ভিত্তি পরিবর্তনের লক্ষণ ২ বছর আগেই দেখা গিয়েছিল। ১৯৬৭ সালে এই প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল। কিন্তু, এই ভিত্তি তখনও তেমন পোক্ত হয়ে উঠেনি। বর্তমানে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায়, যে রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই এই গরীব অংশ সামনে এগিয়ে এসেছে এবং এ বিষয়ে কৃষক আন্দোলনের আগের অনেক জড়তা কেটেছে। এটা নিঃসন্দহে কৃষক সংগ্রামকে বর্তমানে অভূতপূর্ব গতি দিয়েছে। আগামী দিনে একে আরও সংহত করা এবং রাজনৈতিক চেতনায় শিক্ষিত বা উন্নত করা কৃষক নেতৃত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আর একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই কৃষক সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মেহনতী কৃষকেরা রাষ্ট্রযন্ত্র ও বিচার বিভাগের শ্রেণী চরিত্র বুঝতে শিখছে। জনসাধারণ শুধুমাত্র বক্তৃতার মধ্য দিয়ে বোঝে না, তারা সঠিকভাবে বুঝতে পারে প্রধানতঃ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রের কথা বহুদিন আগে কমরেড কার্ল মার্কস বলে গেছেন, এই প্রশ্নেকোটি কোটি বইও ছাপা হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র এই সব বই পড়ে বা তার উদ্ধৃতি শুনে জনসাধারণ দেশে দেশে বিপ্লবী প্রস্তুতি গড়ে তোলে নি। তাই কমরেড লেনিন বলেছিলেন—যে জনগণ শিখবে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, নেতৃত্বের কাজ হলো জনগণের চোখের সামনে তা তুলে ধরা এবং সেই অভিজ্ঞতাই তাদের শিক্ষিত করে তোলে। গত কয়েক

মাসে পশ্চিমবঙ্গের মেহনতী কৃষকেরা যখন তাদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে দুর্বার গতিতে আন্দোলনে নেমেছে—তখন তারা পদে পদে দেখেছে কি ভাবে সংবিধান ও কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায় ও দাঁড়িয়েছে; কিভাবে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা জটিলতার সৃষ্টি করেছে এবং কি ভাবে আইনের প্রক্রিয়ার ব্যভিচার করে জমিদার-জোতদাররা ন্যায় বিচারকে গলা টিপে মারবার চেষ্টা করেছে। হাজার বক্তৃতায় কৃষকদের যে কথা বোঝানো যেত না, এই তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের সে কথা বোঝাতে সাহায্য করেছে। কিন্তু কৃষকেরা আপনা হতেই এ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিতে পারে না। কৃষক সংগ্রামের বিপ্লবী নেতৃত্বের কাজ হোল কৃষকদের কাছে এই সব অভিজ্ঞতার তাৎপর্য তুলে ধরা, রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র সম্বন্ধে তাদের শিক্ষিত করে তোলা এবং প্রচলিত রাষ্ট্র কাঠামোর বদলে সম্পূর্ণ নূতন রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করা।

অগ্রগতির সমস্যা

কৃষক সংগ্রামের ব্যাপ্তি, গভীরতা, তীব্রতা ও চরিত্রের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তাতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী কর্মীদের বিশেষ করে কৃষক কর্মীদের গর্ববোধ করার আছে। কিন্তু, এতে আত্মসন্তুষ্ট হলে খুবই ভুল হবে। সময়ের চাহিদা ও অগ্রগতির সম্ভাবনা বিচার করলে দেখা যাবে যে অনেক কিছু করার আছে,—সংগ্রামের দুর্বলতার দিকও আছে।

আজ একান্ত প্রয়োজন হোল জরুরী মনোভাব নিয়ে কৃষক সংগ্রামের নূতন গতিধারাকে দ্রুত পুষ্ট করা এবং সংগ্রামী কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ করে তোলা। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যের সঙ্গে কৃষক সংগ্রামকে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করা এবং সচেতন শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান সহযোগী শক্তি হিসাবে কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের উপযোগী করে গড়ে তোলা আজকের প্রধান কর্তব্য হিসাবে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস এই শিক্ষা দেয়—যে নির্দিষ্ট স্তরে বিপ্লবের রাজনৈতিক লক্ষ্যকে বাদ দিয়ে কৃষক সংগ্রাম অন্য নিরপেক্ষভাবে চলতে পারে না। রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব ও ভিয়েতনামের বিপ্লব দেখিয়ে দিচ্ছে, যে রাজনৈতিক কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন স্তরে কৃষক আন্দোলনের শ্লোগান ও শ্রেণী বিন্যাস স্থির করতে হয় এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এগুলিও পরিবর্তন করতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষক সংগ্রামকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক চেত-

নায় পুষ্ট করতে হবে। স্বীকার করতেই হবে যে, এ বিষয়ে অনেক কিছু করতে হবে। আলোচ্য সময়ে সংগ্রামী কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা বেড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একথা আমরা এখনো বলতে পারি না যে, তা অর্থনীতিবাদী চিন্তার গন্ডী থেকে পুরোপুরি কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে। জমির সংগ্রাম জংগীরূপ নিলেই তা রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয় না। আশু কিছু পাবার মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হয়ে জংগী আন্দোলনে নামলেও তা অর্থনীতিবাদের প্রভাব মুক্ত হয় না। বিপ্লবের রাজনৈতিক কর্তব্য এবং নির্দিষ্ট স্তরে শত্রু-মিত্র সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে জংগী আন্দোলনও দিক ভ্রষ্ট হয়ে সংস্কারবাদ বা সংকীর্ণতার জালে আটক পড়ে যেতে পারে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করতে হবে—তার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রেণী সমাবেশের অংগ হিসাবে গ্রামাঞ্চলে জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে, গরীব কৃষকদের সংগ্রামের পুরোভাবে দাঁড়াতে হবে, মাঝারী কৃষকদের সংগে তাদের মৈত্রীর সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হবে। এই সামগ্রিক চেতনায় সংগ্রামী কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। একথাও বুঝতে হবে যে, রাজনৈতিক চেতনা গণ-আন্দোলনের মধ্য হতে আপনা আপনি আসে না। কৃষকের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বাইরে থেকে এই চেতনা দিতে হয়।

এইরূপ সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, যে কৃষক আন্দোলনে নূতন জোয়ার দেখা দিলেও তার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার দুর্বলতা আছে। তাই অবিলম্বে তা দূর করার দিকে কৃষক কর্মীর নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। পশ্চিমবংগে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক আন্দোলনই প্রধান। কৃষক সংগ্রামের দুর্বার গতিবেগ এই ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয়েছে। এই সংগ্রাম মূলতঃ সঠিক পথে চললেও কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু পিছুটান, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা অত্যুৎসাহ জনিত বাড়াবাড়ি, মাঝারি কৃষক বা সাধারণ মধ্য-বিত্তদের মনোভাব সম্বন্ধে সতর্ক না থাকা, কিছুটা মাতব্বরির ভাব এবং বিভেদের প্ররোচনা সম্বন্ধে অসতর্ক থাকা প্রভৃতির লক্ষণ দেখা গেছে। খুব অল্প ক্ষেত্রে এই ঝোঁক আত্মপ্রকাশ করলেও একে উপেক্ষা করা উচিত নয়। অন্য দিকে সংগ্রামী কৃষকদের মধ্যে যদি সহজ অগ্রগতির ধারণা থাকে এবং কঠিন সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে যদি তাদের সামনে চেতনাবোধ না থাকে তা হলে ভবিষ্যতে ক্ষতি হবে। কৃষক কর্মী ও সংগ্রামী কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির দ্বারা তাদের ভাবী কর্তব্য পালনের যোগ্য করতে হবে। প্রতি স্তরে আন্দোলনের যোগ্য নেতৃত্ব ও রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে।

গরীব কৃষক ও খেতমজুরেরা নিঃসন্দেহে কৃষক সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। এটা যেমন খুব ভাল ঘটনা, তেমনি এর থেকে কৃষক ঐক্যের প্রশ্নে কিছু নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে। কৃষকদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্কের পুরোণো ভারসাম্য বদলে গেছে। আগে অনেক স্থানেই মাঝারি কৃষক বা গ্রাম্য মধ্যবিত্তরা কৃষক আন্দোলনের পরিচালনার স্থানে ছিল। কিন্তু এখন তার স্থান পরিবর্তন হয়েছে—খেতমজুর ও গরীব কৃষকেরা এখন কৃষক আন্দোলনের প্রথম সারিতে এসে গেছে। ফলে মাঝারি স্তরের মধ্যে কিছুটা আড়ষ্ট ভাব ও গরীবদের মধ্যে কিছুটা সংকীর্ণতার ঝোঁক দেখা দিতে পারে। আমি জানি না কৃষক কর্মীরা এই দিকে নজর দিয়েছেন কিনা। এদিকে লক্ষ করা কৃষক কর্মীদের একান্ত প্রয়োজন। খেতমজুর ও কৃষকের ভিত্তিতে সত্যকার সংগ্রামী কৃষক ঐক্য গড়ার বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তাই, বিভিন্ন স্তরের কৃষকদের প্রতি সঠিক দৃষ্টি দিয়ে এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে মেহনতী কৃষকদের সত্যকার ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

কৃষক সংগ্রামের অগ্রগতিকে সামন্তবাদী জোতদার-মজুতদার ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মেনে নিতে পারে না। তারা এর বিরুদ্ধে সব দিক দিয়ে চক্রান্ত করছে ও করবে। যেখানে সম্ভব সেখানে তারা প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ সংগঠিত করছে। ফসল কাটার সময় তারা মরিয়া হয়ে উঠবে। ফলে শ্রেণী সংঘাত তীব্রতর হবে। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকায় সর্বক্ষেত্রে জোতদারদের পক্ষে সোজাসুজি আক্রমণ সংগঠিত করা সহজ হয় নাই। তাই, তারা অন্য কৌশলও গ্রহণ করেছে। কংগ্রেস দ্রুত ভেংগে পড়ায় এদের কেউ কেউ যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদের আড়ালে থেকে বিভেদ ও বিরোধ চক্রান্ত করছে। শরিকী সংঘর্ষের পিছনে এর প্রভাব বেশ কিছুটা কাজ করছে। অবশ্য ঈর্ষা, দল বাড়াবার সস্তা মধ্যবিত্ত সুলভ মনোভাব এবং কৃষক আন্দোলনে সংকীর্ণতার প্রভাবও এর মধ্যে আছে। কৃষক সংগ্রামের সর্বপ্রধান সংগঠক ও পুরোধা শক্তি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি।

তাই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, যে জোতদার-মজুতদার ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এই পার্টির বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করবে। লক্ষ্য করতে হবে, যে কমিউনিস্ট নামধারী সংশোধনবাদী গোষ্ঠী ও যুক্তফ্রন্টের মধ্যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী জেহাদে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। এদের রাজনীতি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনীতি নয়, এদের হোল কংগ্রেস নেতৃত্বের তথাকথিত প্রগতিশীল অংশের পিছনে জনগণকে সমবেত করা। ঘনীভূত সংকট যখন শ্রমিকশ্রেণীর

নেতৃত্বে জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী মোর্চা গঠনকে আশু কর্তব্য হিসাবে সামনে উপস্থিত করেছে, তখন এরা কংগ্রেসের "প্রগতিশীল" অংশের পিছনে জোটারই নূতন প্রেরণা পেয়েছে। তাই তারা সম্প্রতি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী জেহাদে মেতে উঠেছে। এই বিভেদ প্রচেষ্টার বিপদ সম্বন্ধে সংগ্রামী কৃষক আন্দোলনকে সচেতন হতে হবে। জনগণকে সচেতন করে এবং কোনরূপ সংকীর্ণতার মনোভাব না রেখে সমস্ত মেহনতী কৃষকের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সাড়া জাগিয়ে এই বিভেদ চক্রান্তকে পরাস্ত করতে হবে।

পরিশেষে আবার বলতে চাই—ভারতের রাজনৈতিক আকাশে সংকটের কালো মেঘ যে কোন সময়ে ঝড়ের দাপট সৃষ্টি করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষকের সংগ্রামী অভিযান এই বিপদের মোকাবিলা করার আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে। এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্য কৃষক সংগ্রাম আরো বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দেশহিতৈষী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৬৯

৫ নভেম্বর বিপ্লব ও কৃষকের মুক্তি

মহান নভেম্বর বিপ্লবই পৃথিবীতে প্রথম বিপ্লব—যা মেহনতী কৃষক সমাজকে পরিপূর্ণভাবে মুক্তি দিয়েছে এবং যা তাকে শোষণহীন সমাজ গঠনের সহযোগী শক্তি হিসাবে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের পথে এগিয়ে দিয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এই বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে। অপর দিকে একথাও বলা যায় যে, শ্রমিক নেতৃত্বে সমগ্র রুশ দেশে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল বলেই নভেম্বর বিপ্লবও জয়যুক্ত হতে পেরেছে। নভেম্বর বিপ্লব সমস্ত শোষিত দেশগুলির কৃষকদের সামনে সত্যকার মুক্তিপথের আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছে।

ইতিহাসে রুশ বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

মধ্যযুগে জার্মানিতে ব্যাপক ও বীরত্বপূর্ণ কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল। কিন্তু বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহগুলিকে একসঙ্গে গ্রথিত করে মহান বিপ্লবের রূপ দেবার মতো উদীয়মান ধনিকশ্রেণীর বা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ছিল না বলে তা ব্যর্থ হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফরাসী বিপ্লবে বুর্জোয়া নেতৃত্বে কৃষক-বিদ্রোহ সফলতা লাভ করতে পেরেছিল। বিপ্লবের মাধ্যমে কৃষকেরা সামন্তযুগীয় শোষণ হতে মুক্তি পেয়েছিল, কিন্তু পুঁজির শোষণ হতে তারা মুক্তি পায় নি। বুর্জোয়া নেতৃত্বে ভূমি বণ্টন হয়েছিল বলে সামন্তবাদী শোষণ মুক্ত কৃষকদের মধ্যে নূতন শ্রেণী ভেদ গড়ে উঠবে, তাঁরা অবাধ পুজিবাদী বিকাশেরই শিকার হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্মানিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অঙ্গ হিসাবে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই সংগঠিত শক্তি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পৃথক সত্তা দেখা দেবার ফলে বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবী ক্ষমতা হারিয়ে আপোসমুখী হয়েছে। অথচ শ্রমিকশ্রেণী তখনও নেতৃত্ব দেবার মতো শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি। তাই, বিপ্লব সফল হতে পারল না এবং কৃষক সমাজ সামন্তবাদী শোষণ হতেও মুক্তি পেল না। তার বদলে পরবর্তীকালে বুর্জোয়াশ্রেণী আপোষে উপর হতে সামন্তবাদী জমিদার ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী জমিদারী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার জন্য নিজেদের সংকীর্ণ বুর্জোয়া স্বার্থে চেষ্টা করেছে। তার চাপে কৃষক আরো নিঃস্ব ও পিষ্ট হয়েছে। ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের প্যারিস শহরে শ্রমিকশ্রেণী

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিল। কিন্তু গ্রামের কৃষকদের সংগে এই বিপ্লবী শক্তি যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে নি। ফরাসী বিপ্লবে বুর্জোয়া-নেতৃত্বের সহযোগিতায় কৃষকেরা জমি পেয়েছিল বলে তারা বুর্জোয়া প্রভাবে থেকে গিয়েছিল। প্যারি কমুন বিধ্বস্ত হওয়ার অন্যান্য কারণের মধ্যে এটা ছিল অন্যতম বড় কারণ।

রুশ বিপ্লবই হল পৃথিবীর প্রথম বিপ্লব যা এই সব সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত ছিল এবং ঐতিহাসিক কারণেই তা বাস্তব ছিল। বিংশ শতাব্দীতে যখন বিশ্বে পুঁজিবাদ পচনশীল সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। যখন শ্রমিকশ্রেণী পৃথক রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তখন আধা-সামন্তবাদী স্বৈরতান্ত্রিক দেশেও বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবী ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। রুশ দেশের সেই অবস্থা ছিল। এই অবস্থায় সামন্তবাদ-বিরোধী ও স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক কৃষক বিপ্লবকে সফলতার পথে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্ব নিয়ে যেতে পারে। অন্য দিকে এমনি নেতৃত্ব দেবার মতো শ্রমিকশ্রেণীও রুশদেশে ছিল এবং সচেতন প্রচেষ্টায় তারা যোগ্যতাও অর্জন করেছিল।

কমরেড লেনিনের পার্টির মার্কসবাদী নেতৃত্বে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী এবং তার সংগে কৃষক-বিপ্লবের সংযোগ স্থাপন—রুশ বিপ্লবকে বিশেষ তাৎপর্য দিয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল বলেই রুশ বিপ্লব সামন্তবাদ-স্বৈরতন্ত্র বিরোধী গণতান্ত্রিক স্তরেই থেমে যায় নি। তা এই বিপ্লবের কর্তব্যকে পরিপূর্ণভাবে সমাধা করে পরবর্তী পুঁজিবাদ-বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণতি লাভ করেছে। কৃষক সমাজ শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের সহযোগী হয়ে সমস্ত শোষণ হতে পূর্ণ মুক্তির পথ পেয়েছে। অন্য দিকে এ কথাও সমভাবে সত্য যে, শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে সংগঠিত করার সংগে সংগে প্রথম হতে সচেতনভাবে কৃষকদের বিপ্লবী শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে, তাকে পথ দেখাতে ও তার সংগে সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছিল বলেই সংগ্রামের সংগে দেশব্যাপী কৃষক বিদ্রোহকে যুক্ত করতে পেরেছিল এবং তার নিজের মুক্তির জন্য চরম লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করতে পেরেছিল। মহান নভেম্বর বিপ্লবের এই শিক্ষা সারা দুনিয়ার শ্রমিক-কৃষকের মুক্তি-সংগ্রামের পথকে আলোকিত করেছে।

কমরেড লেনিনের বিশ্লেষণ

নভেম্বর বিপ্লবের নেতা, পথ প্রদর্শক ও স্থপতি কমরেড লেনিন প্রথম হতেই রুশ বিপ্লবে কৃষকের বিপ্লবী ভূমিকার অপরিসীম গুরুত্ব

বুঝেছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি শ্রমিকদের মার্কসবাদের পতাকাতলে সংগঠিত করা ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি গঠন করার সংগ্রামের সংগে সংগে কৃষক-বিপ্লব সম্বন্ধে গভীরভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন। সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেমন তাঁকে পার্টি গড়তে হয়েছে। তেমনি কৃষকদের সম্বন্ধে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের নাক সিঁটকানো মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাঁকে কৃষকদের বিপ্লবী শক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীকে সচেতন করতে হয়েছে এবং সংগে সংগে কৃষকদের সচেতন করতে ও সংগঠিত করতে তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন।

১৯০১ সালেই তিনি 'শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি ও কৃষক' প্রবন্ধে স্পষ্ট করে বলেছেন—যে 'ভূমি দাসত্বের অবশেষগুলিকে ঝেঁটিয়ে দূর করার প্রশ্ন··· ইতিমধ্যেই জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে এবং যে পার্টি নিজেকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের অগ্রণী বলে দাবি করে সে একে উপেক্ষা করতে পারে না।' তিনি এই কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেন নাই! কেমন ভাবে কৃষকদের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের চেতনা কোন্ স্তরে নিয়ে যেতে হবে তাও তিনি আলোচনা করেছেন। নির্দিষ্ট, আশু ও জরুরী দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে তাদের সংগঠিত করতে হবে। কিন্তু তাদের চেতনাকে এর মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। তিনি বলছেন, যে কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রসারিত করতে হবে, তাদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়াতে হবে। কমরেড লেনিন ১৯০২ সালের প্রথম কৃষক বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ আলোচনা করে এই শিক্ষাই তুলে ধরেছেন—যে "অভ্যুত্থানের সাফল্যের জন্য নিশ্চয়ই সচেতন রাজনৈতিক লক্ষ্য থাকতে হবে; আগে প্রস্তুতি করতে হবে; সারা রুশ দেশে তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং শহরের শ্রমিকশ্রেণীর সংগে তার মৈত্রী থাকতে হবে।" প্রথম থেকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে রুশের শ্রমিকশ্রেণী কৃষক সংগ্রামকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে।

সাম্রাজ্যবাদী যুগে রুশ দেশে পুঁজিবাদ বেশ কিছুটা গড়ে উঠলেও যে দেশ ছিল আধা-সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী দেশ। তাই গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করার লক্ষ্যটাই ছিল আশু লক্ষ্য। কিন্তু বিপ্লব এই স্তরে থেমে যেতে পারে না, কারণ পুঁজির শোষণ ও শাসন যতদিন বজায় থাকবে, ততদিন শ্রমিকশ্রেণী মুক্তি পেতে পারে না। তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল শ্রমিকশ্রেণীর চরম লক্ষ্য। বিপ্লবের এই দুই স্তরের মধ্যে পার্থক এবং একটি শেষ করে না থেমে অপরটিতে উত্তরণ সম্বন্ধে কমরেড লেনিনের সিদ্ধান্ত কোন মনগড়া সিদ্ধান্ত ছিল না,—বাস্তব শ্রেণী-বিশ্লেষণ ও শ্রেণী সমাবেশের উপরই তা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সমসাময়িক জমিদারী অর্থনীতিতে ভূমিদাসত্ব ও পুঁজিবাদ—উভয়েরই লক্ষণ মিশ্রিত থাকে। তাই, কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীভেদও কম বেশি দেখা দেয়। ধনী, মাঝারি ও গরিব কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীভেদ বাস্তব সত্য। সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারীরা এই সত্যকে গোপন করে কৃষক সমাজকে একই রকমের একই সমস্বার্থ সম্পন্ন শ্রেণী-হিসাবে চিত্রিত করে দেখাতে চেয়েছিল, যে সামন্তবাদী জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ হলেই কৃষকেরা মুক্তি পেয়ে যাবে। কমরেড লেনিন প্রথম হতেই এই মনোরম চিত্রের মুখোশ খুলে ধরে দেখিয়েছিলেন, যে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী পার্থক্য আছে এবং সামন্তবাদী জমিদারী ব্যবস্থা দূর হলেও সব কৃষক মুক্তি পাবে না। গরিব কৃষক ও খেতমজুরেরা পুঁজির দ্বারা শোষিত হতে থাকবে। সামন্তবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের বিরোধিতা ধনী কৃষকেরাও করে। তাই গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সমস্ত কৃষকরাই থাকতে পারে। সমস্ত কৃষকের সংগে মিলে শ্রমিকশ্রেণী গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করবে। কিন্তু তখনও পুঁজিবাদের শোষণ থাকবে। গ্রামের ধনী কৃষক ও গরিব কৃষকের মিল তখন আর থাকতে পারে না। ধনী কৃষক স্বভাবতই শোষণকারী হিসাবে পুঁজির শাসনের পক্ষে দাঁড়াবে, অন্য দিকে গ্রামের খেতমজুর ও গরিব কৃষক পুঁজির লুণ্ঠনে পিস্ট হবে। তারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর সংগী হবে। এখানেই গ্রামের গরীবের সংগে শহরের শ্রমিকশ্রেণীর মিল।

তাই, গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সকল কৃষক থাকলেও, তার মধ্যে যতই গ্রামের খেতমজুর ও গরিব কৃষকেরা বেশী বেশী সংগঠিত হবে, যতই তাদের সংগে শহরের শ্রমিকশ্রেণীর বিশেষ মিতালী দৃঢ়তর হবে। ততই গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিপূর্ণভাবে সার্থকতা লাভ করবে এবং ততই বিপ্লব দ্রুত পরবর্তী চূড়ান্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে পৌঁছাবে। তাই কমরেড লেনিন একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা এবং তার জন্য সমস্ত কৃষকের সংগে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রীর উপর জোর দিয়েছেন, তেমনি একই সংগে গ্রামের গরীব ও খেতমজুরদের বিশেষভাবে সংগঠিত করার ও তাদের সংগে শহরের শ্রমিক-শ্রেণীর বিশেষ মৈত্রীর উপর জোর দিয়েছেন। যাঁরা দুই বিপ্লবকে গুলিয়ে ফেলতে চেয়েছেন তিনি যেমন তাদের বিরুদ্ধে বলেছেন, তেমনি যাঁরা দুই স্তরের মধ্যে চীনের প্রাচীরের মতো পার্থক্য দেখাতে চেয়েছেন—যাঁরা এক স্তর হতে অন্য স্তরে উত্তরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখেন নাই, তাদেরও তিনি বিরোধিতা করেছেন। প্রচার পুস্তিকা হিসাবে "গ্রামের গরিবদের প্রতি" বই খানির গুরুত্ব এই দিকে অপরিসীম।

কমরেড লেনিন প্রথম হতেই আর একটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর

দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—যে সামন্তবাদ ও স্বৈরতন্ত্র হতে কৃষকদের মুক্তি একমাত্র নিচে থেকে কৃষকদের বিপ্লবী শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমেই হতে পারে। উপর হতে বুর্জোয়া বা পেটিবুর্জোয়া সংস্কার প্রচেষ্টায় তা হতে পারে না। এতে সীমাবদ্ধ বুর্জোয়া বিকাশ হতে পারে, কিন্তু তাতে সাধারণ কৃষকদের আরো নিঃস্ব করে তোলা হয়। সেই জন্য বিপ্লবী কৃষক কমিটি গড়ে তোলা এবং তার মাধ্যমে জমিদারী বাজেয়াপ্ত করার জন্য বিপ্লবী সংগ্রাম সংগঠিত করাকে তিনি প্রধান কাজ হিসাবে তুলে ধরেছেন।

এই সমস্ত শিক্ষায় রুশের শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিক পার্টি প্রথম হতে শিক্ষিত হয়েছিল বলেই এবং এই শিক্ষার আলোকে কৃষকদের সংগঠিত ও সচেতন করার প্রচেষ্টা হয়েছিল বলেই মহান নভেম্বর বিপ্লব সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সফল হতে পেরেছে। এই শিক্ষাগুলি সারা পৃথিবীতে শ্রমিকশ্রেণী ও সংগ্রামী কৃষকদের নিকট খুবই মূল্যবান।

নভেম্বর বিপ্লবের প্রস্তুতি

কৃষক বিপ্লব এক দিনে গড়ে ওঠে নাই। উপরোক্ত শিক্ষার ভিত্তিতে ও বাস্তব সংগ্রামে অর্জিত অমূল্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই শ্রমিক-কৃষকের অপারেজয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল। কৃষকরা বুর্জোয়া প্রভাবে থাকবে অথবা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে—এই প্রশ্ন থেকেছে বহুদিন। ১৯০৫ সালের বিপ্লব এবং তৎপরবর্তী প্রতিক্রিয়ার সময় ও যুদ্ধের মধ্যে কৃষকেরা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে এসেছে। কমরেড স্তালিন বলেছেন যে, এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে না গেলে কৃষকেরা বুর্জোয়াশ্রেণীর বেইমানী বুঝতে পারত না (শুধু প্রচারের দ্বারা)।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটাল, কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যা অন্যতম প্রধান কাজ—সামন্তবাদী শোষণ হতে কৃষকদের মুক্তি—সেই কাজ অপূর্ণ থেকে গেল। রাষ্ট্র ক্ষমতার দিক দিয়ে বিপ্লব শ্রমিক বিপ্লবের স্তরে উন্নীত হল, কিন্তু বুর্জোয়া শাসনের অবসান ছাড়াও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্বও পড়ল তার উপর। সেই কারণেই সমস্ত কৃষক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিল। আট মাসের দ্রুত ঘটনাবলী কৃষকের সামনে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতাই শুধু প্রকাশ করল না, বুর্জোয়াদের সহযোগী পেটি বুর্জোয়া পার্টিগুলিরও দেউলিয়াপনা প্রমাণ করে দিল। কমরেড স্তালিনের কথায়,—এই অভিজ্ঞতা না হলে নভেম্বর বিপ্লব এত দুর্বার এত সহজে জয়যুক্ত হতে পারত না। জমি

ও শান্তি এই প্রশ্ন সমস্ত কৃষকদের নাড়া দিয়েছিল এবং তারা বুঝেছিল যে একমাত্র শ্রমিক বিপ্লবই তাদের মুক্তি দিতে পারে। তা ব্যাপক শ্রমিক বিদ্রোহের সংগে সারা দেশব্যাপী কৃষক বিদ্রোহ যুক্ত হয়ে মহান নভেম্বর বিপ্লবকে সার্থক করে তুলল। শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রথম দুটি ঘোষণাই হল—শান্তি ও জমি।

এই দুটি প্রধান সমস্যার সমাধান আগে হয় নি বলেই সমস্ত কৃষক নভেম্বর বিপ্লবে শ্রমিকের পাশে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু, এই কর্তব্য সমাধা হবার পর যখন শ্রমিক রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি বিপ্লবী আক্রমণের সম্মুখীন হল। তখন ধনী কৃষক তার স্বাভাবিক শ্রেণী-চরিত্র অনুযায়ী শ্রমিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গেল। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর সংগে গরিব কৃষকের ঐক্য সব কিছু বাধাকে অতিক্রম করে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে গেল। ১৯১৮ সালে গরিব কৃষকদের কমিটিগুলি অপূর্ব বিপ্লবী শক্তির পরিচয় দিয়েছে। নভেম্বর বিপ্লবের অবদান (জমি ও শান্তি) এবং গরিব কৃষকের উদ্যোগ মাঝারি কৃষককেও শ্রমিক রাষ্ট্রের সহযোগী করেছিল। ফলে নূতন অবস্থায় শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তি সুদৃঢ় হল।

সমাজতন্ত্র গঠনে কৃষক

নভেম্বর বিপ্লব শুধু কৃষকদের মুক্তিই দিল না, পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক যৌথ খামার আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষককে সমাজতন্ত্র গঠনের সহযোগী শক্তিতে পরিণত করল। বিপ্লবে কৃষক জমি পেল, কৃষকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত চাষ ও পণ্য বিনিময়-ব্যবস্থা বেশি দিন চললে অর্থনীতির অনিবার্য নিয়মে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী ভেদ বাড়তে ও পুঁজিবাদ সৃষ্টি হতে বাধ্য। অন্য দিকে ক্ষুদ্র কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধিকেও সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য। তাই প্রশ্ন দাঁড়াল, উন্নত সমাজতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থার দিকে যেতে হবে। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে কৃষক কোন পক্ষে যাবে? কৃষক কি ব্যক্তিগত চাষের মায়া ছেড়ে সমাজতন্ত্রে যেতে পারে? সংস্কারবাদী ও অতি বিপ্লবীরা কৃষকদের বিপ্লবী সম্ভাবনা ও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতায় আস্থা রাখেনি। তাই তারা মনে করেনি কৃষক-প্রধান রুশ দেশে সমাজতন্ত্র গঠন সম্ভব।

কিন্তু, কমরেড লেনিন ও পরে কমরেড স্তালিন ঘোষণা করলেন, যে কৃষকের সহযোগিতায় শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লব করেছে, তাকে রক্ষা করেছে এবং একে ভিত্তি করেই সমাজতন্ত্র গঠন করা নিশ্চয়ই যাবে। যেহেতু রাষ্ট্রের নেতৃত্ব আছে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে, যেহেতু শ্রমিকশ্রেণীর হাতে কৃষকের

প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহের জন্য শিল্প-ব্যবস্থা আছে এবং যেহেতু বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী অবশ্যই কৃষকের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে। সেহেতু এই সবকে কাজে লাগিয়ে, বুঝিয়ে ও সাহায্য করে কৃষককে স্বেচ্ছামূলক সমবায়ের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র গঠনে সহযোগী করা যাবে। নভেম্বর বিপ্লবের স্বাভাবিক পরিণতি হলেও, কৃষি সমবায় গঠনের সংগ্রামকে প্রকৃতপক্ষে আর একটা বিপ্লব বলা যেতে পারে। পৃথিবীর জনগণের সামনে কৃষিতে সমাজতন্ত্র গঠনের পথ পরিষ্কার হল। বৃহৎ আকারের কৃষির পথ, উন্নত চাষের কাজে ক্রমোন্নত যন্ত্র ব্যবহারের পথ, কৃষির অবাধ উন্নতির পথ উম্মুক্ত হল। কিন্তু তা ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে শোষণের বাহন হল না; হল শোষণহীন যৌথ সমাজতান্ত্রিক চাষ। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী কৃষক হয়ে উঠল সমাজতন্ত্রের সক্রিয় সংগঠক। নভেম্বর বিপ্লবের এই পরবর্তী অধ্যায় সারা দুনিয়ার শ্রমিক-কৃষককে অগ্রগতির নূতন পথের সন্ধান দিল।

কৃষির ক্ষেত্রে বর্তমান সংশোধনবাদী বিচ্যুতি

দুঃখের বিষয় যে কমরেড স্তালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সংশোধনবাদীদের হাতে চলে গেছে। তারা কৃষির ক্ষেত্রে মহান নভেম্বর বিপ্লবের ঐতিহ্যকে সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার বদলে তাকে পিছনে দিকে টান দিচ্ছে। সমবায় খামারগুলি সমাজতান্ত্রিক যৌথ সম্পত্তি হলেও এগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ন্যায় সমগ্র জনগণের সম্পত্তি নয়। এগুলি কিছু সংখ্যক পরিবারের গোষ্ঠীগত সম্পত্তি। কোন কারখানার শ্রমিক সেই কারখানাকে তাদের নির্দিষ্ট সম্পত্তি মনে করে না। কিন্তু সমবায় খামারগুলি হল তাদের সভ্যদের গোষ্ঠীগত সম্পত্তি। বিভিন্ন যৌথ খামারের আর্থিক সংগতি অনুযায়ী তাদের সভ্যদের অবস্থাও নির্ণীত হয়। তাই, সাম্যবাদে পেঁছাতে হলে কীভাবে এই গোষ্ঠীগত সম্পত্তিকে গোষ্ঠীর পরিধি হতে বের করে জাতির সকলের সম্পত্তিতে পরিণত করা যায়—তাই হল বর্তমানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

কমরেড স্তালিন তাঁর ঐতিহাসিক "সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী" নামক পুস্তকে মার্কসীয় দৃষ্টিতে এর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে জমি হল রাষ্ট্রের সম্পত্তি, মেসিন ও ট্রাকটর স্টেশনগুলি হল রাষ্ট্রের সম্পত্তি। একমাত্র যৌথ খামারের উৎপন্ন মালগুলি হল গোষ্ঠীগত সম্পত্তি। এদের উদ্বৃত্ত ফসল পণ্য হিসাবে বাজারে কেনাবেচা হয়। পণ্য বিনিময় প্রথা হল ব্যক্তিগত উৎপাদন ব্যবস্থা—যা হতে পুঁজিবাদ গড়ে ওঠে—তারই অংশ। তিনি বলেছিলেন, যে শিল্প ও কৃষির উৎপাদন

বৃদ্ধির সংগে সংগে পণ্য বিনিময়ের বদলে বিভিন্ন কারখানার মধ্যে যেভাবে মালের আদান প্রদান হয়, সেইভাবে এক্ষেত্রেও ধাপে ধাপে মালের আদান প্রদান ব্যবস্থা চালু করতে পারলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ন্যায় কৃষি খামারগুলিকে জাতীয় সম্পত্তির পর্যায়ে উন্নীত করা যাবে। কোন কোন কমরেড প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, মেসিন ও ট্রাকটর স্টেশনগুলি তুলে দিয়ে এগুলি যৌথ খামারকে বিক্রী করে দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি এর বিরোধিতা করে দেখিয়েছিলেন যে, এতে পিছন দিকে যাওয়া হবে। কারণ কৃষির উন্নতির জন্য নিত্য নূতন উন্নত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। পুরণো যন্ত্র বাতিল করে নূতন যন্ত্র কাজে লাগাতে যে বিরাট খরচ হয়, একমাত্র রাষ্ট্রই তা বহন করতে পারে। যৌথ খামারগুলির অবস্থা যতই ভালো হোক না কেন, তাদের পক্ষে এ খরচ নিয়মিত বহন করা সম্ভব নয়। ফলে উৎপাদনের অবাধ উন্নতির গতি হ্রাস পাবে।

দ্বিতীয়ত, এতে গোষ্ঠীগত সম্পত্তিকে জাতীয় সম্পত্তিতে উন্নীত করার বদলে, যে যন্ত্রপাতি এখন রাষ্ট্রের সম্পত্তি হয়ে আছে তাকেও গোষ্ঠীর হাতে দেওয়া হবে এবং ফলে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্র সংকুচিত করার বদলে আরো প্রসারিত করা হবে। কমরেড এংগলসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, এর ফলে সাম্যবাদের দিকে অগ্রগতির বদলে পুঁজিবাদের দিকেই মুখ ফেরানো হবে। তাই, এ প্রস্তাব মার্কসবাদ-বিরোধী এবং বর্জনীয়। দুঃখের কথা যে বর্তমান সোভিয়েত নেতৃত্ব এই বর্জনীয় পথই গ্রহণ করেছেন। মেসিন ও ট্রাকটর স্টেশনের যন্ত্রপাতি সমবায়গুলিকে বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই সংগে বিভিন্ন সমবায়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও মুনাফা অর্জনের মনোভাবকেই জাগিয়ে তোলা হচ্ছে।

আমরা বিশ্বাস রাখব যে মহান নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ হতে এই বিচ্যুতি হবে সাময়িক। কোন সন্দেহ নেই যে, নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষায় শিক্ষিত রুশের শ্রমিকশ্রেণী ও যৌথ খামারের কর্মীরা এ বাধা অতিক্রম করে বিপ্লবী আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমাদের পথ প্রদর্শক

নভেম্বর বিপ্লবের ৫০তম বার্ষিকী দিবসে আমরা তার আদর্শ ও শিক্ষাকে ঊর্ধে তুলে ধরব। আমাদের দেশের পক্ষে নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অবস্থার ছোটখাটো পরিবর্তনের সংগে শ্রমিকশ্রেণীকে বিভিন্ন সময়ে নানা কৌশল নিতে হতে পারে। কিন্তু, বিপ্লবের লক্ষ্য, শ্রেণী-সমাবেশ ও বিপ্লবের পথ সম্বন্ধে নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা আমাদেরও পথ প্রদর্শক হিসাবে রয়েছে।

—গণশক্তি, ৫০তম নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৬৭

একটি পুলিশ-রাজ কায়েমের চক্রান্তের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে পশ্চিম-বাংলার জনগণ যখন অধিকতর ঐক্য ও সাহসের সাথে এগিয়ে চলেছে। যখন মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবী জনগণের সংগ্রামী দাবীতে পরিণত হয়েছে। ঠিক সেই সময় কলিকাতা ও মফস্বলের কিছু দেওয়ালে কিছু পোষ্টার পড়েছে, তাতে লেখা আছে, "মধ্যবর্তী নির্বাচন নয়, আইন অমান্য আন্দোলন নয়,—চাই সশস্ত্র বিপ্লব।"

বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রেণী শাসনেরই অন্যতম একটা রূপ, সংসদীয় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধ অধিকার পর্যন্ত আজ বুর্জোয়া-জমিদারদের শ্রেণী শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, ক্রমবর্ধমান সংকটের পটভূমিকায় ঠিক এই সীমাবদ্ধ অধিকারগুলিকে কাজে লাগিয়েই শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ তাদের শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করে তুলছে। সেই কারণেই, সংসদীয় গণতন্ত্রকে জবাই করে একটা পুলিশ-রাজ কায়েম করার চেষ্টা চলেছে। এই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম সবিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে।

প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকেই পুষ্ট করে

এটি এমন একটি সংগ্রাম যা জনগণের ব্যাপকতম অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং প্রতিক্রিয়ার আক্রমণকে সহ্য করেও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার-গুলিকে রক্ষা করতে ও তাদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এ রকম একটা সংগ্রাম না করার অর্থ হল, প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের পথ খুলে দেওয়া। এই পরিস্থিতিতে উপরোক্ত পোষ্টারগুলির ক্ষতিকর তাৎপর্যটা বোঝার দরকার আছে।

এটা স্পষ্ট যে, তাদের উদ্দেশ্য হল গণতন্ত্রের সংগ্রাম ও মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবী হতে জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়া ও তাদের তা থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া। পোষ্টার লেখকদের মনোগত বাসনা যাই হোক না কেন, বাস্তব পরিণতির দিক থেকে তাদের শ্লোগানগুলি কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকারীদের উদ্দেশ্যের সাথে পুরাপুরি মিলে যাচ্ছে।

কংগ্রেস নেতৃত্ব, ডাঃ পি সি ঘোষের বেইমান গোষ্ঠীটি এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সব দল, যারা কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে অর্থাৎ বুর্জোয়া ও

জোতদারদের স্বার্থে ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনকে দমন করার জন্য পশ্চিম-বাংলায় পুলিশী সন্ত্রাস চালু করেছে। অত্যন্ত সহজবোধ্য কারণেই তারা সকলেই গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম ও মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবীর বিপক্ষে। কারণ, এই আন্দোলন যে শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী জনগণের সংগ্রামী শক্তিকে বাড়িয়ে তুলবে—এটা তারা জানে এবং তা সঠিকভাবেই জানে বলেই করছে।

কোন সন্দেহ নাই যে এতে বিপ্লব হবে না—এবং এই সংগ্রামের উদ্দেশ্যও সেটা নয়,—কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ভিতরে থেকেও সমাজের পরিবর্তন ঘটাবার উপযোগী বিপ্লবী শক্তির বিকাশ ঘটানোয় এটা সাহায্য করবে। পুলিশী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম এক দিকে শাসকশ্রেণী ও চক্রান্তকারীর দলের মুখোশকে আরও খুলে দেবে, সেই সংগে অন্য দিকে মেহনতী মানুষের সাহস ও সংগ্রামী শক্তিকেও বাড়িয়ে তুলবে। ফলে,তাদের সন্ত্রাস সৃষ্টির খোদ উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হবে। ক্রমবর্ধমান শোষণ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণী সংগ্রাম জোরদার হবে।

শাসকশ্রেণীর দল যদি জনগণকে আত্মসমর্পণ করাতে বা তাদের ভেংগে গুড়িয়ে দিতে না পারে এবং তারা যদি মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবী মানতে বাধ্য হয়, তাহলেও সমাজের কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে না। কিন্তু শাসক শ্রেণীর দল এটাও বুঝেছে, যে এই সব ঘটনার পরিণতি হিসাবে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি—যাদের মধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-ই হল প্রধান—তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে ও শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণ তাদের সংগঠন ও সংগ্রাম গড়ে তোলার আরও অধিকার আদায় করতে পারবে। শাসকশ্রেণী যদি এর পরেও পুলিশ ও ফৌজের সাহায্যে এই সব অধিকারকে জবাই করার পথে এগিয়ে যায়, তাহলে জনগণের প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়তে থাকবে; এক কথায়, শ্রেণী সংগ্রাম উচ্চস্তরে উঠবে।

শাসকশ্রেণী ও তাদের পদলেহীর দল এই সব কারণেই গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম ও মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবীর বিরুদ্ধে। কিন্তু এ সব কারণ তারা খোলাখুলি স্বীকার করতে পারে না। গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে তাদের আপত্তির আবরণ হিসাবে তারা আইন-শৃংখলার প্রশ্ন তোলে। কংগ্রেস সভাপতি নিজলিংগাপ্পা আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, যে গণতন্ত্র রক্ষা এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য নয়,—এটা সশস্ত্র বিপ্লবের একটা আবরণ। তিনি জানেন যে তিনি অসত্য বলছেন, তা সত্বেও তিনি গণতন্ত্রকে জবাই করার জন্য, তাদের চক্রান্তকে ঢাকবার জন্য এবং গণ-সংগ্রামের উপর তাদের বর্বর দমন নীতির আগাম সাফাই হিসাবে একথা বলছেন।

কে প্রকৃতপক্ষে শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষতি করছে ?

বুর্জোয়া-জমিদার রাজত্বের প্রতিনিধি কংগ্রেস বা তাদের দালালদের তরফে বিরোধিতার অর্থ বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমরা দেখছি যে, পোস্টারওয়ালারাও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের একই রকম ভাবে বিরোধীতা করছে। তফাৎটা শুধু এই যে, এরা এটা করছে বিপ্লবী বুলির আড়ালে। তাদের মতে, গণতন্ত্র রক্ষার এই সংগ্রাম আর মধ্যবর্তী নির্বাচনের এই দাবী বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে ক্ষতিকর। এই সংগ্রাম নাকি শাসকশ্রেণীকেই সাহায্য করবে,—এখন যা দরকার তা হচ্ছে সশস্ত্র বিপ্লব।

উভয় পক্ষই সেই একই কথা—'সশস্ত্র বিপ্লব'-এর নাম নিয়েই গণতন্ত্রের সংগ্রামের বিরোধীতা করছে, তবে দু-পক্ষ দু-ভাবে কথাটাকে ব্যবহার করছে। একপক্ষ যেমন শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলছেন, যে সশস্ত্র বিপ্লবকে আড়াল করার জন্যই এই গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম। আর অপর পক্ষ বলছে যে, এটা সশস্ত্র বিপ্লবের পথে একটা বাধা। কি অদ্ভুত মিল !

পোস্টারওয়ালারা হয়ত চটে গিয়ে জবাব দেবেন যে, তাদের কুৎসা করা হচ্ছে। কারণ, তারা সত্যই সশস্ত্র বিপ্লব চান এবং সেটা এই মুহূর্তেই ও এখনই। কিন্তু বিপ্লব যে মুষ্টিমেয় কিছু নেতা বা কর্মীর কাজ নয়,—এ সত্য সম্পর্কে কেউ চোখ বুঝে থাকতে পারেন না। বিপ্লব করে জনগণ। জনগণের অগ্রগতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে শাসকশ্রেণী তাদের বিপ্লবের পথে যেতে বাধ্য করে এবং জনগণ তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ধাপে ধাপে এর প্রয়োজনীয়তা বুঝেই সে পথে যায়। অক্টোবর বিপ্লব, চীন বিপ্লব, ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রাম ও ইন্দোনেশিয়ার প্রতি বিপ্লবের অভিজ্ঞতার পর বিপ্লব বলতে কি বোঝায় এবং তার জন্য কি ধরণের প্রস্তুতি দরকার,—সে সম্পর্কে কারও পক্ষে অজ্ঞ থাকা চলে না।

জনগণের সাথে বিন্দুমাত্র যোগ আছে এমন যে কোনও সুবুদ্ধি সম্পন্ন রাজনৈতিক কর্মীকেই এটা স্বীকার করতে হবে, যে কিছু ব্যক্তি বিশেষের মাথায় যাই থাক না কেন, পশ্চিমবাংলায় বাস্তব পরিস্থিতিটা বর্তমানে সে রকম নয়। গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে জনগণকে যোগ দিতে না দিয়ে, তাদের নিস্ক্রিয় রাখা এবং অন্ততঃ কিছুটা প্ররোচনা সৃষ্টি করা—এই পরিস্থিতিতে ঐ সব পোস্টারের আসল অর্থ একমাত্র এইটাই হতে পারে। সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদীরা যেমন সংসদীয় পথে সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের কথা প্রচার করে শাসকশ্রেণীর সেবা করে। অতি বিপ্লবীরাও তেমনি অন্যভাবে বিপ্লবী বুকনি বাজির আড়ালে বিপ্লবী

সংগ্রামের ক্ষতি করার মাধ্যমে শাসকশ্রেণীর সেবা করে,—লেনিনের এই উক্তি কত সঠিকই না ছিল। পোস্টার যারা লিখছেন তারা সকলে হয়ত এটা নাও জানতে পারেন। কিন্তু, যে ব্যক্তিরা তাদের চালাচ্ছেন তারা নিশ্চিত এটা জানেন।

যারা এই সব পোস্টার মারছেন, তারা প্রধানতঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) হতে বিতাড়িত সব লোক এবং তারা পার্টি বিরোধী বুলি সর্বস্ব চক্রের একটা ক্ষুদ্র অংশ। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা যখন ছিল তখন তারা এইভাবে যুক্তফ্রন্টের বিরোধীতা করেছে এবং তার উৎখাত চেয়েছে। এক্ষেত্রেও তাদের ও কংগ্রেসের উদ্দেশ্য একই ছিল, তবে এখনকার মতই অজুহাতটা ছিল ভিন্ন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও প্রতি-ক্রিয়াশীলদের অভিযোগ, যে তারা 'নকশালবাড়ী'র জন্ম দিয়েছে। আর অতি বিপ্লবীদের অভিযোগ, যে সেখানে পুলিশ পাঠানোর কাজে তারাও শরিক হয়েছে এবং বিপ্লবের উপর হামলা করেছে। তর্কের খাতিরে যদি মুহূর্তের তরেও মেনে নেওয়া যায় যে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ভুলই করেছে, তাহলেও বিপ্লব হবে অথচ পুলিশ ও ফৌজ আসবে না এবং অল্প কিছু পুলিশ গেলেই বিপ্লব হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে,—বিপ্লব সম্পর্কে এ কি ধরনের উদ্ভট ধারণা সেটা গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার।

বাস্তবে যা হয়েছিল, জমির জন্য কৃষকদের এক বলিষ্ঠ সংগ্রামকে 'রাজ-নৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম' বলে জাহির করা হল এবং তার উপরে, এই জমির সংগ্রাম বড় বড় জোতদারদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত না করে, ছোট বড় সমস্ত মালিকের বিরুদ্ধেই চালিয়ে দেওয়া হল। এই অতি বিপ্লবী বুকনীবাজরা কৃষক আন্দোলনের ক্ষতি করেছে। যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে তাকে দাঁড় করিয়েছে এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কায়েমী স্বার্থের হাতে হাতিয়ার তুলে দিয়েছে। নকশালবাড়ির তত্ত্ব কোন জঙ্গী গণ-সংগ্রামের তত্ত্ব নয়, চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন হঠকারীতা ও সংকীর্ণতাবাদের এটা এক জগাখিচুড়ি। (নকশালবাড়ির হঠকারী তত্বকে কৃষকদের শৌর্য ও জঙ্গী মনোভাবের সাথে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।) এই সব কারণে, অতি বিপ্লবীদের শ্লোগান ও কাজ গণ-সংগ্রামের বিকাশকে সাহায্য করার বদলে, প্রতি ক্রিয়াশীল শাসক চক্রের উদ্দেশ্যকেই সিদ্ধ করছে।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার ভূমিকা

বিষয়টি বোঝার জন্য অতি বিপ্লবীদের যুক্তিগুলো একটু সংক্ষেপে

বিশ্লেষণ করা দরকার। তাদের সাধারণ যুক্তিটা হল : যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী সভার গঠন হওয়া ও তাতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র অংশ গ্রহণের ফলে জনগণের মধ্যে সংসদীয় মোহ বাড়বে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), তাদের অভিযোগ মতে সংসদীয় পথে সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের কথা প্রচার করে একটা ঘোর সুবিধাবাদী দলে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির সাথে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার কোন তফাৎ তো নাইই, বরং যুক্তফ্রন্ট জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার মাধ্যমে গণ-আন্দোলনের বিকাশকে আরও বেশী ক্ষতি করেছে। জনগণ ইতিমধ্যেই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে, শুধু দরকার বিপ্লবের একটা ডাক দেওয়ার।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আলোচনার সময়ে আমরা এই শেষের যুক্তিটা নিয়ে আলোচনা করব। অন্যান্য যুক্তিগুলি এখন আলোচনা করা দরকার। প্রত্যেকটি যুক্তিই তাদের ভ্রান্ত।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) সংসদীয় পথে মৌলিক পরিবর্তনের কথা বলেছে—এর চেয়ে নোংরা কুৎসা কিছু হতে পারে না। ভুল পথের সাফাই গাইতে হলে কুৎসারই দরকার হয়। আমাদের পার্টি একেবারে সুরু থেকে এই কথা ঘোষণা করে আসছে এবং আমাদের প্রত্যেকটি নেতা ও আমাদের মন্ত্রীরা সব সময় জনগণের কাছে বলে এসেছেন যে, কোন মৌলিক পরিবর্তনই যে এ পথে হবে না—শুধু তাই নয়, ক্রমবর্ধমান সংকটকে পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ঠেকাতে পারবে না। তবে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গণ-আন্দোলনকে সাহায্য করতে পারবে এবং তার জন্য গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রসারিত করতে পারবে। এই সব সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শ্রমিক-কৃষকরা তাদের শ্রেণী-সংগ্রামে এগিয়ে যেতে পারবে এবং তার মাধ্যমে কিছু আংশিক দাবীও আদায় করতে পারবে। তাই, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্যই পার্টি বলেছে।

এই নীতি অনুসারে কাজ করতে গিয়ে কোন ভুল হয় নি বা কোন দুর্বলতা দেখা যায় নি—এমন কথা আমরা বলছি না। কিছু কিছু ভুল আমরা সংশোধন করে নিয়েছি, তা সত্ত্বেও অন্য কিছু ভুল ও দুর্বলতা থেকে গিয়েছিল। তবে সাধারণভাবে এই নীতি অনুযায়ীই কাজ হয়েছে বলেই, ব্যাপ্তি ও গভীরতায় শ্রেণী-সংগ্রাম বেড়েছে এবং ঠিক সেই জন্যই বৃহৎ বুর্জোয়া ও জোতদারেরা এত ক্ষেপে গেছে। বিশেষভাবে আবার আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে।

হঠকারীরা প্রশ্ন তুলছে : গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিশের ব্যবহার কি সম্পূর্ণ বন্ধ করা গেছে? আমলাতন্ত্রকে কি জনগণের স্বার্থে ঠিক মত

ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে? এর উত্তরে বলতে হয়—না, সম্ভব হয় নি। তা যদি সম্ভব হত, তাহলে মার্কসবাদ ভুল বলেই প্রমাণিত হত। এরকমভাবে সম্ভব হতে পারে বলে, কোন মার্কসবাদী কল্পনাও করতে পারেন না।

সেই জন্যই আমাদের পার্টি রাষ্ট্র যন্ত্রের এই সব অংশের শ্রেণী চরিত্র সম্বন্ধে লাগাতর ব্যাখ্যা করে এসেছে বা যাচ্ছে এবং অনেক সময় যুক্তফ্রন্ট ও মন্ত্রীসভা থেকে আলাদাভাবেই এটা করেছে। এটা না করাটা ভুল হত এবং সেইটাই হত সংশোধনবাদ। কিন্তু প্রশ্ন হল, বৃহৎ বুর্জোয়া ও জোতদাররা কংগ্রেস আমলের মত প্রশাসন যন্ত্রকে জো হুকুমমত ব্যবহার করতে পেরেছে, কি পারে নি। না, সেটা সম্ভব হয় নি।

মুষ্টিমেয় কিছু হঠকারীর দল হয়ত এটা না বুঝে থাকতে পারে। কিন্তু শ্রমিক ও কৃষকরা, যারা নিজেরা গণ-সংগ্রাম করেছে, তারা জানে যে তারা অনেক বেশী গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে এবং সেগুলিকে কাজে লাগিয়েই তারা অনেক বেশী গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে এবং সেগুলিকে কাজে লাগিয়েই তারা তাদের সংগঠন ও সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং কিছু আংশিক দাবী আদায় করতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, এই সময়ের মধ্যেই জনগণ তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় পুলিশ, আমলাতন্ত্র ও এমন কি বিচার ব্যবস্থার শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কেও কিছুটা বুঝতে শিখেছে।

সংসদীয় মোহ

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র অংশ জনগণের মধ্যে সংসদীয় মোহ আরও বাড়িয়েছে, না, সেটা কমাতে সাহায্য করেছে—সেটাও বোঝা দরকার। মার্কসীয় তত্ত্ব বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হতে বিচ্ছিন্ন কোন ধর্মমত নয়। জনগণ যতক্ষণ না তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কোন তত্ত্বের নির্ভুলতা উপলব্ধি করতে না পারছে; ততক্ষণ পর্যন্ত সেই তত্ত্ব সমাজ পরিবর্তনের উপযোগী কোন বাস্তব শক্তি হয়ে দাঁড়ায় না। প্রত্যেক মার্কসবাদীই এটা জানেন ও বোঝেন, যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র—বুর্জোয়াদের শ্রেণী শাসনেরই একটা রূপ। কিন্তু মার্কসবাদীরা যদি এই তত্ত্বটি বারে বারে কেবল মুখেই আওড়াতো এবং যুক্তফ্রন্টে যোগ না দিত, তাহলে তার অর্থ হত,—জনগণের বর্তমান চেতনা থেকে নাগালের বাইরে চলে যাওয়া; তাতে তাদের সংসদীয় মোহ বিন্দুমাত্রও কমত না, বরং তারা আরও বেশী করে এই গাড্ডায় পড়ত। কারণ, সে ক্ষেত্রে একটা কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় আসত এবং তার জন্য মানুষ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকেই দায়ী করত। সংশোধনবাদী ও অন্যান্য দলগুলি মার্কসবাদীদের কুৎসা করার

আরও সুযোগ পেত। মানুষ ভাবত যে একটা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা থাকলে সংসদীয় পথেই তাদের মূল সমস্যাগুলির ক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে সমাধান হতে পারত, অর্থাৎ সংসদীয় মোহটা বেশ জোরালভাবেই থেকে যেত।

আবার অন্য দিকে, সংসদীয় ব্যবস্থার শ্রেণী চরিত্র লাগাতার বোঝানোর বদলে, সংশোধনবাদী ও বুর্জোয়া উদারনীতিদের মত যদি কেবল এই কথা প্রচার করা হত যে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা জনগণের একটি উপকারী শক্তি, তাহলে তাতেও সংসদীয় মোহ কাটানোর সুবিধা হত না। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছে। তাই, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গড়ার ফলে মানুষের সংসদীয় মোহ বাড়েনি, বরং এই সময়ের মধ্যেই তারা বিপুল অভিজ্ঞতা পেয়েছে।

সংসদীয় ব্যবস্থার শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা তারা কিছুটা পরিমাণে বুঝেছে। অবিরাম মার্কসবাদী প্রচার এবং নিজেদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভবিষ্যতে তারা আরও শিখবে। শুধু যদি নেতারা সব সত্য বুঝে ফেলেন তাহলে কেবল তাদের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শুনেই শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ আপনা হতেই সেটা বুঝে ফেলবে—এর চেয়ে বোকামী ও অ-মার্কসীয় ধারণা আর কিছু হতে পারে না। অতি বিপ্লবীরা ঠিক এই রোগটাতেই ভুগছে।

তারা জোর দিয়ে একথা বলছে যে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা থাকলে গণ-আন্দোলন ও শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষতি হবে। কিন্তু বাস্তব জীবনই দেখিয়ে দিচ্ছে যে, শ্রেণী সংগ্রাম ও জনগণের সংগ্রামী ক্ষমতা বেড়েছে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার বাতিলের পর নির্মম দমণপীড়ন সত্ত্বেও জনগণ যেভাবে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছে, তাতেই এটা প্রমাণ হচ্ছে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার আমলে শ্রেণী সংগ্রাম যদি তীব্র নাই হয়ে থাকে, তাহলে বৃহৎ বুর্জোয়া ও জোতদারেরা রাগে এত ক্ষেপে গেল কেন? রাতের অন্ধকারে মন্ত্রীসভাকে বাতিলই বা করা হোল কেন? আর জনগণই বা এই হামলার বিরুদ্ধে লড়ছে কেন? অতি বিপ্লবীদের দেউলিয়াপনা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাদের লজ্জা নাই, তারা এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা খাড়া করেছে—এসবই নাকি পুঁজিপতিদের সাজান নাটক। তাদের পাগলামোরও কোন সীমা নাই।

তাদের বুলি হল—"আইন অমান্য নয়, মধ্যবর্তী নির্বাচন নয়—চাই সশস্ত্র বিপ্লব"। এই বুলির তত্ত্বগত ভিত্তি হতে পারে দুটি অনুমানের যে কোনও একটা, তা হল: (১) সংসদীয় গণতন্ত্র এবং পুলিশ-রাজ বা ফ্যাসিবাদের মধ্যে কোন তফাৎ নাই, অন্তত: শ্রমিকশ্রেণীর কাছে

এটার কোন গুরুত্বই নাই; বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রমিকশ্রেণীর কোন স্বার্থ নাই, সব ক্ষেত্রে এবং সব সময়েই বিপ্লব অথবা যে কোনও ধরণের বুর্জোয়া শাসন,—এ ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর সামনে কোন বিকল্প নাই; বুর্জোয়া শাসনের বিভিন্ন ধরণ নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তা করার কোন দরকার নাই। (২) ভারত ও পশ্চিমবাংলার বাস্তব পরিস্থিত বিপ্লবের পক্ষে পরিণত, চেতনা ও সংগঠনের দিক থেকে, শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ বিপ্লবের জন্য এখনই প্রস্তুত; এ রকম পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম তাদের একমাত্র পিছনেই টেনে ধরতে পারে। সমগ্র বিষয়টিকে যদি এই ভাবে দাঁড় করানো হয়, তাহলে বিন্দুমাত্র সাধারণ বুদ্ধি আছে এবং মার্কসবাদের অ-আ-ক-খ জানেন এমন যে কোন ব্যক্তিই বুঝবেন যে, এই দু-রকম ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং এটা নিছক পাগলামো ছাড়া কিছু নয়।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রেণী চরিত্র

মার্কসীয় মতে, সংসদীয় গণতন্ত্র তা সে যতই গণতান্ত্রিক চেহারারই হোক না কেন, শেষ বিচারে সেটা বুর্জোয়ারই শ্রেণী শাসন, বুর্জোয়ারই একনায়কত্ব। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার এবং প্রচার ও সংগঠনের সমান অধিকার, যেগুলি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অঙ্গ, বাস্তবে সেগুলি বাহ্যিক অধিকার মাত্র। কারণ, পুঁজিপতি ও জমিদারদের সম্পত্তির মালিকানাজাত প্রভুত্বের অসংখ্য বাস্তব বাধা এই সব বাহ্যিক অধিকারকে সংকুচিত করে রাখে। শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ যাদের জীবিকার জন্য এই সব শোষকদের উপর একান্তভাবে নির্ভর করতে হয়, তারা কখনও এই সব সমান অধিকার কায়েম করতে পারে না।

উপরন্তু, আমলাতন্ত্র, পুলিস ও সৈন্যবাহিনী—রাষ্ট্রের অঙ্গ হিসাবে এগুলিই হল বুর্জোয়া স্বার্থের জিম্মাদার। শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণ যখনই সরাসরি এগিয়ে আসে, বুর্জোয়ার তরফে আসল শক্তি হিসাবে পুলিস ও সৈন্যবাহিনীও তখন এগিয়ে আসে। মার্কসবাদের মহান নেতৃবৃন্দ বুর্জোয়া সংসদীয় গণন্ত্রের এই শ্রেণী চরিত্রকে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন এবং পরবর্তীকালের সমস্ত মার্কসবাদীদের জন্য এ সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীকে শিক্ষিত করার মৌলিক দায়িত্বও তাঁরা রেখে গেছেন।

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের ইতিহাস হতেও আবার এই মার্কসীয় বিশ্লেষণের নির্ভুলতা প্রমাণিত হয়েছে। সেই জন্যই মার্কসবাদী নেতারা বুর্জোয়া

গণতন্ত্র সম্পর্কে কোন মোহ বা সে সম্পর্কে শ্রেণী-নিরপেক্ষ-জাতীয় কোন ধারণা সৃষ্টি করার কোন রূপ প্রচেষ্টাকেই গুরুতর অপরাধ ও বুর্জোয়াদের দাসত্ব করা বলে নিন্দা করে গেছেন। যারা গণতান্ত্রিক অধিকারের বাহ্যিক রূপটা দেখেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তোলার বদলে, সংসদীয় পথে ধাপে ধাপে সমাজের মৌলিক পরিবর্তনে তত্ব প্রচার করে—সেই সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁরা নির্মমভাবে সংগ্রাম করে গেছেন। নূতন পরিস্থিতিতে সৃষ্টিশীল মার্কসবাদের নাম করে আধুনিক সংশোধনবাদীরা মার্কসবাদের এই মূল তত্বটিকেই আক্রমণ করেছে। (ভারতীয় সংশোধনবাদীরা তাদের পাটনা কংগ্রেস থেকে, বন্ধ এবং ভোটের মাধ্যমেই মৌলিক পরিবর্তন আসবে—এই কথা বলে অধঃপতনের পথে আরও এক ধাপ নেমে গেছে।) সুতরাং, সংশোধনবাদী বিকৃতির বিরুদ্ধে নিয়মিত সংগ্রাম করাটা প্রত্যেক মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর এক অপরিহার্য কর্ত্তব্য।

কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রেণী চরিত্রকে বিশ্লেষণ করার সঙ্গে সঙ্গে একই সময়ে মহান মার্কসবাদী নেতারা বুর্জোয়া শাসনের বিভিন্ন ধরণ সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকার কোন মনোভাবের বিরুদ্ধেও শ্রমিকশ্রেণীকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে গেছেন। ফ্যাসিবাদ, পুলিশ-রাজ এবং স্বৈরতন্ত্র—বর্তমানে এ সবই বুর্জোয়া শাসনের রূপ। বুর্জোয়া গণতন্ত্রও এই শ্রেণী শাসনের আর এক রূপ। কিন্তু নেতৃবৃন্দ এই দুই ধরণের বুর্জোয়া শাসনকে গুলিয়ে ফেলেন নাই।

মৌল শ্রেণী চরিত্রের দিক থেকে এ দুটি এক হলেও, রণ কৌশলের দিক থেকে এদুটির মধ্যে পার্থক্য শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসবাদের মতে, প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার শ্রমিকশ্রেণীর সাবালকত্বেরই একটা লক্ষণ; ভোটের অধিকার এবং সভা করার, সংগঠন করার, প্রচার করার, ধর্মঘট করার ইত্যাদি, জাতীয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে তাদের আংশিক দাবীর সংগ্রামে এবং সাধারণভাবে তাদের শ্রেণী সংগ্রাম বাড়িয়ে তুলতে বিপুলভাবে সাহায্য করে। সুতরাং, এই সব অধিকার সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণী নিস্পৃহ তো নয়ই, বরং অত্যন্ত বেশী আগ্রহী। শ্রমিকশ্রেণীর কাছে বুর্জোয়া গণতন্ত্র একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষালয়। শ্রমিকশ্রেণী এমন কি এই সব সীমাবদ্ধ অধিকারও বুর্জোয়াদের কাছ থেকে দান হিসাবে পায় নি। এর জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং বুকের রক্ত দিয়েই তা করতে হয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণী যখন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধ গন্ডিকে চূর্ণ করে তার নিজের নেতৃত্বে এক নূতন রাষ্ট্র কায়েম করার উপযোগী চেতনা ও সংগঠন

আয়ত্ব করতে পারে, কেবলমাত্র তখনই বুর্জোয়া গণতন্ত্র অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং সেটা তখন বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সন্দেহবাদীদের প্রতি জবাবে কমরেড লেনিন পরিস্কার বলেছেন, যে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রামের পথে বাধা তো নয়ই, বরং তার অগ্রগতির পক্ষে এটা সহায়ক এবং সেই জন্যই গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর একটি কর্তব্য হিসাবে নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

সংক্ষেপে, এটা পরিস্কার যে, এক দিকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে শ্রেণী চরিত্রকে না বোঝা, শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে সে সম্পর্কে শিক্ষিত না করা এবং তার মাধ্যমেই সমাজের পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথা প্রচার করে সে সম্পর্কে মোহ সৃষ্টি করা যেমন নগ্ন সংশোধনবাদী বিচ্যুতি। তেমনি, অন্য দিকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পার্থক্য স্বীকার না করা এবং শ্রেণী সংগ্রাম সর্বোচ্চ স্তরে না ওঠা পর্যন্ত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধ অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে অস্বীকার করা বা সেই সংগ্রামের বিরোধিতা করাও এক নিকৃষ্ট ধরনের বালসুলভ বিচ্যুতি। ভারতের মার্কসবাদীদের এই উভয় বিধ বিচ্যুতির বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম করেই এগুতে হবে।

স্বৈরতন্ত্র বা বুর্জোয়া গণতন্ত্র,—যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে এ ছাড়া অন্য বিকল্পের পরিস্থিতি না আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য হল প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সপক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো, এবং শুধু দাঁড়ানোই নয়, তাকে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সামনের সারিতে থাকতে হবে।

কিন্তু যখন দেশের অবস্থা এবং রাজনৈতিক-সাংগঠনিক প্রস্তুতি এমন স্তরে ওঠে যে, বিকল্প হিসাবে সীমাবদ্ধ বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপকতম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা—এ ছাড়া অন্য কিছু থাকে না। তখন শ্রমিকশ্রেণীকে নিঃসন্দেহে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সংকীর্ণ গন্ডি অতিক্রম করে পরেরটির জন্য সংগ্রাম করতে হয় ও হবে। এই ধারণটা মাথায় রেখে আমরা এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে আসছি: ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় বর্তমানে বাস্তব পরিস্থিতিটা কেমন।

শুরুতেই, বিপ্লব বলপ্রয়োগ ও সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে মার্কসীয় তত্বটি পরিস্কার করা দরকার।

পরিবর্তনের রূপ

শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের চাওয়া বা না চাওয়াটা কোন প্রশ্ন নয়, মূল প্রশ্নটা হল, বুর্জোয়া-জমিদারেরা শান্তিপূর্ণ পথে কোন মৌলিক পরিবর্তনে রাজি হবে কিনা। শোষকদের প্রতিটি রাষ্ট্রই যে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর

শক্তিশালী অত্যাচারের যন্ত্র দ্বারা সজ্জিত এবং শাসকশ্রেণীর দল যে এই অত্যাচারের যন্ত্রকে দিনের পর দিন আরও শক্তিশালী করে তোলে—এই বাস্তব সত্যটির উপর মার্কসবাদ খুবই গুরুত্ব দেয়; ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, শাসকশ্রেণীর দল কখনও স্বেচ্ছায় ক্ষমতা পরিত্যাগ করে না এবং তারা তাদের হাতে থাকা অত্যাচারের সমস্ত যন্ত্র নিয়েই শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের উপর ছাপিয়ে পড়ে আক্রমণ চালায়। এ রকম পরিস্থিতিতে জনগণের সামনে মাত্র দুটি পথ খোলা থাকে—হয় আত্মসমর্পণ, নয় সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম। শ্রমিকশ্রেণী হিংসা বা সশস্ত্র সংগ্রাম কামনা করে না; শোষক শ্রেণীর দলই এটা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়। সেই জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে যে কোনও ঘটনাচক্রের মুখোমুখী হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

ইতিহাসের এই তিক্ত শিক্ষা যদি মাথায় না রাখা হয়, এবং যদি শ্রমিক-শ্রেণী ও জনগণকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত না করা হয়, তাহলে তারা তাদের ঐতিহসিক দায়িত্ব পালন করতে পারে না—এবং শাসকশ্রেণীগুলির হিংস্র আক্রমণ তাদের সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলে। রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব, ভিয়েত-নামের মুক্তি সংগ্রাম এবং ইন্দোনেশিয়ার সাময়িক বিপর্যয় এই শিক্ষাকেই আরও স্পষ্টভাবে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

সেই জন্যই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) তার পার্টি কর্ম-সূচীতে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর মহান কামনা ব্যক্ত করার সাথে ইতিহাসের উপরোক্ত শিক্ষা সম্পর্কেও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বিপ্লবের সর্ত

মার্কসবাদ আরও শিক্ষা দেয়, যে বিজ্ঞাপন বা বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে বিপ্লবী সংগ্রামে টেনে আনা যায় না। শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে যারা প্রাণ-হীন অনুগত যন্ত্র মানব বলে মনে করে, একমাত্র তারাই কেবল ঐ রকম আহবান জানিয়েই বিপ্লপ করার কথা চিন্তা করতে পারে। শেণী-সংগ্রাম থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে জনগণ মার্কসীয় শিক্ষাগুলির তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে শেখে এবং এইভাবেই শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী অবস্থায় পৌঁছায়।

বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন সর্বোচ্চ মাত্রার দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস এবং সাহস। এই সব গুণগুলিকে কোন উচ্চ স্তরে তুলতে হবে, তা ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসই দেখিয়ে দিচ্ছে। অনেক আঁকা বাঁকা পথ ও অনেক সংগ্রামের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই কেবল জনগণ এই সচেতনতা ও এই সব গুণ আয়ত্ত করতে পারে। শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণকে ধাপে ধাপে প্রস্তুত করা এবং তাদের ঐ কাজের যোগ্য করে তোলাটাই মার্কসবাদী-

দের কাজ। যখন তখন বিপ্লবের বুলি আউড়েই সস্তায় এটা করা যায় না। জনগণের সচেতনতার মাত্রাকে বুঝতে হবে এবং তার ভিত্তিতে তাদের আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে।

কোন কোন অবস্থায় বিপ্লবী পরিবর্তন সম্ভব,—মার্কসীয় তত্ত্ব সে সম্পর্কেও স্বচ্ছ। বিপ্লব দরকার,—এটা শুধু নেতা ও কর্মীরা বুঝলেই বিপ্লব হয় না। আবার শুধু দুঃখ দুর্দশা বাড়লেই বিপ্লব হয় না। কমরেড লেনিনের মতে, যখন শাসকশ্রেণী বুঝতে পারে, যে পুরান কায়দায় আর শাসন করা চলবে না। আবার শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণও বুঝতে পারে, যে পুরাণ সমাজ আর অসহ্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সংকট নয়, রাজনৈতিক সংকটও যখন চরম পর্যায়ে ওঠে, একমাত্র তখনই বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

বাস্তব পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ যদি সচেতনতা, সংগঠন ও সংগ্রামী দৃঢ়তার দিক থেকে প্রস্তুত না থাকে, অর্থাৎ বস্তুগত অবস্থার সাথে সাথে যদি বিষয়ীভূত অবস্থাও পরিণত না থাকে, তাহলে বিপ্লব সফল হয় না। নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে কমরেড স্তালিন বলেছেন, যে জনগণের চেতনার পিছনে পড়ে থাকাও ক্ষতিকর, তেমনি ক্ষতিকর—জনগণের চেতনা থেকে এগিয়ে যাওয়া এবং ক্ষুদ্র অগ্রগামী বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় শেষ করে দেওয়া।

পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি

এই সব মার্কসীয় সাধারণ সিদ্ধান্তের আলোয় ভারতের ও পশ্চিমবাংলার বর্তমান পরিস্থিতিটা কি তা বিচার করা দরকার। শ্রেণী সংগ্রাম বাড়ছে কিন্তু তা বিপ্লবী পর্যায়ে পৌঁছায় নি। অন্য সব বিচার বিবেচনা ছেড়ে দিয়ে, সারা দেশের ক্ষেত্রে জনগণের চেতনা ও সংগঠনের অবস্থাটা কি সেটাই আমাদের দেখা যাক। ভারতের বেশীর ভাগ জায়গাতেই কমিউনিস্ট শক্তি দুর্বল। এটা ঠিক যে ভারতের মত একটা বিশাল দেশে সর্বত্র আন্দোলন ও চেতনাগত পরিপক্কতায় কোন সমতা থাকতে পারে না এবং এরই উপরে সব কিছু নির্ভর করবে—এমন ভাবাও ঠিক নয়। কিন্তু এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, একটা দিয়াশলাই কাঠি তৃণ ভূমিতে অগ্নিকান্ড ঘটাতে পারে বটে, তবে সেটা ভিজে জায়গায় নয়।

অন্য সব রাজ্যের অবস্থা ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমবাংলার অবস্থাটাই দেখা* যাক। শ্রেণী সংগ্রাম এখানে নিঃসন্দেহে অনেক বেশী তীব্র, কিন্তু দেখা যায় যে এখানে এর দুর্বলতাগুলিও স্পষ্ট। এমন কি এখনও পর্যন্ত

শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাধিক্য অংশ হয় বুর্জোয়ার প্রভাবে, নয় অর্থনীতিবাদের প্রভাবে রয়ে গেছে। হঠকারীরা হয়ত যুক্তি দেখাবে যে, শ্রমিকশ্রেণীর কোন দরকার নাই, গ্রামের গরীবরাই বিপ্লব করবে। চীন বিপ্লব ও ভিয়েতনাম বিপ্লবের শিক্ষাগুলির ব্যাভিচার ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। চীনের তুলনায় ভারতের সংখ্যাগত শক্তি ও অবস্থান অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এটা সঠিক যে চীন ও ভিয়েতনামে গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি তৈরী করেই শত্রুর সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল,—এ শিক্ষাকে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে তা হল,—রাজনৈতিক চেতনা ও সংগঠনের দিক থেকে চীনের শ্রমিকশ্রেণী বিন্দুমাত্রও পিছিয়ে ছিল না, অগ্রগামীর ভূমিকাতেই তারা ছিল—যদিও বিপ্লবী রণ কৌশল হিসাবে তারা সঠিকভাবেই শহরগুলিতে, যেখানে শত্রুর সামরিক শক্তি ছিল কেন্দ্রীভূত, সেখানে সশস্ত্র প্রতিরোধের পদ্ধতি গ্রহণ করে নি।

শ্রমিকশ্রেণীর প্রশ্নকে যদি আমরা এখন ছেড়েও দিই, তাহলেও এটা খেয়াল করতে হবে যে, গ্রামের গরীব কৃষকদের চেতনা ও সংগঠন এখনও দুর্বল। দীর্ঘদিন সংস্কারবাদের প্রভাবে থাকার দরুন, মার্কসবাদীরা এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব পূরণ করতে পারে নি। দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা কেবল সম্প্রতি সুরু হয়েছে। এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে বুর্জোয়া ও পতি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির এখনও বিরাট প্রভাব আছে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-কে যারা সমর্থন করে, সেই মানুষদের চেতনার স্তরকেও আমাদের বিচার বিবেচনা করতে হবে। পার্টিকে তারা সমর্থন করে বলেই তারা বিপ্লবী কাজের জন্য প্রস্তুত,—এ রকম ভাবাটা গুরুতর ভুল হবে।

বাস্তবে প্রতিক্রিয়াকেই সাহায্য করে

এই যখন বাস্তব পরিস্থিতি, তখন পশ্চিমবাংলায় বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামটা অহেতুক ও বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিকর—এর চেয়ে নির্বোধ দায়িত্বজ্ঞানহীন ধারণা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। বোকার মত এই রকম ধারণা করা ও সেইটাকে প্রচার করার একমাত্র অর্থ হল বাস্তবে প্রতিক্রিয়াশীলদেরই সাহায্য করা। অতি-বিপ্লবী পোস্টারওয়ালারা ঠিক সেই জিনিষটাই করছে।

স্থান কাল সম্পর্কে কোনরূপ বিচার বিবেচনা না করেই এই হটকারীরা, "বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস"—কমরেড মাও-সে-তুঙ্-এর এই মূল্যবান

উদ্ধৃতি বারে বারে বলে চলেছে। তারা এমনভাবেই এই সব কথা বলে চলেছে, যেন মনে হয়—শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ নয়, অস্ত্রই সব কিছুর ফয়শালা করবে!

চীনের জনগণ ইতিমধ্যেই যখন সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে গেছে, তখন কমরেড মাও-সে তুঙ্ এই কথাগুলি বলেছিলেন। সেই সময়ে মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক ছিল মাছ ও জলের সম্পর্কের মত। জনগণের রাজনৈতিক প্রস্তুতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে কমরেড মাও-সে-তুঙ সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে একটি মার্কসীয় তত্ত্বকে তাঁর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। অনুরূপ এক পরিস্থিতিতে কমরেড লেনিনও বলেছিলেন, "অস্ত্র! অস্ত্র!" সুতরাং, বাস্তব পরিস্থিতি না দেখে এবং স্থান কাল বিবেচনা না করে, এক ভিন্ন পরিস্থিতিতে মাও-এর কথাকে কাজে লাগাতে চাওয়া মার্কসবাদের ব্যাভিচার ছাড়া আর কিছু নয়।

অবধারিত পরিণতি

অতি বিপ্লবীদের বচন শাসকশ্রেণী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের কিভাবে সাহায্য করছে, তা আমি ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করেছি। বিপ্লবী খোকামী ও হটকারীতার পরিণতি এই রকমই হতে বাধ্য।

সুরুতেই এটা আমি পরিস্কার বলেছি, যে হটকারীদের মনোগত বাসনা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। তাদের সংগঠকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে কিছু লোক আছে যারা সন্দেহজনক ব্যক্তি এবং কিছু আছে যারা মুখে বিপ্লবী কিন্তু কাজে কাপুরুষ। তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছে যে, এক সময়ে অন্যান্য মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশের কাছে গিয়ে অনুরোধ করেছিল এবং পরে পার্টি থেকে বিতাড়িত হাবার পর অতি বিপ্লবী হয়ে গেছে।

কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে যাদের বিরুদ্ধে বলার কিছু নাই এবং হঠকারী ঝোঁকের শিকার হয়েছেন, এমন অনেক ব্যক্তিও আছেন। বুর্জোয়া অর্থনীতি-প্রধান দেশের ক্রমবর্ধমান সংকটের মাঝে পাতি-বুর্জোয়া নৈরাজ্যেরই একটা প্রকাশ এই ঝোঁক। পাতি-বুর্জোয়া জীবনের বৈশিষ্টাই হল,—হয় হতাশা, নয় এখনই বড় কিছু একটা করা;—হয় আত্মসমর্পন, নয় আত্মহত্যা। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে হঠকারীতার যেমন উর্বর ক্ষেত্র রয়েছে, তেমনি ক্ষেত্র রয়েছে সংশোধনবাদের। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে সংশোধনবাদের মোকাবিলা করেছে, কিন্তু তার প্রভাব থেকে এখনও মুক্ত হতে পারে নি। ঠিক তেমনি,

এর পাতি-বুর্জোয়া প্রধান গঠন-বৈশিষ্ট্য ও মার্কসীয় শিক্ষায় এর দুর্বলতার ফলে হঠকারীতারও ভাল ক্ষেত্র রয়ে গেছে। পার্টি হতে বিতাড়িত ব্যক্তিদের পার্টি-বিরোধী এই গোষ্ঠীটি খুবই দুর্বল এবং তাদের প্রভাবও সামান্য, তা সত্ত্বেও এই ঝোঁকের বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকার দরকার আছে।

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সঠিকভাবেই বলেছে, যে সংশোধনবাদী ধ্যান ধারণা ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামকে জোরদার করার সাথে সাথে এই হঠকারী ঝোঁক সম্পর্কেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সংশোধনবাদ ও অতি বিপ্লবীয়ানা—এই উভয়ের সম্পর্কেই সতর্ক না থেকে শ্রমিকশ্রেণী ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তাদের দায়িত্ব পালনের পথে এগিয়ে যেতে পারে না।

পশ্চিমবাংলার বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণী ও মার্কসবদী লেনিনবাদীদের সামনে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামই হল আশু গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বুর্জোয়ারা যাকে ধুলায় ফেলে দিয়েছে, সেই গণতন্ত্রের পতাকাকে শ্রমিকশ্রেণীকেই উর্দ্ধে তুলে ধরতে হবে। এই সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত গণতান্ত্রিক শ্রেণীগুলি ঐক্যবদ্ধ হবে, শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর হবে, জনগণের চেতনা বৃদ্ধি পাবে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, যখন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধ গণ্ডিকে ভেঙে চুরমার করে জনগণের ব্যাপকতম গণতন্ত্র কায়েম করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

৭ বিপ্লব সম্বন্ধে কয়েকটি মার্কসবাদী শিক্ষা

কিছু সাধারণ মানুষের এক রকমের সরল ধারনা আছে যে, জনগণের জীবনে অভাব, দুঃখ ও সংকট বাড়লে তজ্জনিত ব্যথা হতে আপনা-আপনিই বিপ্লব হয়ে যাবে। এ ধারণা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অ-মার্কসবাদীয়। মার্কসবাদ এই শিক্ষাই দেয় যে, অভাব ও সংকট বাড়লেই বিপ্লব হয় না। অভাব ও সংকটের চাপে আত্মসমর্পণের মনোভাবও আসতে পারে—নিজেদের মনে সান্ত্বনা পাবার জন্য এক অতীন্দ্রিয় শক্তি সৃষ্টি করে তার কাছে আত্মসমর্পণ এবং বাস্তব জীবনে শোষকদের কাছে আত্মসমর্পণ। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টি তার ভূমিকা পালন না করলে সংকটের বিরুদ্ধে ধাপে ধাপে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের চেতানা ও সংগঠন শক্তি না বাড়লে উপরোক্ত বিপদ দেখা দিতে পারে। জনগণের সংগ্রামের পাশাপাশি আজকের দিনে নতুন নতুন "গুরুর" আবিভাব এই কথারই সত্যতা প্রমাণ করে। তাহলে বিপ্লব কি অবস্থায় হয়?

মার্কসবাদ, বিশেষ করে কমরেড লেনিন এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, কিছু নেতার মাথায় বিপ্লবের ধারণা গজিয়ে উঠলেই বিপ্লব হয় না, বিপ্লবের জন্য বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। এই বিপ্লবী পরিস্থিতি বলতে কি বোঝায়? সংকট বাড়লেই তাকে বিপ্লবী পরিস্থিতি বলে না। কমরেড লেনিন এর মতে বিপ্লবী পরিস্থিতি তাকেই বলে, যখন একদিকে শাসকশ্রেণী আর পুরানো কায়দায় শাসন চালাতে পারে না এবং অন্য দিকে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ পুরাণো অবস্থাকে আর সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। অর্থাৎ, রাজনৈতিক সংকট যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যাতে শাসকশ্রেণী তাদের শোষণ বজায় রাখার জন্য নূতন শাসন কায়দা নিতে চায়, এবং শ্রমিকশ্রেণী শুধু অসন্তুষ্ট এবং বিক্ষুব্ধই নয়, পুরাণো সমাজ ব্যবস্থাকে কোনমতে সহ্য করতে পারে না। এমনি বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হলে তবেই তাকে বিপ্লবী পরিস্থিতি বলা যেতে পারে।

কিন্তু বিপ্লবী পরিস্থিতি হলেই কী বিপ্লব হতে পারে বা তা জয়ের পথে যেতে পারে? মার্কসবাদের শিক্ষা হ'ল, তা হয় না। তার জন্য প্রয়োজন বিষয়ীভূত পরিস্থিতি (সাবজেকটিভ কণ্ডিশন), অর্থাৎ যারা বিপ্লব করবে সেই শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও জনগণের প্রয়োজনীয় চেতনা, সংগঠন, নেতৃত্ব,

দৃঢ়তা ও জীবনপণ সংগ্রামী শক্তি। এই প্রস্তুতি কোন্ পর্যায়ের হতে হবে তা বোঝা যাবে কোন্ শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে তা বুঝতে পারলে। যে প্রস্তুতি আংশিক দাবি আদায়ের সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন ও তা মোটেই বিপ্লবের পক্ষে যথেষ্ট নয়, বরং প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। মজুরী, মহার্ঘ ভাতা, ছাঁটাই বন্ধ, খাস বা বেনামী জমির আন্দোলন, বন্দী মুক্তি, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রভৃতির জন্য সংগ্রাম—সবই হল আংশিক দাবীর সংগ্রাম। আংশিক দাবী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুইই হতে পারে। আংশিক দাবীর সংগ্রাম অত্যন্ত তীব্র ও জঙ্গী হতে পারে। কিন্তু আংশিক দাবীর সংগ্রাম রাষ্ট্র ক্ষমতার সংগ্রাম নয়। এতে শোষকশ্রেণীর মুনাফা বা লুণ্ঠনে কিছুটা আঁচড় লাগে মাত্র। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর এবং শাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের প্রশ্ন ওঠে না। তবু দেখা যাবে যে মুনাফায় সামান্য আঁচড় লাগলেই শাসকশ্রেণী হিংস্র হয়ে পড়ে এবং জনগণের বিরুদ্ধে পুলিসী দমন ব্যবস্থা প্রয়োগ করে। অবস্থানুযায়ী দমন ব্যবস্থা তীব্র হয়।

কিন্তু বিপ্লব হলো রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রশ্ন, শাসকশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রশ্ন। তাই, এর বিরুদ্ধে শুধু পুলিসী ব্যবস্থা নয়, শাসকশ্রেণী সমগ্র রাষ্ট্র শক্তি নিয়ে—যার মধ্যে প্রধান হলো সামরিক শক্তি তা নিয়ে—জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইতিহাস দেখিয়ে দিচ্ছে যে, শাসকশ্রেণী স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করে না। সমস্ত শক্তি নিয়ে ও চরম হিংস্রতা নিয়ে শাসকশ্রেণী জনগণকে দাবাতে চায়। প্যারি কম্যুন, রুশ বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ, চীন বিপ্লব, ১৯১৮ সালে জার্মানীর ও হাঙ্গেরীর ব্যর্থ বিপ্লব, ভিয়েতনামের মুক্তি যুদ্ধ ও ইন্দোনেশিয়ার বিপর্যয় দেখিয়ে দিচ্ছে, জনগণের বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণী কিরূপ হিংস্র হয়ে সমগ্র রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করে এবং জনগণের সংগ্রামী চেতনা ও শক্তিকে কোন উচ্চ পর্যায়ে যেতে হয়। শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের এই মনোভাবকেই কমরেড লেনিন বলেছেন 'লড়ার ও মরার' মনোভাব।

শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের এই বিষয়ীভূত স্তুতি আপসে হয় না। বিপ্লব করে জনগণ এবং নেতৃত্বের কাজ হলো জনগণকে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেই অবস্থায় যেতে সাহায্য করা। কিছু 'নেতা' বক্তৃতা দিলেই তাদের কথা শুনে জনগণ বিপ্লবী হয়ে ওঠে না। জনগণ শেখে নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। নেতৃত্বের কাজ হলো জনগণের দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের সংগঠিত করা এবং সেই সঙ্গে মার্কসবাদী প্রচারের দ্বারা তাদের চেতনাকে ধাপে ধাপে অর্থনৈতিক স্তর হতে রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত

করা। জনগণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এর সত্যতা বুঝতে শেখে এবং ধাপে ধাপে নেতৃত্বের চেতনা জনগণের চেতনায় রূপান্তরিত হয়।

বিপ্লবী অবস্থার জন্য প্রস্তুতি না করলে এবং অন্য দিকে অবস্থা না বুঝে বোতাম টিপে বিপ্লব করার স্বপ্ন দেখলে বিপর্যয় ঘটে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্থক ও ব্যর্থ বিপ্লবগুলি এই সাক্ষ্য বহন করছে। এই প্রসঙ্গে রুশ দেশের ১৯১৭ সালের দুই-একটি ঘটনা স্মরণ করা ভাল। ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে রাজধানী লেনিনগ্রামে শ্রমিক ও সৈন্যবাহিনী বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ১৬ই-১৮ই জুলাই তারা অস্ত্র নিয়ে (কাগজে আঁকা বন্দুক নয়, সত্যকার সাঁজোয়া গাড়ী, মেসিন-গান ও রাই ফেল নিয়ে) মিছিলে বের হয়ে পড়ল। কিন্তু কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি তাতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বিপ্লবের খেলা খেলেনি, বরং এই মিছিলকে শান্তিপূর্ণ মিছিলে পরিণত করল। তথাপি কমিউনিস্ট পার্টি শাসক শ্রেণীর দ্বারা আক্রান্ত হলো—কমরেড লেনিন আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হলেন। এরপর শাসকশ্রেণী পুরাণো কায়দায় শাসন অসম্ভব ভেবে কর্নিলভ বিদ্রোহের দ্বারা অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের অবসান ঘটিয়ে ফ্যাসিজম কায়েমের চক্রান্ত করল। কমরেড লেনিন কিন্তু 'ষাঁড়ের শত্রু-বাঘে-খাক' মনোভাব নিলেন না, এই বিদ্রোহকে ধ্বংসের জন্য শ্রমিক-শ্রেণীর কাছে আহ্বান জানালেন। কমরেড লেনিন তারপর অকটোবর বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিকে তাগিদ দিতে লাগলেন জুলাইয়ের অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করা এবং অকটোবরের অভ্যুত্থানের তাগিদ দেওয়ার মধ্যে চমৎকার বিপ্লবী নেতৃত্বের অদ্ভুত বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় মেলে। কমরেড লেনিনের মতে, জুলাই মাসে বিপ্লব করতে গেলে তা দ্বিতীয় প্যারি কমিউনে পরিণত হোত, অর্থাৎ লেনিনগ্রাদ দখল হলেও তাকে টিকিয়ে রাখা যেতে না। কারণ, তখনও কৃষকেরা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয় নি। কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ছিল,—কিন্তু তা বিপ্লবী পর্যায়ে যায় নি অর্থাৎ তাদের মধ্যে 'লড়া ও মরা'র মনোভাব দেখা দেয় নি। ২।৩ মাস পরেই এই অবস্থা সৃষ্টি হলো, তখন বিপ্লবে দেরী করলে জনগণ হতাশ গ্রস্ত হয়ে পড়ত এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা জয়যুক্ত হতো।

বিপ্লবের বাস্তব পরিস্থিতি এবং বিষয়ীভূত প্রস্তুতির মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রত্যেকটি বিপ্লবেরই বিশেষত্ব। চীনে ১৯২৬ সালে কুয়োমিনত ও কমিউনিস্ট পার্টির যুক্ত পরিচালনায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র উত্তরমুখী অভিযান ক্যান্টন হতে শুরু হয়েছিল এবং তা চরমে উঠেছিল ১৯২৭ সালে

সাংহাই দখলের পর। চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবের গতিবেগে ভীত হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় বিপ্লবের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে বিপ্লবী সংকট সৃষ্টি করেছিল। পার্টি নেতৃত্বের সংস্কারবাদী বেইমানীর জন্য বিপ্লব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু সৈন্যবাহিনীর একাংশ বিপ্লবের দিকে ছিল এবং যুক্ত উত্তরাভিমুখী অভিযানের সময় জনগণের একাংশ সশস্ত্র হয়েছিল। তারই উপর দাঁড়িয়ে কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী অংশ এগিয়ে যেতে পেরেছিল। চীনের জনমনে পার্লামেণ্টারী মোহের কোন স্থানই ছিল না, কারণ এখানে শাসকশ্রেণী কোন দিনই পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা নেয় নাই, প্রথম হতেই তারা সশস্ত্র শক্তি নিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছে এবং জনগণের একাংশের হাতে অস্ত্র ছিল বলে তারা তাই দিয়েই এই মোকাবিলা করেছে। কমরেড মাও বলেছেন, যে এখানে শাসকশ্রেণী জনগণের সামনে শান্তিপূর্ণ কোন কাজেই সুযোগ রাখেনি। কমরেড স্তালিন বলেছিলেন, চীন বিপ্লবের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এখানে প্রথম হতে প্রতি বিপ্লব সশস্ত্র রূপ নিয়েছে এবং এই সমগ্র প্রতি বিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। ভিয়েতনামে বিপ্লবী শক্তিকে বারে বারে জেনেভা চুক্তি কার্যকরী করার দাবী করতে হয়েছে ও হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের ও দালালদের চরিত্র সম্বন্ধে এখানে বিপ্লবী নেতৃত্বের কোন দিনই মোহ ছিল না, তবু প্রথম হতেই বর্তমান পর্যায়ের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয় না। জনগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে ১৯৬০ সাল হতে তা বাস্তব রূপ নিয়েছে। বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের এই শিক্ষাগুলিকে ভুলে গেলে বিপ্লবী নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করা যাবে না।

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ও শ্রমিক-কৃষকের ভূমিকা

মার্কসবাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো : শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ও শ্রমিক-কৃষকদের সংগ্রামী ঐক্য। ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মানিতে বিখ্যাত কৃষক বিদ্রোহ এবং ১৮৭০ সালে প্যারি কমিউন এই দুইয়ের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে কমরেড মার্কস ও কমরেড এংগেলস বলেছেন, যে এক দিকে কৃষকেরা ও অন্য দিকে শ্রমিকেরা অদ্ভুত বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের উদাহরণ দেখিয়েছে। কিন্তু প্রথমটি ব্যর্থ হয়েছে নেতৃত্বের অভাবে, দ্বিতীয়টি পরাজিত হয়েছে কৃষক বিদ্রোহের সংগে যুক্ত না হওয়ার জন্য। এর থেকে তাঁরা মূল্যবান সিদ্ধান্ত করেছেন, যে বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকের নেতৃত্ব অপরিহার্য এবং শ্রমিকের সংগ্রামের মিলন অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ

হলো একটি মূলনীতি—যা প্রত্যেক দেশের বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিভিন্ন দেশের বাস্তব অবস্থানুযায়ী এর বাস্তব প্রয়োগের রূপ বিভিন্ন হতে পারে, হতে বাধ্য। কিন্তু, এই নীতি হতে বিচ্যুত হলে বিপ্লব হবে না।

কিন্তু এই মূল শিক্ষাকে বিকৃত করার অপচেষ্টা হচ্ছে। সংশোধনবাদীরা সোজাসুজি নতুন যুগের নামে শ্রমিক নেতৃত্বকে অস্বীকার করছে এবং হঠকারীরা মুখে শ্রমিক নেতৃত্ব বললেও কাজে তাকে নস্যাৎ করেছে। শ্রমিকের ভূমিকাকে এরা শুধু পরিপূরক ভূমিকায় পরিণত করতে চাইছে। মনে রাখা দরকার যে, শ্রমিকের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া শ্রমিক নেতৃত্ব হতে পারে না। যে দেশে শ্রমিকশ্রেণী বিশেষ গড়ে ওঠে নাই, সেখানের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যেখানে শ্রমিকশ্রেণী আছে সেখানে শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবী অবস্থানে না আনতে পারলে, তাদের বাদ দিয়ে শুধু মার্কসবাদের আদর্শগত নেতৃত্ব দ্বারা শ্রমিক নেতৃত্বে কায়েম করা যায় না। শ্রমিকের সক্রিয় ভূমিকাকে যারা অস্বীকার করে, তারা বিভিন্ন বিপ্লবের শিক্ষারই কদর্থ করছে। রুশ ও চীন উভয় দেশের বিপ্লবেই একই মার্কসবাদী শিক্ষা প্রয়োগ হয়েছে, কিন্তু তাদের প্রয়োগের ভিন্ন রূপ হয়েছে। রাশিয়ায় শ্রমিকের নেতৃত্বের ভূমিকা সুস্পষ্ট, কিন্তু এখানেও কৃষকদের ভূমিকা কম ছিল না। এখানে প্রথমে শহরে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল হয়েছিল এবং তারপর গ্রামে বিপ্লব দুর্বার বেগে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু শহরে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল শুধু শ্রমিক একা করে নাই, তার সংগে ছিল বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী—কমরেড লেনিনের ভাষায় এই সৈন্যবাহিনী ছিল "সৈন্যের পোষাকে কৃষক ছেলে।"

চীনে বিপ্লবের বাহ্যিক রূপ ছিল—প্রথমে গ্রামে রাষ্ট্র ক্ষমতা কায়েম হয়েছে এবং শেষে শহরে তা সফল হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এখানে শ্রমিকদের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় ছিল না এবং তার নেতৃত্ব শুধু মতাদর্শগত নেতৃত্ব ছিল না। এখানে শ্রমিকের ভূমিকাকে পরিপূরক ভূমিকা মনে করা এবং কৃষক কি মূলতঃ একা বিপ্লব করছে মনে করার অর্থ হলো শ্রমিকের কুৎসা করা। চীনে শ্রমিকশ্রেণী অল্প হলেও তারা প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির একচ্ছত্র নেতৃত্বে সংগঠিত ছিল, উত্তরমুখী সশস্ত্র অভিযানে তারা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছে, বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীতে তারা যোগ দিয়েছে, শহর দখলে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে; প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়েছে, বারে বারে অভ্যুত্থান করেছে। পরে শহরে ফ্যাসিস্ট-সুলভ সন্ত্রাসের মধ্যে সঠিকভাবেই অভ্যুত্থানের কায়দা ত্যাগ করেছে এবং নানাভাবে গ্রামের মুক্ত এলাকাকে সাহায্য করেছে, আবার মুক্তি

সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে সঠিক মুহূর্তে সহর দখলে অংশ নিয়েছে। চীন বিপ্লবের বাহ্যিক রূপ ছিল ভিন্ন, তার বাস্তব কারণও ছিল। এখানে উত্তরাভিমুখী অভিযানের পর চিয়াং-এর বিশ্বাসঘাতকতায় সহরগুলি ছিল ফ্যাসিস্ট সুলভ সন্ত্রাসের কেন্দ্র। এখানে গ্রামে মুক্ত এলাকাগুলি টিকে থাকতে পেরেছিল, কারণ প্রথম হতে সশস্ত্র শক্তির বিপ্লবী অংশ গ্রামে চলে আসতে পেরেছিল; চীন বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে থাকায় কোনও কেন্দ্রীভূত শাসন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না; বিভিন্ন যুদ্ধবাজ সুবেদাররা পরস্পর লড়ালড়ি করত; তদুপরি ছিল বিপ্লবী শক্তির চলাফেরা ও কৌশল অবলম্বনের উপযোগী বিরাট অঞ্চল। তথাপি ঘেরাও ধ্বংস হতে বাঁচার জন্য এবং জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রণী হবার জন্য মুক্তি ফৌজকে লং মার্চ করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পিছনে রেখে দাঁড়াতে হয়েছিল।

চীন বিপ্লবের এই শিক্ষা ও বিশেষ পরিস্থিতিকে ভুলে গেলে যেমন চলবে না, তেমনি বাহ্যিক বিভিন্নতার মধ্যে শ্রমিক নেতৃত্বের মূল প্রশ্নকে গুলিয়ে ফেললে ক্ষতি হবে।

—নন্দন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৫ সাল (১৯৬৮)।

৮ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ও কৃষি বিপ্লবের পথ

ভারতের শাসকশ্রেণী অনুসৃত মৌলিক শ্রেণী নীতির অনির্বাণ পরিণতি হিসাবে সর্বগ্রাসী সংকট যতই গভীরভাবে দেশকে ও দেশের জনগণকে গ্রাস করছে। ততই সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তরের প্রশ্ন, অর্থাৎ বর্তমান যুগে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্ন ও তার প্রধান বিষয় বস্তু হিসাবে কৃষি বিপ্লবের প্রশ্ন সামনে এগিয়ে আসছে। সংকট আজ এতই নগ্ন, যে শাসকশ্রেণীর পক্ষে তাকে আর অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না। সম্প্রসারণশীল বলিষ্ঠ অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্বন্ধে তাদের কথার ফুলঝুরি নিভে গেছে। অবশ্য শাসকশ্রেণী ও তাদের প্রচারকেরা সংকটের গভীরতাকে ছোট করে দেখাতে, এর মূল কারণ ঢেকে রাখতে, নানা টোটকা-ওষুধের কথা বলে জনগণকে ভুল বুঝিয়ে রাখতে, এবং এই ভাবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়া থেকে তাদের বিরত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে ও ভবিষ্যতেও করে যাবে। সেই সংগে চলছে উগ্র জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ও গণ-আন্দোলনকে বিপথগামী করার চক্রান্ত এবং গণ-সংগ্রামের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান দমণ ব্যবস্থার প্রয়োগ।

এরই পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যাবে, যে বর্তমান সন্ধিক্ষণে মার্কসবাদের নামাবলী পরা সংশোধনবাদী চক্র ও নতুন গজিয়ে ওঠা অতি বিপ্লবীদের পক্ষ হতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং দেশের বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে মার্কসবাদী লেনিনবাদী শিক্ষা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যভিচার চলেছে। এক দিকে কমরেড লেনিন, অন্য দিকে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নাম জপ করে তাদের শিক্ষার এবং রুশ ও চীন বিপ্লবের শিক্ষার শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে। শতাধিক বৎসরের মূল্যবান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কতকগুলি পথ নির্দেশক নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাকে অস্বীকার করে সমাজের মৌলিক রূপান্তর ঘটানো যায় না। কিন্তু সৃজনশীল মার্কসবাদের নামে সংশোধনবাদীদের পক্ষ হতে সেগুলিকেই অস্বীকার করা হচ্ছে। যেমন, বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা ও বিপ্লবে শ্রমিক নেতৃত্বকেই অস্বীকার করা হচ্ছে। এর থেকেই সুবিধাবাদী লেজুর-বৃত্তির কৌশল জন্ম নিচ্ছে।

অন্য দিকে মার্কসবাদ এই শিক্ষাও দেয়, যে মার্কসবাদ কোনো ধর্মের

মতো গোঁড়া সূত্র সমষ্টি নয়। বিভিন্ন দেশের বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করতে হয়। বাস্তব অবস্থাকে বোঝা ও সেখানে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করার ক্ষমতার মধ্য দিয়েই একটা দেশের মার্কসবাদীদের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। অন্য দেশের বিপ্লব হতে শিক্ষা নিতে হয়, কিন্তু নকল করে বিপ্লব করা যায় না। কোনো দেশেই তা হয় নি, বরং নকল করতে গিয়ে ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু মার্কসবাদের সর্বোচ্চ বিকাশের নামে অতি বিপ্লবীদের বিভিন্ন ক্ষুদ্র-গোষ্ঠীর পক্ষ হতে এই সব শিক্ষাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। যেমন ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয় ভূমিকাকে কার্যতঃ নস্যাৎ করা হচ্ছে, ভাবপ্রবণ মধ্যবিত্ত যুবকদের দিয়ে কৃষি বিপ্লব করার স্বপ্ন দেখা হচ্ছে, জনগণের চেতনা ও সংগঠনের স্তরকে বাস্তবানুরাগভাবে বিচার না করে নিজেদের খেয়াল মতো তার ব্যাখ্যা চলছে এবং চীন বিপ্লবের ইতিহাসকে বিকৃত করে সেই বিকৃত শিক্ষার নকল করার প্রহসন করা হচ্ছে। এই উভয় ধরনের বিচ্যুতি ও বিকৃতি শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের সম্মুখে বাধা সৃষ্টি করছে এবং কার্যতঃ শাসকশ্রেণীকেই সাহায্য করছে। আমাদের দেশে মার্কসবাদী শিক্ষার ও তার প্রয়োগ ক্ষমতার দুর্বলতা, প্রবল বুর্জোয়া প্রভাব এবং সংকটের চাপে দিশে হারা মধ্যবিত্ত-সুলভ ভাবপ্রবণ মনের অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার প্রবৃত্তি থেকেই এই সবের উদ্ভব হচ্ছে। এমতাবস্থায় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে হলে শাসকশ্রেণীর মিথ্যা প্রচারের ধূম্রজাল ছিন্ন করে এবং উভয়বিধ বিচ্যুতিকে পরাস্ত করেই এগুতে হবে।

সংকট আজ সর্বগ্রাসী, সর্বব্যাপক। বছর দুয়েক আগে পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছে সংকটের প্রধান রূপ ছিল কৃষির সংকট ও তা হতে উদ্ভূত খাদ্য সংকট। অন্য ক্ষেত্রে সংকট তখনও নগ্নভাবে জনসমক্ষে দেখা দেয় নি। খাদ্যোৎপাদনে ঘাটতিকেই খাদ্য সংকটের মূল কারণ বর্ণনা করে শাসকশ্রেণী কৃষিতে আধা-সামন্ততান্ত্রিক, জোতদারী মহাজনী শোষণের মৌলিক বাধার কথা অস্বীকার করেছে এবং শুধুমাত্র সার, উন্নত বীজ প্রভৃতির সাহায্যে ঘাটতি পূরণের ও তদুপরি পি-এল ৪৮০-এর আমদানী দ্বারা খাদ্য সংকট সমাধান করে অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করার মিথ্যা স্তোক বাক্য শুনিয়েছে। সংশোধন-বাদী-গোষ্ঠীও তাদের পার্টি প্রোগ্রামে শাসকশ্রেণীকে স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তোলার সার্টিফিকেট দিয়েছে। একমাত্র মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে আমরাই রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছিলাম যে, এ রাষ্ট্র হোল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ বৃহৎ পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে পরিচালিত পুঁজিপতি ও জমিদারদের রাষ্ট্র এবং এই রাষ্ট্রের চেষ্টা

হোল বিশ্বপুঁজিবাদের চরম পচনের যুগে আমাদের দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এর ফলে সংকট গভীর ও ব্যাপক হবে; জনগণের অবস্থা দুঃসহ হবে। আত্মনির্ভরতার বদলে দেশ আরো বেশি করে সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল হবে এবং ফলে সংকট বৃদ্ধির সংগে সংগে দেশের স্বাধীনতাও আরো বেশী বিপন্ন হয়ে উঠবে। ঘটনাবলী এই বিশ্লেষণেরই সত্যতা প্রমাণিত করেছে।

কৃষির সংকট আজ এক সামগ্রিক জাতীয় সংকটের রূপ নিচ্ছে। খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে এবং খাদ্যোৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি নির্বিশেষে খাদ্য সংকট বেড়েই চলেছে। খাদ্যে বাড়তি রাজ্য উড়িষ্যা ও আসামও সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে। এর সংগে যুক্ত হয়েছে শিল্পে সংকট বা মন্দা, উচ্চ মূল্যের সংকট, অসম বৈদেশিক বাণিজ্যের সংকট, বৈদেশিক মুদ্রা ও তথাকথিত বৈদেশিক সাহায্যের সংকট, যে পরিকল্পনার নাম করে শাসকশ্রেণী জনগণকে মোহগ্রস্ত রাখার চেষ্টা করে আসছে, সেই পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের সংকট। দু-বছর হয়ে গেল চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আঁতুড় ঘর হতে বেরিয়ে সূর্যের মুখ দেখতে পারল না। এই সংকটের চাপে শুধু যে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিই ভেঙে পড়েছে তাই নয়, এর আঘাতে মেহনতী জনগণের জীবন বিষময় হয়ে উঠছে, এমন কি ক্ষুদ্র শিল্পপতিরাও আঘাত খাচ্ছে। বৃহৎ দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিরা নিজেদের মুনাফা বজায় রাখা ও বৃদ্ধি করার জন্য ছাঁটাই, লে-অফ্, অটোমেশন, মিল বন্ধ প্রভৃতির মাধ্যমে মন্দার বোঝা শ্রমিক ও কর্মচারীদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে এবং রাষ্ট্র শক্তি সর্বতোভাবে তাদের সাহায্য করছে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যন্ত সংকুচিত হয়েছে; অন্য দিকে পুরাণো কাজের লোক কর্মচ্যুত হচ্ছে। তাই বেকার সমস্যা ভয়াবহ হচ্ছে। এমনিই অবস্থা যে ইঞ্জিনীয়ার বা বেকারী পর্যন্ত সংকটে জর্জরিত। তদুপরি সংকটের মাঝে রাষ্ট্রের অর্থ সংগ্রহের জন্য জনগণের উপর করভার আরো বাড়ানো হচ্ছে। শ্রেণী স্বার্থে পরিচালিত উগ্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রচিত হাজার কোটি টাকার মিলিটারী বাজেটও তাদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে।

যে কারণে এই সংকট—সেই একই কারণে ভারত সরকার আরো ন্যক্কারজনকভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে তথাকথিত সাহায্যের জন্য দরবার করছে। ভিয়েতনামের জনগণের হাতে মার খেয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজেই সংকটে জর্জরিত হয়ে পড়ছে। তাই, তার পক্ষে ভারতের শাসকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং হবেও না।

বুর্জোয়া কূটনীতির খেলায় মত্ত সোভিয়েত নেতৃত্বের কাছ থেকে

পাওয়া সাহায্যকে মার্কিনদের সঙ্গে দর কষাকষির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেও সুবিধা হচ্ছে না। অন্য দিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে পরিমাণ টাকা দিচ্ছে তারই ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে ভারতের উপর চাপ ও দেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশকে আরো উন্নত করে তুলছে এবং তার কাছে মহাজনের সামনে খাতকের মতো শাসকশ্রেণী আরো বেশি করে নতি স্বীকার করছে! দ্রব্য মূল্য হ্রাস হতে শুরু করে চীন বিরোধী নীতি ও ভিয়েতনাম সংক্রান্ত নীতির মধ্য দিয়ে তা নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। সাহায্যের নামে দেশে দেশে মহাজনী কায়দায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নূতন কায়দায় নয়া-ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারের ভয়াবহ চিত্র হতে বোঝা যায় যে আমাদের দেশের স্বাধীনতা কীভাবে সংকুচিত হয়ে পড়ছে।

এই সামগ্রিক ঘনীভূত সংকট কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। দেশ স্বাধীন হোল বটে, কিন্তু যে আপসের মাধ্যমে তা হোল এবং রাষ্ট্রের যে শ্রেণী গঠন হোল তার অনিবার্য ফল হোল এই যে, দীর্ঘ দিনের সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদী শোষণের হাত হতে দেশ মুক্ত হোল না। অসম বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিদেশী পুঁজির মারফৎ লুণ্ঠন বহাল থাকল। সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী পুঁজির পরিমাণ বেড়ে গেল, যা অতিরিক্ত মুনাফার মারফৎ দেশের সৃষ্ট সম্পদের একটা বড় অংশ আত্মসাৎ করে চলল। দেশের প্রধান অংশ কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষক সাধারণের উপর প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক. জমিদারী-মহাজনী শোষণ ব্যবস্থার কাঠামোর কিছু পরিবর্তন হোল বটে, কিন্তু এই শোষণ মূলতঃ বজায় রাখা হোল এবং তার শোষণের তীব্রতা বেড়ে গেল! এর সঙ্গে যোগ হোল নূতন রাষ্ট্রের সাহায্যে দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিদের বল্গাহীন মুনাফাবাজি। একচেটিয়া পুঁজির লুঠ অত্যন্ত বেড়ে গেল।

এই ত্রিবিধ শোষণের জগদ্দল পাথরের চাপে দেশের জনগণের বিশেষতঃ কৃষকদের সৃজনশক্তির—যা নূতন সম্পদ সৃষ্টির প্রধান উপাদান তার উৎস মুখ অবরুদ্ধ হয়ে থাকল। অন্য দিকে মেহনতী জনগণের শ্রমে সৃষ্ট স্বল্প পরিমাণ সম্পদের মোটা অংশ মুষ্টিমেয় শোষণকারীর দল আত্মসাৎ করে চলল। এদের অতি-মুনাফার অর্থই হোল, উৎপাদনকারী হিসাবে কৃষক ফসলের ন্যায্য অংশ ও ন্যায্য দাম হতে এবং শ্রমিক ন্যায্য মজুরী হতে আরো বেশী বঞ্চিত হচ্ছে। অন্য দিকে ক্রেতা হিসাবে সেই জনসাধারণই অতিরিক্ত দাম দিতে বাধ্য হচ্ছে।

এর উপর চাপছে রাষ্ট্রের খরচ। পুঁজিবাদী বিকাশের জন্য অর্থ সংগ্রহের চাপ এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ বাজেটের আঘাত। ফলে শুধু জনগণের অবস্থাই খারাপ হচ্ছে না, রাষ্ট্রের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থেরও ঘাটতি

হচ্ছে। এরই জন্য বিদেশের কাছে ক্রমবর্ধমান দেনার চাহিদা। এরই সামগ্রিক ফল হোল সর্বগ্রাসী সংকট, ক্রমবর্ধমান দেনার জন্য বিদেশের উপর নির্ভরতা, সাম্রাজ্যবাদের বিপদজনক অনুপ্রবেশ ও স্বাধীনতার ক্রমবর্ধমান বিপদ।

এই পরিস্থিতিই সমাজের মৌলিক রূপান্তরের প্রশ্নকে সামনে এনেছে। এই প্রশ্নকে বাদ দিয়ে শুধু জোড়াতালি দিয়ে সংকট হতে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। তার অর্থ এই নয় যে, শাসকশ্রেণী কোনোই আংশিক প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে পারে না। কিন্তু তাতে সাময়িকভাবে কিছু ইতর বিশেষ হতে পারে মাত্র, তাতে সংকটের সমাধান বা স্থায়ী গতিরোধও হতে পারে না। সংকটের কিছুটা সুরাহা করতে হলেও ত্রিবিধ শোষণ ব্যবস্থার গায়ে হাত দিতে হবে এবং সংকট হতে মুক্তি পেতে হলে সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদী একচেটিয়া পুঁজির শোষণের সম্পূর্ণ অবসান করতে হবে। এই সব শোষকদের হাত হতে যাবতীয় উৎপাদনের সামগ্রী, অর্থাৎ কলকারখানা, ব্যাংক, বাগিচা, খনি প্রভৃতি কেড়ে নিয়ে জাতির সম্পত্তিতে পরিণত করা এবং এদের জমি নিয়ে কৃষকদের ভিতর বিতরণ করার মধ্য দিয়েই তা হতে পারে। যেহেতু বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠীর নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্র এই শোষণ ব্যবস্থাকে রক্ষা করছে, তাই রাষ্ট্রকে অপসারিত করে এবং শোষণের জন্য তৈরী রাষ্ট্র কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে শ্রমিক নেতৃত্বে জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

একেই বলা হয় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং এই শোষণ অবলুপ্তির কাজকেই বলা হয় ঐ বিপ্লবের কাজ। এ কর্তব্য সাধন করা মোটেই সহজ সাধ্য নয়। আমরা দেখেছি, সামান্য আংশিক দাবির আন্দোলনে কীরূপ দমন পীড়ন চলে। তাই সভাবতঃই জনগণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হলে শাসকগোষ্ঠী সমগ্র রাষ্ট্র শক্তি নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়বে। সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও সংসদীয় কাঠামোকে বাতিল করে তারা চরম হিংস্র মূর্তি গ্রহণ করবে। পূর্বে পৃথিবীর কোনো দেশে শাসকশ্রেণী স্বেচ্ছায় বানপ্রস্থ নেয় নি; আমাদের দেশে তার ব্যতিক্রম হতে পারে এমন ধারণা করাই বাতুলতা। এমনি ধারণা সংগ্রামী জনগণকে অপ্রস্তুত রেখে শাসকশ্রেণীরই সুবিধা করে দেয়। ভারতের সংশোধনবাদী-গোষ্ঠী কিন্তু এই মোহকেই প্রচার করে যাচ্ছে।

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব কঠিন কঠোর দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং শাসকশ্রেণী যেভাবে রাষ্ট্র শক্তিকে ব্যবহার করবে সেইভাবেই তার মোকাবিলা করে জয়যুক্ত হতে পারে। তাই, রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব, ভিয়েত-নামের মুক্তি সংগ্রাম দেখিয়ে দিচ্ছে, এই বিপ্লবের জন্য জনগণের সাধারণ

সংগ্রামী মনোভাব যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন সাহস, দৃঢ়তা, ঐক্য, চেতনা, সংগ্রামী শক্তি ও সংগঠনের সর্বোচ্চ বিকাশ। প্রচার ও আন্দোলনের সম্ভাব্য সমস্ত উপায়কে কাজে লাগিয়ে অসংখ্য সংগ্রামের মূল্যবান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শ্রমিক ও জনসাধারণ রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র বুঝতে শেখে এবং এই গুণগুলি আয়ত্ত করে। এই সব বিবেচনা না করে যেখানে সেখানে বিপ্লবের বুকনি-বাজি করলে চরম হঠকারিতা করা হয়। এই দুই রকম ভুলের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেই বিভিন্ন দেশের গণ-বিপ্লব সফল হতে পেরেছে। ভারতেরও এই শিক্ষাকে মনে রেখে এগুতে হবে।

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই সাধারণ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারণার ভিত্তিতেই কৃষি বিপ্লবের প্রশ্নকে বিবেচনা করতে হবে। কারণ, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই প্রধান সারবস্তু হোল কৃষি বিপ্লব: এক অর্থে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান চরিত্র হোল কৃষি বিপ্লবের চরিত্র। তার কারণ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত শোষণ কবলিত পশ্চাৎপদ দেশে কৃষিই হোল অর্থনীতির প্রধান অংশ এবং কৃষকেরাই হোল শোষিত জনসমষ্টির ও দেশের শ্রম শক্তির বেশির ভাগ অংশ। আমাদের দেশের কৃষকেরা হোল জন সংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ। কৃষি ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী-সম্পর্ক প্রধান হলেও সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী ও একচেটিয়া পুঁজির ত্রিবিধ শোষণই অত্যন্ত ঘনীভূতভাবে কৃষি ব্যবস্থাও কৃষকদের উপর পড়ছে।

গ্রাম্য অর্থনীতিও প্রাক্-পুঁজিবাদী অবস্থার মতো আজ আর বিচ্ছিন্ন স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতি নয়, পুঁজিবাদী বাজারের অসম বিনি ব্যবস্থা, ফাটকাবাজি ও টাকার প্রাধান্য গ্রাম্য অর্থনীতিকে তাদের ঘূর্ণির মধ্যে টেনে নিয়েছে। ইংরাজ আমলেই তা শুরু হয়েছিল। দিন দিন তা প্রবল হচ্ছে এবং প্রধানতঃ এরই মাধ্যমে ও সরকারী পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী ও একচেটিয়া পুঁজির চাপ কৃষকদের পিষে মারছে। সামন্ত-তান্ত্রিক ভিতের উপর এই শোষণের বোঝা গ্রাম্য অর্থনীতিকে করুন ও বিষাদময় করে তুলেছে। কৃষকদের শোষণ করে পাওয়া ফসল বিক্রী করে প্রচুর মুনাফার সুযোগ বাড়ছে বলে আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণেরও তীব্রতা বাড়ছে। এই ঘনীভূত ত্রিবিধ শোষণের জগদ্দল পাথরই কৃষি অর্থনীতিকে পশ্চাৎপদ ও ভংগুর করে রাখছে, কৃষকদের দারিদ্র ও দুঃস্থতা বাড়িয়ে তুলছে। কৃষির এই সংকট দেশের সমগ্র অর্থনীতিকে পিছন দিকে টেনে রাখছে। এরই জন্য খাদ্য সংকট এবং তা সমস্ত সাধারণ মানুষ, শ্রমিক-কর্মচারী প্রভৃতিকে আঘাত করছে ও শিল্প জগতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে। কৃষির ভংগুর অবস্থাই শিল্প বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও

কাঁচা মালের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না, যারা দেশের জন সংখ্যার বেশির ভাগ সেই কৃষকদের দুঃস্থতাই শিল্পের বাজারের সংকটকে বাড়িয়ে তুলছে; কৃষকের এই অবস্থাই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেশকে পশ্চাৎপদ রাখছে। এই জন্যই বলা হয়, যে দেশের সংকটের মূলে রয়েছে কৃষির সংকট এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল কাজই হলো কৃষি বিপ্লব সম্পন্ন করা অর্থাৎ কৃষিতে আধা-সামন্ততান্ত্রিক জঞ্জালকে ঝেঁটিয়ে দূর করা এবং সেই সংগে অন্য দুটি শোষণ হতে তাকে মুক্ত করা।

কোন্ শক্তির বিরুদ্ধে এই কৃষি বিপ্লব এবং কি তার কাজ, তা বুঝতে হলে আমাদের দেশের গ্রামের অবস্থার দিকে তাকাতে হবে। জমিদারশ্রেণীর সংগে রাজনৈতিক আপসের স্বার্থে এবং সীমাবদ্ধ পুঁজিবাদী বিকাশের তাগিদে কংগ্রেস সরকার ভূমি সংস্কারের নামে যা করল, তাতে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি সম্পর্কের অবসান তো দূরের কথা, বিশেষ পরিবর্তনও করা হলো না। শাসক গোষ্ঠীর প্রধান প্রচেষ্টা হলো, বড় জোতের মালিক এবং ধনী কৃষকদের কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের সাহায্যে মজুর খাটিয়ে পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে কিছু উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা এবং গ্রামাঞ্চলে শাসকশ্রেণীর ভিতকে সংহত করা। পুরাণো সামন্তবাদী জমিদারদের কিছুটা পুঁজিবাদী জমিদারে পরিণত করার উদ্দেশ্যও দেখা যায়। শাসকশ্রেণীর সমস্ত কাজ-কর্ম হতে এই উদ্দেশ্যই প্রমাণিত হয়।

অবশ্য ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে তাদের এই আশা অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হয়েছে। গলিত সামন্ততান্ত্রিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী সম্পর্কই তার প্রধান কারণ। বিধিবদ্ধ খাজনা আদায়ী জমিদারী ব্যবস্থা ক্ষতিপূরণ দিয়ে উঠিয়ে দেওয়া হোল, কিন্তু তাতে সাধারণ কৃষকের কোনো সুবিধা হোল না এবং রাষ্ট্রেরও আয় বাড়লো না। জমিদারদের প্রচুর খাস জমি রাখতে দেওয়া হোল। অন্য দিকে বড় জোতের মালিক জোতদার-মহাজনদের অতিকায় মালিকানাকে একটু সীমাবদ্ধ করার প্রহসন হোল, কিন্তু নানাভাবে তাদের হাতে বিপুল পরিমাণ জমি কেন্দ্রীভূত রাখতে দেওয়া হোল। প্রজা ও বর্গাদার ব্যাপক-হারে উচ্ছেদ হয়ে চলল। সামান্য উদ্বৃত্ত বা খাস জমি যা বিলি করা হোল তার চেয়েও অনেক বেশী জমি হতে উচ্ছেদ হোল। অনেক খাস জমি জমিদারদের আত্মসাৎ করতে দেওয়া হোল গরিবদের বঞ্চিত করে।

এই সব বড় জমির মালিকেরা প্রধানতঃ পুরাণো আধা-সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতেই শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের উপর কিছুটা পুঁজিবাদী সম্পর্কের প্রলেপ পড়েছে মাত্র। তার উপরে সাম্রাজ্যবাদী ও

একচেটিয়া কবলিত পুঁজিবাদী বাজারের ঘূর্ণাবর্তে কৃষি ব্যবস্থা আরো বেশি ডুবে যেতে লাগলো, এর কথা আগেই বলা হয়েছে। এই ঘটনা জোতদার, মহাজন, মজুতদারদের হাতকেই শক্তিশালী করছে।

পুঁজিবাদী বাজারের অসম বিনিময় ও জিনিষের বদলে নগদ টাকার ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যের চাপে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ ইংরেজ আমলেই দেখা দিয়েছিল ও এখন তা বেড়ে চলেছে। গত ২০ বছরে তা আরও প্রকট হয়েছে।

সাধারণ কৃষক আরো জমি হারিয়েছে, ক্ষেতমজুর, বর্গাদার প্রভৃতির সংখ্যা ও দুঃস্থতা আরো বেড়েছে; সমস্ত কৃষকের মধ্যে ক্ষেতমজুর, বর্গাদার ও গরীব চাষীর সংখ্যা শতকরা ৭৫-৮০ ভাগের কম হবে না! মাঝারি চাষী কোনক্রমে টিকে থাকার চেষ্টা করছে, কিন্তু অনিবার্যভাবে নীচের দিকে টান পড়ছে। ধনী কৃষকের ক্ষুদ্র স্তর অর্থাৎ যারা মজুর খাটালেও নিজেরা চাষে অংশ গ্রহণ করে এবং যাদের উদ্বৃত্ত হয় তারা সরকারী সাহায্যের কিছু অংশ পেয়ে একটু গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। এদের মধ্যে যাদের জমি ততো বেশি নয়, তারা তেমন সুবিধা পাচ্ছে না; তাদের উপর নানা চাপও রয়েছে। কিন্তু যাদের বেশি জমি আছে তাদের কেউ কেউ জোতদার-মজুতদারের দলে উন্নীত হচ্ছে।

মান্ধাতার আমলের চাষের পদ্ধতির বিশেষ পরিবর্তন হচ্ছে না। মজুর খাটিয়ে পুঁজিবাদী কায়দায় উন্নত চাষের ব্যবস্থা অর্থাৎ কৃষিতে ধনতন্ত্র কিছু বেড়েছে। উদ্বৃত্ত ফসল নিয়ে মজুতদারী ও মুনাফাবাজী করার সুযোগ থাকায় বেশি ফসলের জন্য জোতদার ও ধনী কৃষকেরা উন্নত সেচ, সার, বীজ প্রভৃতির সীমাবদ্ধ সরকারী ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মজুর খাটিয়ে চাষের কিছু ব্যবস্থা করছে। কিছু কিছু মাঝারি চাষী ও মধ্যবিত্তের মধ্যেও এই ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এমন উন্নত চাষ খুবই সীমাবদ্ধ। জমিহীন ও কাজের সুযোগ হতে বঞ্চিত অ-গণিত ক্ষেতমজুর ও গরিব চাষী থাকায় এবং তাদের নির্মমভাবে শোষণ করে ফসল আত্মসাৎ করার সুযোগ থাকায় জোতদার-মহাজনেরা বেশি খরচ করে প্রত্যক্ষ চাষের বেশি ঝুঁকি নিতে যাবে কেন?

অন্য দিকে মাঝারি ও গরিব চাষীদের পক্ষে উন্নত চাষের কোনো সুযোগ নাই, ক্ষমতাও নাই। ক্ষেতমজুরদের সীমাহীন দুঃস্থতার জন্য তাদের মজুরীর সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকছে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের জুলুম (নামমাত্র মজুরী, দাদনের জুলুম, সামাজিক অত্যাচার প্রভৃতি)। তাই দেখা যাবে যে, উন্নত চাষ ও কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ খুবই সীমাবদ্ধ। এই ধন-

তান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থাও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গ্রামাঞ্চলে প্রধানতঃ সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী সম্পর্ক ও শোষণ ব্যবস্থার ভিতের উপর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রলেপ এবং বিশেষ করে বাজারের চাপ গ্রাম্য অর্থনীতির ব্যবস্থাকে বড় বিষাদময় করে তুলেছে।

পুরাণো খাজনাভোগী জমিদারদের বদলে গ্রামাঞ্চলে প্রভূত জমি ও প্রভূত অর্থের মালিক বড় জোতদার-মহাজন-মজুতদারদের এক অত্যন্ত শক্তিশালী মিলিত চক্র সংহত হয়ে উঠেছে। এরাই জমির বৃহৎ মালিক, এরাই টাকার কুমির, এরাই মহাজনী ও দাদনের কারবারে এবং মজুতদারীতে নিযুক্ত। প্রভূত জমি ও অর্থের মালিক বলে এরাই উদ্বৃত্ত ফসলের বেশির ভাগ আত্মসাৎ করে, গরিবের ফসল কম দামে আত্মসাৎ করে ও মজুত করে অতি মুনাফা করে। খাদ্যে মজুতদারীই খাদ্য সংকটের প্রধান কারণ। একচেটিয়া বাজার ও শহরের মজুতদারী চক্রের এরাই হলো বাহন। এরাই সরকারী সাহায্যের বেশির ভাগ আত্মসাৎ করে, গ্রাম্য জীবনের সব কিছুর উপর আধিপত্যই প্রধান। গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন এদের হাতের মুঠোয়। এই প্রতিক্রিয়াশীল আধা-সামন্ততান্ত্রিক চক্রই গ্রামাঞ্চলে শাসক গোষ্ঠীর স্তম্ভ এবং এরাই কৃষি ব্যবস্থার ও কৃষকদের সামনে প্রধান শত্রু হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে ও করেছে। এই চক্রকে ভেংগে দিতে না পারলে এবং এদের জোতদারী-মহাজনী ও মজুতদারীর মিলিত শোষণ হতে কৃষি ব্যবস্থাকে এবং কৃষকদের মুক্তি দিতে না পারলে কৃষিকে সংকট হতে বাঁচানো যাবে না। কোটি কোটি মেহনতী কৃষককে দুঃস্থতার গহ্বর হতে টেনে তুলে তাদের সৃজনী শক্তিকে বাধা মুক্ত করা যাবে না। এই হলো কৃষি বিপ্লব।

কৃষি বিপ্লবের অবশ্য করণীয় কাজ হলো উক্ত শোষক চক্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে ভেংগে দেওয়া, তাদের জমি জমিহীন ক্ষেতমজুর ও গরিব কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা। তাদের কাছ থেকে নেওয়া কৃষকদের ঋণ বাতিল করা এবং গ্রাম্য জীবনে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ও জুলুমের অবসান করা। সেই সংগে প্রয়োজন সাম্রাজ্যবাদী ও একচেটিয়া পুঁজির শোষণ হতে এবং বিশেষ করে বাজারের লুঠ হতে কৃষকদের মুক্তি। সহজেই বোঝা যায়, যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও শ্রেণী-শাসনের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই এই মৌলিক কর্তব্য সম্পন্ন হতে পারে না। শ্রেণী স্বার্থ রচিত সংবিধানের মধ্যে উপর থেকে আইন করে বা জমিদারদের বানানো দলিল দস্তাবেজের উপর নির্ভর করেও এই কাজ হতে পারে না। কৃষকদেন সংগঠিত শক্তি এবং তাদের বিপ্লবের উদ্যোগ ও সংগ্রামের সর্বোচ্চ বিকাশের দ্বারাই তা হতে পারে।

এর থেকেই কৃষি বিপ্লবের সংগে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পর্কের প্রশ্ন এসে যায়। এ দুটিকে গুলিয়ে ফেলা ভুল হবে। একটি হোল মূলতঃ কৃষিতে সামন্ত শোষণের অবসানের কাজ, অন্যটি হোল মূলতঃ শ্রমিকের নেতৃত্বে জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। কিন্তু এই দুটিকে পরস্পর-সম্পর্কহীন পৃথক বস্তু মনে করাও ভুল। আমি আগেই বলেছি, যে কৃষি বিপ্লব হলো জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই কেন্দ্রীয় সারবস্তু। গ্রামাঞ্চলে জোতদারী চক্র হলো বর্তমান রাষ্ট্র শক্তির গ্রাম্য প্রতিভূ এবং এই রাষ্ট্র শক্তিই গ্রাম্য শোষণ ব্যবস্থাকে রক্ষা করছে। তাই, সাক্ষাৎভাবে গ্রাম্য সামন্ত চক্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও বাস্তবে কৃষি বিপ্লবকে সফল করতে হলে সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার মোকাবিলা করেই এগুতে হবে।

তাই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রশ্ন হতে কৃষি বিপ্লবকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তা হবে মারাত্মক ভুল। একে শুধুমাত্র সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম হিসাবে দেখলে অথবা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে কৃষি বিপ্লবকেই সব কিছু মনে করলে শ্রেণী শত্রুকে ছোট করে দেখা হবে, বিপ্লবকে সহজ মনে হবে এবং তা হতে হঠকারী মনোভাব সৃষ্টি হবে। বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস দেখিয়ে দিচ্ছে, যে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অংগ হিসাবেই কৃষি বিপ্লব গড়ে ওঠে, কৃষি বিপ্লবের অগ্রগতি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে শক্তি যোগায়, আবার এই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের গতিপথে কৃষি বিপ্লবের কাজও এগিয়ে যায়। কিন্তু শ্রমিক নেতৃত্বে জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত কৃষি বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণ করা যায় না।

শুধু তাই নয়, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক প্রয়োজনের সংগে সংগতি রেখেই বিভিন্ন সময়ে কৃষক সংগ্রামের স্লোগান স্থির করতে হয়। নচেৎ বিপ্লব এগুতে পারে না। রুশ বিপ্লবে গণতান্ত্রিক বিপ্লব কৃষি বিপ্লবের কাজ শেষ করে নি, তাই শ্রমিক বিপ্লব অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সংগে যুক্ত হয়েছিল কৃষকের বিপ্লবী সংগ্রাম এবং শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরই কৃষি বিপ্লব পূর্ণতা লাভ করতে পেরেছিল, তার আগে নয়। চীনের বিপ্লবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অংগ হিসাবেই কৃষি বিপ্লব এগিয়েছিল; অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রধানতঃ কৃষি বিপ্লবের রূপেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব এগিয়েছিল এবং সেই অগ্রগতির পথে সামন্ত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে যাচ্ছিল; কিন্তু জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবার আগে, জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে কৃষি বিপ্লবের কর্তব্য সমাধা হতে পারে নি; অনেক এলাকায় ভূমিসংস্কার বিপ্লবের অনেক পরে হয়েছে। কৃষি

বিপ্লবের মূল লক্ষ্য সব সময় এক থাকলেও জাপ-বিরোধী সংগ্রামের রাজনৈতিক প্রয়োজনের সংগে সংগতি রেখে চীনে সেই সময় জমিদারদের জমি দখল ও বণ্টনের স্লোগানের বদলে খাজনা কমানোর স্লোগানে তাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছিল। ভিয়েতনামে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেশ ভক্ত জমিদার ও বিশ্বাসঘাতক জমিদারদের মধ্যেও পার্থক্য করতে হয়েছিল। চীনে বিপ্লবের পরেও বিভিন্ন নূতন এলাকায় ভূমিসংস্কার শুরু করার সময় প্রথমে সবচেয়ে ঘৃণিত জমিদারদের বিরুদ্ধে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করার সঠিক কৌশল দেওয়া হয়েছিল। এই সব উদাহরণ কৃষি বিপ্লবের সংগে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পর্ক সম্বন্ধে উপরোক্ত বক্তব্যই প্রমাণ করে।

এই প্রসংগে ছোট ছোট বা মধ্যবিত্ত অ-কৃষক জমির মালিকদের প্রশ্ন বিবেচনা করা দরকার। চীনে বা ভিয়েতনামে এদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল বলে জানা নেই। কিন্তু ভারতে, বিশেষতঃ পশ্চিমবংগে নানা ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে এদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। এরা নিজেরা চাষ করে না, প্রধানত: বর্গায় চাষ করায়, এদের শোষণও কম নয়। এ শোষণের চরিত্র হলো সামন্ততান্ত্রিক। এই শোষণেরও অবসান ছাড়া কৃষি বিপ্লবের কর্তব্য শেষ হবে না। তাই বলে কি জোতদার-মহাজনের সংগে এদেরও জমিচ্যুত করা যায়? না, যায় না। কারণ তার অর্থ হবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে বাধা সৃষ্টি করা। সে জন্যই জোতদার ও প্রতিক্রিয়াশীলেরা অনবরত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালায়, যে এদেরও জমি কেড়ে নেওয়া হবে এবং এইভাবে এদের দলে টেনে গরিবদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে।

আমাদের বোঝা দরকার যে, এই সব ছোট মালিকেরা সামন্ততান্ত্রিক শোষণে লিপ্ত হলেও এরা জমিদার বা বড়লোক নয়। এদের মধ্যে আছে শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক প্রভৃতি—যারা অনেকেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশীদার ও পরে বিপ্লবেরও সাথী হতে পারে। সেই জন্যই এদেরকে জমিদারদের সংগে এক করে দেখা যায় না। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের পর যখন বিকল্প উপার্জনের দ্বারা এদের জীবিকা ও জীবনের মান সম্বন্ধে নিশ্চিত করা যাবে, তখনই এদের জমির শোষণ বন্ধ করা যেতে পারে, এরাও তা তখন মেনে নেবে; তার আগে পর্যন্ত এদের শোষণ সীমাবদ্ধ রাখাই হবে কাজ। যতদূর জানি তাতে চীনে এদের সংখ্যা কম থাকলেও এদের সম্বন্ধে এমনি নীতিই গ্রহণ করা হয়েছিল।

এই সব হতে একটি জিনিসই বোঝা যায়: তা হলো কৃষি বিপ্লবকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অংগ হিসাবে দেখতে হবে এবং এ সংগ্রাম খুব

কঠিন বলেই জনগণের চেতনা ও সংগঠনের স্তর অনুযায়ী কার্যক্রম নিতে হবে। অতি বিপ্লবীরা মুখে না হলেও কাজে তা বিশ্বাস করে না। তাই কৃষি বিপ্লবকে তারা খুব সহজ মনে করে এবং সেই জন্য স্থান কাল বিবেচনা না করে সর্বত্র, এমনকি দু-একটি বিচ্ছিন্ন গ্রামেও কৃষি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে, তাই তারা ছোট বড় নির্বিশেষে সমস্ত অ-কৃষক মালিকদের, এমন কি বাগিচা ও কারখানার শ্রমিকদের পর্যন্ত, জমি দখল করার বিপজ্জনক শ্লোগান দেয়। দু'বছর আগে শারদীয়া "দেশহিতৈষী"-তে এক প্রবন্ধে আমি সঠিকভাবেই বলেছিলাম যে, আইন করেও জমিদারদের বানানো দলিল দস্তাবেজের উপর নির্ভর করে কৃষি বিপ্লব হবে না। এইটা দেখিয়েই "কফি-বিপ্লবীরা" বলতে লাগল যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে এমন বিপ্লবী কাজ না করায় কমিউনিস্ট নেতারা বেইমান হয়ে ঐ বক্তব্য ত্যাগ করছে। কৃষি বিপ্লবের কাজ বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে গঠিত যুক্ত-ফ্রন্টের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আশা করা বা তা করতে যাওয়া যে বাতুলতা—এও যেমন তারা বোঝে না, তেমনি কৃষি বিপ্লবের লক্ষ্যকে সামনে রেখে গণ-সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সমস্ত মধ্যবর্তী সুযোগকে যুক্তফ্রন্ট তার অন্যতম কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তাও তারা বুঝতে চায় না। একেই বলে হঠকারী পাগলামি।

অন্য দিকে দেখা যাবে যে, সংশোধনবাদীরা কৃষি বিপ্লবের ও জনগণ-তান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাই অস্বীকার করে। বাস্তবকে অস্বীকার করে তারা এই ধারণাই সৃষ্টি করতে চায় যে, বর্তমান শাসকরাই কৃষিতে প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দূর করে পুঁজিবাদ বিকাশ করে তুলছে, তাই জমির বণ্টনের সমস্যা আর তত তীব্র নয়। তাদের মতে আজ যা প্রয়োজন তা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অংগ হিসাবে কৃষি বিপ্লব নয়। কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের চাপে জাতীয় ধনীদের সহযোগীতায় ধাপে ধাপে এগিয়ে তথাকথিত জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংস্কার করে কৃষক সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করা যাবে; তাই তারা যুক্তফ্রন্টের আমলে শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামী শক্তির স্ফুরণকে প্রধান কাজ হিসেবে নিতে পারেনি, বরং এগুলিকে বাড়াবাড়ি ও যুক্তফ্রন্টের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মনে করেছে এবং তার জন্য মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে সংকীর্ণ বলে দোষারোপ করেছে। কৃষি বিপ্লব সম্বন্ধে এই দুই বিচ্যুতিই ক্ষতিকর।

এইবার দেখা দরকার, কোন্ শ্রেণী বিপ্লবে কীভাবে অংশ গ্রহণ করবে অর্থাৎ বিপ্লবের অগ্রগতির সাফল্যের জন্য কোন্ শ্রেণীকে কী ভূমিকা পালন করতে হবে। এ বিষয়ে কোনো বিতর্ক হতে পারে না, যে কৃষক সমাজকেই

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে কৃষি বিপ্লবে যোগ দিতে হবে এবং তাদেরই প্রধান শক্তি হিসাবে কাজ করতে হবে। সংখ্যার দিক দিয়ে, অবস্থানের দিক দিয়ে, (শাসকশ্রেণীর কেন্দ্রীভূত শক্তির বাইরে গ্রামের অবস্থান) কৃষকদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কৃষক আজ সম-স্বার্থসম্পন্ন একক জন সমষ্টি নয়। তাদের মধ্যে শ্রেণী ভেদ হয়েছে। সংকট সব অংশকে সমানভাবে আঘাত করে না। তাই কৃষি বিপ্লবে সবাইকার স্বার্থ সমান নয়।

খেতমজুর ও গরিব চাষীরাই সবচেয়ে বেশী আঘাত খাচ্ছে। কৃষি বিপ্লবে যে সাহস, দৃঢ়তা ও একটানা সংগ্রামী ক্ষমতার প্রয়োজন তা স্বাভাবিক কারণে এদেরই মধ্যে গড়ে উঠতে পারে। সেই জন্য এরাই হবে গ্রামাঞ্চলের বিপ্লবের সবচেয়ে দৃঢ় ভিত্তি। মাঝারি কৃষকদের স্বার্থ এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছে বলে এরা হবে সংগ্রামের ঘনিষ্ঠ মিত্র। আর ধনী চাষীদের বেশির ভাগ একদিকে যেমন বর্তমান শাসনে কিছুটা উপকৃত হচ্ছে তেমনি অন্য দিকে অনেক বাধা ও অসুবিধা ভোগ করছে। তাই এরা হবে দোদুল্যমান শক্তি, তবে এদের বিপ্লবের সপক্ষে আনা যেতে পারে এবং আনার চেষ্টা করা কর্তব্য। গ্রামাঞ্চলের অ-কৃষক মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও অনেক গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশীদার হবার সম্ভাবনা রাখে।

এই বিশ্লেষণ দাবি করে, যে খেতমজুর ও গরিব চাষীদের দ্রুত সংগঠিত ও সচেতন করা এবং তাদের সংগ্রামী শক্তি বিকশিত করার উপর খুব জোর দিতে হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সময়কার সর্বব্যাপক সাধারণ কৃষক ঐক্যের ধারণা আজ অচল! মাঝারি কৃষকের উপর ভিত করে কৃষক ঐক্যের পুরাণো ব্যবস্থা আজ কৃষি বিপ্লবের উপযোগী নয়, অথচ এই পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী এখনও কৃষক আন্দোলনের কর্মীদের পিছনে টেনে রাখছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক ফ্রন্টের কর্তব্য সংক্রান্ত দলিলে এই দুর্বলতাকেই তুলে ধরা হয়েছে। খেতমজুর ও গরীব কৃষকদের সংগঠিত ও সচেতন করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই নতুন ভিত্তিতেই মাঝারি কৃষক সহ সমস্ত কৃষকের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। সংকট দ্রুত ঘনীভূত হচ্ছে বলে এই কর্তব্য অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। এ কর্তব্য পালন না করে বিপ্লবের কথা বলার অর্থ শুধু স্বপ্ন দেখা। অন্য দিকে এ কর্তব্য পালন না করতে পারলে সর্বগ্রাসী সংকটের সঙ্গে প্রতি বিপ্লবের আক্রমণ জনগণকে গ্রাস করতে পারে।

এই বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা ভালভাবে বোঝা দরকার। কৃষি বিপ্লব কৃষকই সম্পন্ন করবে, এ রকম কোনো ধারণা থাকলে তার চেয়ে অজ্ঞতা

আর কিছু হতে পারে না। মার্কসবাদ সম্বন্ধে ও বিভিন্ন দেশের বিপ্লব সম্বন্ধে এবং সেই সংগে ভারতের অবস্থা ও রাষ্ট্রের চরিত্র সম্বন্ধে যাদের সামান্য জ্ঞানও আছে, তাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না, যে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব ও তাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছাড়া এই বিপ্লব সফল হতে পারে না। পশ্চাৎপদ অর্থনীতির সংগে যুক্ত গ্রামে গ্রামে ছড়ানো, খেতমজুররা-কৃষকরা সাহস ও বীরত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। কিন্তু, সমস্ত সংগ্রামী শক্তিকে সংহত করা ও দূর দৃষ্টি নিয়ে তাকে পরিচালিত করা অর্থাৎ নেতৃত্ব দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। জার্মানিতে কৃষক বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা হতে কমরেড এংগেলস্ তা স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন।

একমাত্র আধুনিক উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার ধারক শ্রমিকশ্রেণী, যারা এমনিতেই সংগঠিত, তারাই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে। ফরাসী বিপ্লবের পর আর কোনো দেশে ধনিকশ্রেণীর পক্ষে কৃষি বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হয় নি। আজ যখন বিশ্বপুঁজিবাদ পচনের শেষ স্তরে এসেছে, যখন দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর ও জনগণের সংগ্রাম অনিবার্যভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে চলেছে, যখন ভারতের বর্তমান স্তরের বিপ্লব মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী হলেও তাকে একই সংগে একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে (সমস্ত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নয়) আঘাত করতে হবে—যখন বৃহৎ বুর্জোয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে বিপ্লব এগুতেই পারে না, তখন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এবং ভারতের অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয় ও সংগঠিত অংশ গ্রহণ ছাড়া বিপ্লবের বিকাশ, অগ্রগতি ও সাফল্য কল্পনাই করা যায় না। যদি শ্রমিকশ্রেণীকে এই দায়িত্ব পালন করতে হয়, তা হলে তাকে সংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন হতে হবে। জনগণের সমস্ত স্তরের সংগ্রামের পুরোধা শক্তি হিসাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তা না হলে তার নেতৃত্বের ভূমিকা জনগণ স্বীকার করবে কি করে।

কিন্তু ভারতের সংশোধনবাদী-গোষ্ঠী কৃষি বিপ্লবে ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবে (তাদের মতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে) শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তাকে খোলাখুলিই অস্বীকার করে। তাদের উদ্ভট ধারণা অনুযায়ী প্রথমে খাস বুর্জোয়া নেতৃত্ব ও পরে বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর যৌথ নেতৃত্বে বিপ্লব এগিয়ে যাবে। এর চেয়ে ধনিকশ্রেণীর নগ্ন লেজুড় বৃত্তি ও শ্রেণী-সহযোগিতা আর কি হতে পারে? এরই জন্য শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামী শক্তিকে বিকশিত করার চেয়ে কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া দল এবং উপদলের সংগে যে কোনভাবে

ঐক্য গড়ে তোলার উপর বেশি জোর দেয়। এই নাক্কারজনক মনোভাব হতেই জনসংঘের সংগে যোগ দিয়ে মন্ত্রিত্ব করতে তাদের বাধে না।

অন্য দিকে অতি বিপ্লবীরা মুখে শ্রমিক নেতৃত্বের কথা মাঝে মাঝে বলে থাকে, কিন্তু কার্যতঃ তাকে নস্যাৎ করে। তাদের একটি গ্রুপের ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত দলিলের মতে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের কোনো সক্রিয় নিয়ামক ভূমিকা নেই, তাদের কাজ শুধু কৃষি বিপ্লবের পরিপূরক অর্থাৎ গৌণ-ভূমিকা পালন করা। তাদের ধারণা, ভারতে শ্রমিক নেতৃত্বের অর্থ হোল শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক মতাদর্শে পরিচালিত বিপ্লবীদের নেতৃত্ব এবং "শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শে পরিচালিত" কথার মানে মার্কসবাদের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও দেশের বাস্তব অবস্থায় তা প্রয়োগে সক্ষম এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরীক্ষিত কর্মীদের নিয়ে গঠিত শৃংখলাবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি নয়; তাদের মতে, এর অর্থ হোল মূলতঃ যারা কমরেড মাও সে-তুঙের নাম মুখস্ত ও ভুল নকল করতে পারে (কমরেড মাও সে-তুঙ-কে বোঝে নয়) এমন ভাবপ্রবণ যুবকদের পার্টি। এরা কেউ কেউ আবার এমন পর্যায়ে গেছে যে, তাদের মতে কৃষি বিপ্লব শুরু করার আগে এমনি পার্টির প্রয়োজন নেই; কৃষি বিপ্লব আপনা হতেই শুরু হয়ে যাবে এবং তার মধ্য দিয়ে পরে নেতা ও পার্টি তৈরী হবে। পেটি-বুর্জোয়া নৈরাজ্যবাদী কল্পনার দৌড়মাত্রা ছাড়িয়া গেছে।

বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে, যে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদে শিক্ষিত এবং শ্রমিকশ্রেণীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত শ্রমিক-কৃষক সংগ্রামের সচেতন কর্মীদের শৃংখলাবদ্ধ পার্টির মাধ্যমে শ্রমিক নেতৃত্ব পরিচালিত হয়। যে দেশে শ্রমিকশ্রেণী জন্ম নিয়েছে সেখানে তাদের বাদ দিয়ে বা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো সত্যকার শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হতে পারে না। অন্যান্য শ্রেণী হতে পার্টির কর্মী আসতে পারে, এমন কি বেশিও আসতে পারে, কিন্তু তাদের পূর্ব শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী ছেড়ে শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভংগী আয়ত্ত করতে হবে। এই পার্টিকে এমন হতে হবে, যা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভাষায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল নীতিগুলিকে বুঝে নিজেদের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে পারে, যা অন্য দেশের বিপ্লব হতে শিক্ষা গ্রহণ করে, কিন্তু নকল করে না। যা নিজের মস্তিষ্ককে বন্ধক না দিয়ে নিজে ব্যবহার করে এবং যা অন্য কোনো দেশের পার্টির (তা সে যত বড় পার্টি হোক) হুকুমে ওঠা-বসা করে না। এ হবে এমন পার্টি যা এক দিকে আন্তর্জাতিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবে, অন্য দিকে নিজের দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের সংগে

অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেকে পুষ্ট করবে। এমনি পার্টি ছাড়া শ্রমিক নেতৃত্ব হয় না। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তার দুর্বলতা দূর করে নিজেকে পার্টির যোগ্য হবার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হোল, শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা কি এমনি নীতিগত নেতৃত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে? যে দেশে শ্রমিকশ্রেণী সবেমাত্র জন্ম গ্রহণ করেছে বা সংখ্যায় কম, সেখানে স্বভাবতঃই শ্রমিকদের সাক্ষাৎ ভূমিকা কম হতে বাধ্য। কিন্তু যেখানে শ্রমিকেরা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত বেশি এবং অর্থনীতিকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সেখানে, তারা যদি সচেতন ও সংগঠিত না হয় এবং দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন না করে, সেখানে পার্টিও দুর্বল থেকে যায় এবং বিপ্লবী সংগ্রামও জয় যুক্ত হতে পারে না। অবশ্য শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয় ভূমিকা কী রূপ গ্রহণ করবে তা দেশের ও বিপ্লবের বিশেষ পরিস্থিতি এবং শাসকশ্রেণীর শক্তি সমাবেশের উপর নির্ভর করে। যেখানে শাসকশ্রেণী সমগ্র দেশে এক কেন্দ্রীভূত শাসন সামরিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যেখানে শাসন ও সামরিক ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন অথচ শ্রমিক কেন্দ্রগুলিতে ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস প্রতিষ্ঠিত, এই উভয় ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর সাক্ষাৎ ভূমিকা একই রূপ হতে পারে না। চীন বিপ্লবের উদাহরণ এবং ভারতের অবস্থা এই প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, চীনের বিপ্লবের নাম করেই অতি বিপ্লবীরা বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

চীনে শ্রমিকশ্রেণী ভারতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হলেও কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম হতেই তাদের ব্যাপকভাবে সংগঠিত করতে এবং তাদের উপর পার্টির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। পার্টিরই নেতৃত্বে তারা উত্তরাভিমুখী সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবী অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৯২৭ সালে চিয়াংকাই-শেকের বিশ্বাসঘাতকতার পর এরা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেছে। সংস্কারবাদের পর হঠকারী রাজনীতির বলি হয়ে তারা মার খেয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছিল। সহরে ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে প্রকাশ্যে সংগ্রামের কৌশল ত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু, তাদের চেতনা ও শক্তিকে তারা বজায় রেখেছিল এবং পরে বাড়িয়েছিল। তাই, চীনে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা অস্বীকার করা সত্যের অপলাপ মাত্র। অবশ্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে প্রকাশ্য সংগ্রামে অংশ গ্রহণ সম্ভব হয় নি। তা সত্ত্বেও চীনের গ্রামাঞ্চলে কী ভাবে বিপ্লবী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কী অবস্থায় তা টিকে থাকতে ও

বাড়তে পেরেছিল এবং কী ভাবে গ্রামাঞ্চলে মুক্তি সংগ্রাম জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছিল, তাও জানা দরকার। কুয়োমিনটাং ও কমিউনিস্ট পার্টির যুক্ত নেতৃত্বে অর্থাৎ বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর যুক্ত পরিচালনায় সংগঠিত উত্তরাভিমুখী বিপ্লবী অভিযানের অনুকূল পরিস্থিতিতে ব্যাপক অঞ্চলে কৃষকেরা জেগে উঠেছিল এবং জাতীয় বিপ্লবের পটভূমিকায় নিজেদের সশস্ত্র বিপ্লবী বাহিনীতে রূপান্তরিত করেছিল। এই অবস্থাই পরবর্তীকালে চিয়াং-এর সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরী করতে অত্যন্ত বেশি সাহায্য করেছিল।

এ সম্বন্ধে ১৯২৮ সালে বলতে গিয়ে কমরেড মাও-সে-তুঙ বলেছিলেন, যে শত্রুরা জনগণের সামনে শান্তিপূর্ণ কাজের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ধ্বংস করেছে। তাই, তিনি কমরেড স্তালিনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন, যে চীন বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য হোল, "সশস্ত্র প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব।" কী ভাবে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটিগুলি উঠল ও কী ভাবে তা টিকে থাকতে পারে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ঐ একই প্রবন্ধে বলেছেন, যে চীনের মুৎসুদ্দি ও জমিদারশ্রেণীর মধ্যে প্রতিনিয়ত ঝগড়া, বিভেদ ও যুদ্ধ বিশেষ সুযোগ এনে দিয়েছে। যতদিন এই পরিস্থিতি থাকবে ততদিন মুক্ত এলাকাগুলি টিকে থাকতে ও বাড়তে পারবে, তার জন্য অতিরিক্ত যা প্রয়োজন তা হলো: (১) শক্তিশালী গণভিত্তি, (২) শক্ত পার্টি সংগঠন, (৩) বেশ শক্তিশালী লাল ফৌজ, (৪) মুক্ত এলাকায় বেঁচে থাকার জন্য অর্থসম্পদ। (চিন কাং পাহাড়ের সংগ্রাম, ২৫শে নভেম্বর, ১৯২৮)।

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে "চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি" নামক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আবার বলতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন তার অর্থ হোল: (১) চীনে কোনো কেন্দ্রীভূত একক অর্থনীতি ছিল না, চীনে বিভিন্ন এলাকার অসম ও পশ্চাৎপদতা বেশী ছিল, (২) চীনের ব্যাপক এলাকা ছিল—যা লাল ফৌজকে নড়াচড়া করার ও শত্রুর কৌশল বুঝে কৌশল অবলম্বনের সুযোগ দিয়েছিল, (৩) চীন কোনো একটি সাম্রাজ্যবাদের শাসনাধীন ছিল না, এখানে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য ছিল। এখানে ছিল বহু সমর নায়ক—যাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ প্রায়ই লেগে ছিল। প্রতি-বিপ্লবী শিবির ছিল বিভক্ত ও দ্বন্দ্বে ভরা। মোদ্দা কথা হোল এই যে, চীনে শত্রুরা মিলিত ছিল না, নিজেরা ঝগড়া ও যুদ্ধ করত। এখানে কোনো কেন্দ্রীভূত শাসন ও সামরিক ব্যবস্থা ছিল না। বিরাট এলাকা অথচ আর্থিক পশ্চাৎপদতা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতা ছিল। এই সব

কারণেই শহরাঞ্চলে ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের জন্য শ্রমিকশ্রেণী প্রকাশ্যে বিপ্লবী কাজ না করতে পারলেও গ্রামাঞ্চলের মুক্ত ঘাঁটিগুলি শক্তি সঞ্চয় করে জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে পেরেছে।

চীনের এই বিশেষ অবস্থা না বুঝে তার প্রতিটি কৌশলকে হুবহু নকল করা এবং তার অভিজ্ঞতাকে বিকৃত করে ভারতের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয় ভূমিকাকে লঘু করে দেখা মারাত্মক ক্ষতিকারক। নিশ্চয়ই অন্য যে কোন দেশের মতোই ভারতেও শাসকশ্রেণীর রাষ্ট্র শক্তির প্রধান ঘাঁটি হোল শহর ও শিল্পাঞ্চলগুলি এবং গ্রামাঞ্চলগুলি এই সব হতে দূরে। এখানেও বিভিন্ন অঞ্চলের বিকাশ অসম, তাই বিপ্লবী সংগ্রামেরও বিকাশ অসম হতে বাধ্য। কিন্তু এও বোঝা দরকার যে, এখানে অর্থনীতি ও রাষ্ট্র শক্তি অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের জের হিসাবে এখানে সারা দেশ একই কেন্দ্রীভূত শাসন ও সামরিক ব্যবস্থায় সংগঠিত। এখানে অর্থনীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী। এই সব কারণেই এখানে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীকে সাক্ষাৎ সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তা না হলে কৃষকের বিপ্লবী সংগ্রামকে টিকিয়ে রাখা, বিকশিত করা ও সাফল্যমণ্ডিত করা যাবে না।

অবশ্য শ্রমিকদের এই ভূমিকা কী বাহ্যিক রূপ গ্রহণ করবে তা নির্ভর করবে বাস্তব পরিস্থিতি এবং শাসকশ্রেণীর ব্যবহারের উপর। শ্রমিকশ্রেণী যাতে এই ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্য তাকে বেশি সংগঠিত ও রাজনীতিক সচেতন হতে হবে। নিজের দাবির সংগ্রাম ছাড়াও তাকে কৃষকদের সংগ্রামের সমর্থনে ও সাধারণ রাজনীতির প্রশ্নে অনেক বেশি সক্রিয় হতে হবে। এই সব বিষয়ে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন যথেষ্ট দুর্বলতা আছে। শ্রমিক আন্দোলনকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত মতো অতি দ্রুত অর্থনীতিবাদের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

ভারতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ও কৃষি বিপ্লবের লক্ষ্য, কাজ ও শ্রেণী সমাবেশ সম্বন্ধে এই সাধারণ ধারণা ও বিশ্লেষণকে সামনে রেখেই বর্তমানের ইতিকর্তব্য স্থির করতে হবে। বিপ্লবের লক্ষ্য, কাজ ও শ্রেণী সমাবেশের প্রশ্ন হোল রণনীতির প্রশ্ন। রণনীতি আর বিশেষ সময়ের রণকৌশলকে গুলিয়ে ফেলা অপরাধ। রণনীতির লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য বিশেষ পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও জনসাধারণের চেতনা ও সংগঠন অনুযায়ী বিশেষ কর্মকৌশল গ্রহণ করতে হয় এবং তা অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তন করতে হয়। একেই রণকৌশল বলে।

অবস্থা প্রস্তুত না হলে শুধু সদিচ্ছা দিয়ে বিপ্লব হয় না। অবস্থার ঘাত

প্রতিঘাত এবং আশু অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ বিপ্লবী অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায়। তার পূর্ব পর্যন্ত আন্দোলনের সমস্ত সুযোগ, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সংসদীয় অবস্থা প্রভৃতি সব কিছুকেই কাজে লাগিয়ে জনগণের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তারই ভেতর দিয়ে ধাপে ধাপে জনগণ সচেতন হয়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সংগঠিত হয়, সংসদীয় মোহ সহ সমস্ত মোহ ঝেড়ে ফেলতে শেখে। আজ পর্যন্ত কোনো দেশে বিপ্লব শান্তিপূর্ণ-ভাবে হয় নি। তার কারণই এই নয় যে, শ্রমিকশ্রেণী রক্তাক্ত সংগ্রাম পছন্দ করে। ধনিকশ্রেণীই রক্ত ও অশ্রুর খেলা খেলে। শাসকশ্রেণী জনগণের সামনে অন্য কোন পথ খোলা রাখে না, তাদের বাধ্য করে সশস্ত্র আক্রমণের মোকাবিলা করতে। একথা মনে করা ভুল যে, শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণ প্রথম হতেই একথা বুঝে ফেলে। নানা দৈনন্দিন সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই জনগণের উপর বিপ্লবের বিশেষ রূপকে চাপিয়ে দেয়। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এই শিক্ষাই দেয়। বিপ্লবের লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য এই দুরূহ কঠিন প্রক্রিয়াকে বাদ দিয়ে দু-চারটি বিপ্লবী মনের রঙ দিয়ে জনগণকে চিত্রিত করে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখলে বিপ্লব হয় না। অন্য দিকে বিপ্লবের লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনগণকে সংগ্রামের প্রতি স্তরে শিক্ষিত না করলে, জনগণের চিন্তাধারাকে অর্থনৈতিক ও সংসদীয় চিন্তার কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে, শাসকশ্রেণীর চরিত্রকে প্রত্যেকটি সুযোগে তাদের সামনে উদ্ঘাটিত না করলে এবং সর্বতোভাবে জনগণের সংগ্রামী শক্তিকে পুষ্ট না করলে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়া যায় না এবং শ্রেণী শোষণকে বজায় রাখতেই সাহায্য করা হয়। এই উভয় ভুলকে পাশ কাটিয়ে সঠিক কৌশল গ্রহণ করতে পারাই বিপ্লবী নেতৃত্বের যোগ্যতার পরিচয়। ঘনীভূত সংকটের পটভূমিকায় অতি দ্রুত সমস্ত ত্রুটি, বিচ্যুতি ও দুর্বলতা দূর করে, সংশোধনবাদী ধ্যান ধারণা, অভ্যাস প্রভৃতির জের কাটিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি বিপ্লবীপনা সম্বন্ধে সাবধান হয়ে শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী জনগণকে সংগঠিত করা, তাদের সচেতন করা, তাদের বর্তমান আন্দোলনগুলিকে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সীমাবদ্ধ গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করা ও কাজে লাগানো এবং আগামী ঝোড়ো দিনে মহত্তর দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রত্যেকটি সাচ্চা বিপ্লবীর কর্তব্য।

—দেশহিতৈষী, শারদ সংখ্যা ১৯৬৬

৯ কমরেড লেনিনের শিক্ষার আলোকে কৃষকের সংগ্রাম

কমরেড লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী বৎসরে পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণীর ন্যায় কোটি কোটি মেহনতী শোষিত কৃষক—যারা সমগ্র জন সংখ্যার সর্বাধিক সংখ্যক অংশ, তারা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করবে সেই মহান নেতাকে, যিনি তাঁর সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিচারের সংগে বৈপ্লবিক প্রেরণা মিশিয়ে তাদের সঠিক মুক্তির পথকে উদ্ভাসিত করে গেছেন। তিনি বর্তমান সমাজে সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী শোষণে নিষ্পেষিত কৃষকদের মর্মন্তুদ বিষাদময় জীবনের চিত্র দেখে ভাবাবেগে কাতর হয়ে তাদের সামনে সহজ সস্তা মুক্তির স্বপ্নজাল সৃষ্টি করেন নি, বিজ্ঞানীর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি তাদের সামনে তুলে ধরেছেন, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কঠিন কঠোর বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত মুক্তির পথ।

কমরেড লেনিন মার্কসবাদের বিপ্লবী তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে শুধু শ্রমিক ও কৃষকের মুক্তির পথ নির্দেশই করেন নি, বিপ্লবের প্রতিটি ধাপ নির্দিষ্ট করেছেন, প্রতিটি ধাপের কর্তব্য স্থির করেছেন, সেই মতো শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত করেছেন ও শিক্ষিত করেছেন, এবং নিজের সাক্ষাৎভাবে বিপ্লবের জোয়ার-ভাটার মধ্যে থেকে বিপ্লবকে সার্থকতার পথে পরিচালিত করেছেন। কমরেড লেনিনেরই নেতৃত্বে পৃথিবীতে প্রথম শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির কামনা স্বপ্নের জগত ছেড়ে বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছে। রুশ বিপ্লব শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক-কৃষককে মুক্তি দেয় নি, সারা পৃথিবীর জনগণের সামনে অগ্রগতির পরীক্ষিত পথ নির্দেশ করেছে। রুশ বিপ্লবের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি শ্লোগান ও কৌশল স্থান-কাল-পাত্র নির্বিচারে নকল করার কোন প্রচেষ্টা কমরেড লেনিনেরই শিক্ষার বিরোধী। কিন্তু বিপ্লবের স্তর, শ্রেণী বিন্যাস, শ্রমিক-কৃষকের সম্পর্ক, বিপ্লবের পদ্ধতি ও কর্তব্য সম্বন্ধে কমরেড লেনিনের মৌলিক শিক্ষাগুলি সারা পৃথিবীর শ্রমিক-কৃষকের সামনে অবশ্য গ্রহণীয় শিক্ষা হিসাবে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে বর্তমান অবস্থায় কৃষক সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা খুবই মহত্বপূর্ণ। কৃষক সমস্যা ও কৃষকের সংগ্রাম কমরেড লেনিনের শিক্ষার সব দিক আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়, তা করা আমার উদ্দেশ্যও নয়। গত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আন্দোলনে যে

নতুন জোয়ার দেখা দিয়েছে, তার পটভূমিকায় আমি ২।১টি প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করব।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী সোস্যালিস্ট নেতারা কৃষকদের বৈপ্লবিক শক্তিকে অস্বীকার করে দেখেছেন বা ছোট করেছেন, কৃষকদের সমস্যা সমাধানের প্রশ্নটিকে তাঁরা মূলত বুর্জোয়া নেতৃত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন; শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকদের বৈপ্লবিক শক্তির বিস্ফোরণকে তাঁরা ভয় করেছেন এই বলে যে, এতে বুর্জোয়ারা ভয় খেয়ে চলে যাবে ও তাতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ব্যাহত হবে। শ্রমিক বিপ্লবের পক্ষে কৃষক অভ্যুত্থানের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাকে এঁরা অস্বীকার করেছেন। অন্য দিকে সোসালিস্ট-রেভল্যুশনারি নামধারী পেটি-বুর্জোয়া নেতারা কৃষকদের মুক্তির জন্য শ্রমিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তাকে, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতেন। তাঁরা কৃষকদের সমস্বার্থ সম্পন্ন একক শ্রেণী হিসাবে দেখতেন এবং ঘোষণা করতেন যে, শ্রমিক নেতৃত্ব বাদ দিয়ে কৃষকেরাই সামন্তবাদ ও গোলামির অবসান ঘটাবে এবং জমি বন্টনের মাধ্যমে এক ধাপে তারা নিজেরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। কমরেড লেনিন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদ ও সোশ্যালিস্ট-রেভলুশনারিদের পেটি-বুর্জোয়া স্বপ্নবিলাস—উভয়ের বিরুদ্ধে প্রথম হতে তীব্র কষাঘাত করেছেন।

কমরেড কার্ল মার্কস ১৮৫৮ সালেই বলেছিলেন যে, শ্রমিক-বিপ্লবের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন "কৃষক যুদ্ধের (ষোড়শ শতাব্দীর জার্মানীর কৃষক বিদ্রোহ) কোন দ্বিতীয় সংস্করণের সমর্থন। প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা এই কথারই সারবত্তা প্রমাণ করছে। এই কথা মনে রেখে কমরেড লেনিন রুশ দেশে পার্টি গঠনের প্রথম হতেই বলে গেছেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের পক্ষে অপরিহার্য হোল তার সংগে কৃষকদের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে যুক্ত করা। সংগে সংগে তিনি বলেছেন, যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ছাড়া কৃষকদেরও মুক্তি অসম্ভব। পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে "ধনিকশ্রেণীর পিছনে শ্রমিকশ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে", কমরেড কার্লমার্কস-এর এই শিক্ষাকে মনে রেখে কমরেড লেনিন শিখিয়েছেন, যে বর্তমান যুগে সামন্তবাদ ও স্বৈরচারের জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে দূর করার জন্য মৌলিক কৃষক অভ্যুত্থানে বুর্জোয়াশ্রেণী নেতৃত্ব দিতে পারে না, কারণ এটা উপর থেকে আংশিক সংস্কার নয়, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূলসত্তা হিসাবে এই কৃষক অভ্যুত্থান বিপ্লবকে বুর্জোয়া স্বার্থের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে না, কৃষকদের মধ্যে যারা বেশির ভাগ অংশ সেই গরিব কৃষকদের জাগ্রত শক্তির সংগে মিতালি করে শ্রমিকশ্রেণী পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধাপে এগিয়ে যাবে।

কমরেড লেনিন এই ভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে কৃষক-সংগ্রামের গুরুত্ব এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর বাস্তব বৈপ্লবিক ভিত্তি দেখিয়েছে। ১৯০১ সালেই কমরেড লেনিন "শ্রমিক পার্টি ও কৃষক" প্রবন্ধে সচেতন শ্রমিকদের কাছে কৃষকদের সংগঠিত করার গুরু দায়িত্বের কথা তুলে ধরেছেন। নির্মম শোষণে নিষ্পেষিত ও নানা সমস্যায় জর্জরিত কৃষকদের সংগঠিত করার বাস্তব ভিত্তিও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ১৯০২ সালে তাঁর "গ্রামের গরীবদের প্রতি" নামক বিখ্যাত পুস্তিকায় সোজাসুজি কৃষকদের কাছে মুক্তির সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

তারপর হতে বিপ্লবের গতিপথে প্রতিটি পরিবর্তিত অবস্থায় এবং বিপ্লবের প্রতিটি ধাপে—১৯০৫ সালের বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বে, ১৯০৫ সালের বিপ্লবে, পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার সময়ে, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে, নভেম্বর বিপ্লবে, বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে—কৃষকদের সমস্যা ও সংগ্রাম সম্বন্ধে শ্রমিক-শ্রেণীকে শিক্ষিত করেছেন। একমাত্র শ্রমিকের নেতৃত্বেই সমস্ত কৃষক সামন্তবাদ ও স্বৈরাচার থেকে মুক্তি পেতে পারে, পরবর্তী ধাপে শ্রমিকের নেতৃত্বেই গরিব কৃষক ও পুঁজিবাদের শোষণ থেকে মুক্তি পেতে পারে, তারপরেও শ্রমিকের নেতৃত্বেই মাঝারি কৃষকসহ সমস্ত মেহনতী কৃষক দুঃখ-দারিদ্র্যের হাত হতে মুক্তি পেয়ে যৌথ প্রচেষ্টায় সুখী সমাজতন্ত্রে পৌঁছতে পারে। অন্য দিকে কৃষকের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রমিকশ্রেণী মিলিতভাবে সামন্তবাদ ও স্বৈরাচারের (ভারতের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ত-বাদ ও একচেটিয়া পুঁজির শোষণের) অবসান ঘটাতে না পারলে পুঁজিবাদী শোষণ হতে তার নিজের মুক্তি অর্জন হতে পারে না। শ্রমিকের মুক্তি সবার শেষেই সম্ভব।

কমরেড লেনিন এইভাবে শ্রমিক নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর বৈপ্লবিক তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। এই শিক্ষায় রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী শিক্ষিত হয়েছিল এবং কৃষকদের সংগঠিতভাবে পরিচালিত করতে পেরেছিল বলেই মহান রুশ বিপ্লব সার্থক হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করে সমাজতন্ত্রের পথে যেতে পেরেছে। এই শিক্ষার আলোকেই পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মুক্তি অর্জন করতে পেরেছে। কমরেড লেনিন জন্মশত-বার্ষিকী বৎসরে এই শিক্ষাকে আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ করতে হবে।

ভারতের সংশোধনবাদীরা শ্রমিক নেতৃত্বের প্রশ্নকে কার্যত অস্বীকার করছে। তারা বুর্জোয়া নেতৃত্বে বা মনগড়া বুর্জোয়া-শ্রমিক যৌথ নেতৃত্বে বা ধাপে ধাপে শ্রমিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার নামে কার্যত বুর্জোয়া নেতৃত্বে তথা-

কথিত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নামে কৃষক মুক্তির অলীক মোহজাল বিস্তার করছে। তাই তারা গরীব কৃষকদের বৈপ্লবিক শক্তির স্ফুরণ দেখে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতার নামে কৃষক সংগ্রামের কুৎসাকারীদের সংগে জোট পাকাচ্ছে।

ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টিকে কমরেড লেনিনের শিক্ষা আয়ত্ত করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণী যদি নিজেদের আত্মস্বার্থের অর্থনীতিবাদী চিন্তার গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে কৃষকদের সমস্যা ও সংগ্রামকে না বোঝে, যদি এই সংগ্রামের সংগে নিজেদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন না করতে পারে, যদি রাজনৈতিক চেতনায় শিক্ষিত হয়ে সমস্ত মেহনতী ও সংগ্রামী মানুষের পুরোভাগে দাঁড়াতে না পারে, তাহলে তারা তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। অন্য দিকে কৃষক সংগ্রামে নিযুক্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কর্মীরা যদি শ্রমিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগে কৃষকদের সংগ্রামী যোগসূত্র সম্বন্ধে কৃষকদের সচেতন না করে, তাহলে কৃষকদের সংগ্রামও ঈপ্সিত পথে এগোতে পারবে না।

কমরেড লেনিনের যে দ্বিতীয় শিক্ষার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন তা হোল—কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীভেদ, বিপ্লবের বিভিন্ন স্তরে কৃষকদের বিভিন্ন অংশের ভূমিকা এবং গরিব কৃষকদের উপর নির্ভর করার তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ। প্রত্যেক দেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কর্মীদের পক্ষে এ অবশ্য গ্রহণীয় শিক্ষা। কমরেড লেনিন দেখিয়েছেন, যে প্রাক্ পুঁজিবাদী সামন্তবাদ প্রধান কৃষি অর্থনীতিতেও বর্তমান বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রভাবে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীভেদ অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর মতো কৃষকদের একই স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন একটি শ্রেণী মনে করলে ভুল হবে, কারণ বাস্তবে তা নেই; কৃষকদের মধ্যে ধনী কৃষক, মাঝারী কৃষক ও কৃষি মজুরসহ গরিব কৃষক (সর্বহারা ও আধা-সর্বহারা) এমনি ভেদ দেখা দিয়েছে। সামন্তবাদ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ধনী কৃষকদের ক্ষোভ আছে, বিরোধিতা আছে। তাই, সামন্তবাদ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের স্তরে ধনী কৃষকসহ সকলেরই মিলিতভাবে চলার বাস্তব ভিত্তি রয়েছে।

কিন্তু, গরিব কৃষক ও কৃষি মজুরেরা সামন্তবাদ, স্বৈরাচার ছাড়াও ধনী কৃষকদের দ্বারা এবং পুঁজিবাদী শোষণের দ্বারা শোষিত হয়। ধনী কৃষকেরা হোল গ্রামাঞ্চলে বুর্জোয়াশ্রেণীর অংশ। তাই সামন্তবাদ বিরোধী স্তর পার হলে ধনী কৃষকেরা তার বিরুদ্ধে চলে যায়। কিন্তু কৃষি মজুর ও গরিব কৃষক শহরের শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগিতায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে

এগিয়ে না গেলে পূর্ণ মুক্তি পেতে পারে না। এইখানেই রয়েছে গ্রামের গরিবদের সংগে শ্রমিকশ্রেণীর নৈকট্য এবং বিশেষ মৈত্রী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা। তাই, কৃষক আন্দোলনকে গরিব কৃষকদের উপর ভিত্তি করে দাঁড় করাতে না পারলে, গরিবদের গ্রামাঞ্চলের সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকায় আনতে না পারলে এবং শহরের শ্রমিকশ্রেণীর সংগে তার বিশেষ মৈত্রী গড়ে তুলতে না পারলে, ধনী কৃষকের প্রভাবে কৃষক সংগ্রাম তার প্রয়োজনীয় বৈপ্লবীক গতিবেগ পেতে পারে না এবং পরবর্তী ধাপে ধনী কৃষকের বাধা প্রতিহত করে পূর্ণতা পেতেও পারে না।

১৯০১ সালেই তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে কমরেড লেনিন বলেছেন, যে গ্রামাঞ্চলে পাশাপাশি দুই রকমের দ্বন্দ্ব রয়েছে: "জমির মালিকদের সংগে কৃষি শ্রমিকদের দ্বন্দ্ব" এবং "সামন্ত শোষণের সংগে সমগ্র কৃষকদের দ্বন্দ্ব।" সংগে সংগে কমরেড লেনিন বলেছেন যে, "আমাদের কৃষি শ্রমিকেরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কৃষকদের সংগে যুক্ত ও কৃষকেরা সামগ্রিকভাবে যে দুর্ভাগ্যের শিকার তার দ্বারা কঠোরভাবে পিস্ট।" কমরেড লেনিন এই বাস্তব বিশ্লেষণ থেকে বিপ্লবের বিভিন্ন স্তর ও তাতে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত সিদ্ধান্তকে পুস্ট করেছেন।

তিনি বলেছেন, "গ্রামের গরীবদের প্রথমে জমিদারদের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে হবে এবং সামন্ত গোলামির সবচেয়ে ঘৃণ্য ও বিষময় ব্যবস্থাকে দূর করতে হবে, এই সংগ্রামে অনেক ধনী কৃষক ও বুর্জোয়া ভক্তরাও যোগ দেবে।........কিন্তু জমিদারদের ক্ষমতা সংকুচিত হলেই ধনী কৃষক তার আসল চরিত্র প্রকাশ করবে।.... তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং শহরের শ্রমিকশ্রেণীর সংগে অচ্ছেদ্য মৈত্রী স্থাপন করতে হবে।" সংগে সংগে কমরেড লেনিন এক ধাপে বিপ্লবের চরম স্তরে যাবার মনোভাবের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী দিয়েছেন। বাস্তব বর্জিত মনের কল্পনা হতে বিপ্লবের স্তর ও কর্তব্য নির্ধারিত হয় না, তা হয় বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে। বিপ্লব বুকনি দিয়ে হয় না, বিপ্লবের পথ সস্তা ও কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বিপ্লবের প্রতিটি ধাপে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে যত বেশী সংখ্যক সম্ভব মানুষকে সামিল করা, তা না করে এক লাফে বিপ্লবের চরম স্তরে বা লক্ষ্যে পৌঁছানর স্বপ্ন দেখা বিপ্লবের পক্ষেই ক্ষতিকর।

তাই কমরেড লেনিন বলেছেন, "গ্রামাঞ্চলে প্রথম ধাপ হোল কৃষকদের পূর্ণ মুক্তি......কিন্তু আমাদের চরম ধাপ হোল......সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। ......যিনি প্রথম ধাপের সংগে চরম ধাপকে গুলিয়ে ফেলবেন, তিনি সংগ্রামের ক্ষতি করবেন এবং অজান্তে গ্রামের গরিবদের ধোঁকা দিতেই সাহায্য করবেন।"

তিনি বলেছেন, যে এখনই মার্কসবাদীরা দুধ ও মধুর দেশের প্রতিশ্রুতি দেবেন না। "তাঁরা" ছোট কিন্তু নিশ্চিত "প্রথম ধাপের" পরামর্শ দেবেন।

আমাদের দেশেও কোন কোন পার্টি আছেন, যাঁরা কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ও কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী ভেদের কথা তুলে একেবারে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলেন। যারা এমনি কথা বলেন তাঁদের প্রতি কটাক্ষ করে কমরেড লেনিন বলেছেন, যে সমসাময়িক জমিদারী অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ ও ভূমি দাসত্বের লক্ষণগুলি মিশে থাকে। কিন্তু তত্ত্বে একমাত্র পণ্ডিত-মূর্খরাই কোনটা কত পরিমাণে আছে তা নিক্তি দিয়ে মাপতে চান এবং তারই ভিত্তিতে গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে কোন বিশেষ খাপের মধ্যে ফেলতে চান। এটা ভুল। কিন্তু তা হতে একমাত্র কল্পনা বিলাসীরাই দুই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারেন। তিনি বলেছেন, যে বর্তমান জমিদারী আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থার মধ্যে যত বেশী পুঁজিবাদী শোষণ প্রবেশ করবে, তত বেশীগ্রামের গরিবদের পৃথকভাবে সংগঠিত করা প্রয়োজন হবে, যাতে বিপ্লবের প্রথম ধাপের কাজ শেষ করে দ্রুত পরবর্তী ধাপে যাওয়া যায়। (পেটি-বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়ান সোসালিজম—১৯০৫ সাল।) কিন্তু প্রথম ধাপকে এড়িয়ে যাওয়া বা দুই ধাপকে গুলিয়ে ফেলার বিরুদ্ধে তিনি কঠোর সতর্কবাণী দিয়েছেন।

প্রথম ধাপকে তিনি বলেছেন, গণতান্ত্রিক বিপ্লব—যাতে সমস্ত কৃষক যোগ দেবে এবং চরম ধাপ হোল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—যাতে শ্রমিকশ্রেণী গ্রামের গরিবদের সহযোগিতায় এগিয়ে যাবে। কমরেড লেনিন বলেছেন যে, তাঁদের এই মতবাদ সোসালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের চেয়ে কম "শ্রুতি মধুর' হতে পারে, কিন্তু যারা শুধু মিষ্টি কথায় পেট ভরাতে চায় তারা অন্যদের দলে যোগ দিক, "আমরা" বলব ভালই হয়েছে। কমরেড লেনিন চরম লক্ষ্যের কথা বলে বিপ্লবের আশু ধাপের কর্তব্যকে ছোট করে দেখার বিরুদ্ধে বলেছেন, তেমনি আশু কর্তব্যের কথা বলে চরম লক্ষ্যকে ভুলে যাওয়া ও তার জন্য প্রস্তুতি না করার বিরুদ্ধেও বলেছেন। তাঁর শিক্ষা হোল এই যে, গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সমস্ত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, সংগে সংগে গরিব কৃষকদের বিশেষভাবে সংগঠিত করতে হবে, তাদের সংগে শহরের শ্রমিকশ্রেণীর বিশেষ মৈত্রী বন্ধন গড়ে তুলতে হবে, যাতে প্রথম ধাপ শেষ করে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়।

কমরেড লেনিন মাঝারি কৃষকদের ভূমিকা সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তিনি পরিষ্কার দেখিয়েছেন, যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া মাঝারী কৃষক প্রকৃত মুক্তি পেতে পারে না।

মাঝারি কৃষকের যতই ধনী স্তরে ওঠার ইচ্ছা থাক না কেন, তাদের মধ্যে দু'একজনই বড় হতে পারে বাকি পুঁজিবাদী শোষণের চাপে নিচে নেমে যেতে বাধ্য। তবু মনের দিক দিয়ে তারা ধনী হবার ইচ্ছা পোষণ করে। তাই, সামন্তবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবে তারা ঘনিষ্ঠভাবে থাকলেও পরবর্তী ধাপে দোদুল্যমানতা দেখাবে। সেই জন্যই গরিবদের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হবে। কিন্তু মাঝারি কৃষকদের প্রতি সব সময়ে বোঝাবার মনোভাব রাখতে হবে। রুশ বিপ্লবের পর তিনি এদের সঙ্গে মৈত্রী গঠনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কমরেড স্তালিন এই শিক্ষাকেই পরবর্তীকালে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং স্বেচ্ছামূলক যৌথ চাষের মধ্য দিয়ে মাঝারি কৃষকদের বুঝিয়ে ও তাদের সঙ্গে ঐক্য সুদৃঢ় করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্তব্যকে সফলতার পথে নিয়ে গেছেন।

কমরেড লেনিন-এর যে তৃতীয় শিক্ষাটি আমাদের এখন বিশেষভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন তা হোল, কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ করা। বিপ্লবের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রশ্ন সম্বন্ধে সচেতন না হলে কৃষক মুক্তি অর্জন করতে পারবে না। তার আন্দোলন নিছক আশু অর্থনৈতিক দাবির গণ্ডীর মধ্যে থেকে যাবে এবং যদি কখনও কৃষক অসহনীয় অবস্থা সহ্য না করতে পেরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাহলে তা হবে মূলত: স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ—যা রাজনৈতিক লক্ষ্য বিহীন হয়ে শাসকশ্রেণীর রাষ্ট্র শক্তির আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। যে শোষণ ব্যবস্থা কৃষকদের নিষ্পেষিত করছে, সেই ব্যবস্থার ধারক শ্রেণী বা শ্রেণীগুলির হাতে যদি রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকে, তাহলে কৃষক তার মুক্তি অর্জন বা রক্ষা কোনটাই করতে পারে না। তাই রাজনৈতিক কর্তব্যের সংগে যুক্ত করেই কৃষকদের সংগ্রাম পরিচালিত করতে হবে, তাদের চেতনাসম্পন্ন করে তুলতে হবে। এই রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন করতে পারলে তবেই কৃষকেরা শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগী দুর্বার বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হতে পারবে এবং তবেই তারা প্রয়োজনীয় শ্রেণী-সমাবেশ গড়ে তুলতে পারবে; কমরেড লেনিনের সমস্ত পরামর্শ ও সমস্ত লেখার মধ্যে এই রাজনৈতিক চেতনার কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

১৯০১ সালেই তিনি বলেছেন, যে কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন করবার মতো অসংখ্য দাবি আছে; স্থানীয় নির্দিষ্ট ও সবচেয়ে জরুরী দাবিগুলির ভিত্তিতে এই আন্দোলন করতে হবে। (হঠকারীরা লক্ষ্য করবেন?) "কিন্তু আন্দোলনকে এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, কৃষকদের দৃষ্টি ভংগিকে প্রসারিত করার দিকে, তাদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করার দিকে একে নিয়ে যেতে হবে।" ১৯০৫ সালে এই কথাটিকেই তিনি আরো জোরের সংগে

বলেছেন তাঁর "সর্বহারা ও কৃষক" প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, "মহান রুশ বিপ্লবের গতি ও পরিণতি খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করছে কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির উপর।" ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পশ্চিম বংগে কৃষক সংগ্রাম যে স্তরে পেঁৗছেছে, তাতে কমরেড লেনিনের এই শিক্ষা অপরিসীম গুরুত্ব অর্জন করেছে।

কমরেড লেনিনের এই সব শিক্ষাকে মনে রেখে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় ভারতের বাস্তব অবস্থায় আমাদের পার্টি অর্থাৎ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের কর্মসূচী স্থির করেছে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির শোষণের অবসানের জন্য জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করা এবং জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া কৃষকের মুক্তি হতে পারে না, তার জমির অভাব, দুঃস্থতা ও দারিদ্র্যের সমস্যার মৌলিক সমাধান হতে পারে না। এই বিপ্লবের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে। গ্রামাঞ্চলের বিশেষ অবস্থা বিশ্লেষণ করে পার্টি ঘোষণা করেছে, যে কৃষি শ্রমিকসহ গরিব কৃষকদের উপর ভিত্তি করে মাঝারি কৃষকদের সংগে দৃঢ় মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে এবং ধনী কৃষক ও গ্রামের গণতান্ত্রিক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের দেশে কৃষকের সংখ্যাই বেশী, তাই কৃষকদের বৈপ্লবিক শক্তির বিকাশ ও তাদের রাজনৈতিক সচেতনার উপর ভারতের বিপ্লব বহুলাংশে নির্ভর করছে। ভারতের বর্তমান গভীর রাজনৈতিক সংকটের পরিস্থিতিতে এই কর্তব্য খুব জরুরী হয়ে উঠেছে। কৃষক আন্দোলনের দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে পার্টি "কৃষক ফ্রণ্টের কর্তব্য" শীর্ষক প্রস্তাবে পরিষ্কারভাবে বলেছে, যে গরিব কৃষকদের ভিত্তির উপর কৃষক আন্দোলনকে দাঁড় করাতে হবে। তাদের আন্দোলনের পুরোভাগে আনতে হবে ; এ বিষয়ে আমাদের যে দুর্বলতা রয়েছে তা কাটাতে হবে, এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে মাঝারি কৃষকদের সংগে দৃঢ় মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে এবং তাকে কেন্দ্র করে কৃষকদের ঐক্য সংগঠিত করতে হবে। মাঝারি কৃষকের ভিত্তিতে নয়, গরিব কৃষকের ভিত্তিতে সমগ্র কৃষক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পশ্চিমবংগে কৃষক আন্দোলনকে দ্রুত শক্তিশালী করার বিশেষ প্রচেষ্টা গত দু-তিন বছর ধরে চলেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার অনুকূল পরিস্থিতিতে গত এক বছরে কৃষক আন্দোলনের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে। ব্যাপ্তি ও গভীরতা উভয় দিক দিয়েই আক্ষরিক অর্থে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। সারা রাজ্যে প্রতি জেলায় লক্ষ লক্ষ গরিব কৃষক ও খেতমজুর নতুন চেতনায় জেগে উঠেছে এবং সংগ্রামের এক

জোয়ার সৃষ্টি করেছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কৃষক আন্দোলন তার পূর্ব ভিত্তি ছেড়ে মূলতঃ গ্রামের গরিবদের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছে। খাস ও বেনামী জমির সংগ্রাম, ১০ লক্ষাধিক বিঘা জমি উদ্ধার ও দখল, ধান কর্জ পাবার সংগ্রাম, মজুরির সংগ্রাম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গরিব কৃষকদের সংগ্রামী শক্তির ব্যাপক স্ফূরণ ঘটেছে, ভূমি সমস্যার মৌলিক সমাধানের প্রশ্নকে কৃষকদের সামনে বাস্তব প্রশ্ন হিসাবে উপস্থিত করেছে। এই আন্দোলনের পর্যালোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এই পরিস্থিতি আমাদের সামনে কতকগুলি প্রশ্ন নিয়ে এসেছে যার উত্তর কমরেড লেনিনের শিক্ষার আলোকেই স্থির করতে হবে।

আগের কৃষক আন্দোলনে কৃষকদের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল, কৃষক আন্দোলনের ভিত্তি পরিবর্তন অর্থাৎ গরিব কৃষকদের উপর ভিত্তি-স্থাপন -সেই পুরানো সম্পর্কের ভারসাম্যের পরিবর্তন করেছে। গরিব কৃষক জেগে উঠেছে। আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। এ এক লক্ষণীয় সাফল্য। কিন্তু এই সাফল্যের আনন্দে কৃষকদের বিভিন্ন স্তরের ভূমিকা ও সেই মতো তাদের সমাবেশ করার প্রশ্নকে ছোট করে দেখা চলবে না। গরিব কৃষকদের নিজেদের ঐক্যকে আরো সম্প্রসারিত করতে হবে, তাদের রাজনৈতিক চেতনায় সচেতন করতে হবে ; তা না হলে এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য তাদের সামনে তুলে না ধরলে বর্তমান কাঠামোর সীমাবদ্ধতার মধ্যে ভূমি সমস্যার মৌলিক সমাধানের অলীক আশা তাদের সংগ্রামকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে বাধা সৃষ্টি করবে। জমির সংগ্রামকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই সচেতনতার ভিত্তিতে মাঝারি কৃষকের মনে মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় করতে হবে এবং গ্রামের গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলার পথে এগিয়ে যেতে হবে। রাজনৈতিক চেতনা দিতে পারলে তবেই গরিবেরা এই ঐক্য স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হবে।

গত এক বছরে জমির সংগ্রাম যেমন গরিব কৃষকদের সংগ্রামী শক্তির বিকাশ ঘটিয়েছে, তেমনি জোতদারদের মধ্যে আতংক ও ধনীদের মধ্যে আড়ষ্ট-ভাব সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি যুক্তফ্রন্টের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তারই ফলে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সংকট দেখা দিয়েছে। বুর্জোয়া বা বুর্জোয়া-প্রভাবাধীন কোন কোন পার্টি গরিবদের জাগরণের মধ্যে "অরাজকতা" ও "অসভ্যতার' সন্ধান পেয়েছেন। কৃষকদের উদ্যোগকে থামিয়ে দেবার জন্য এঁরা আওয়াজ তুলেছেন, যে কৃষকদের সক্রিয় উদ্যোগ ও সংগ্রাম নয়, আইন করে অফিসারদের মাধ্যমে কৃষকদের মঙ্গল করা হোক। কমরেড

লেনিনের শিক্ষার আলোকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গরিব কৃষকদের সংগ্রামে অগ্রণী রয়েছে বলেই তাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রণ্টের কেউ কেউ আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করেছেন। এই সবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কমরেড লেনিনের লেখাতেই এর ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

১৯০২ সালের রাশিয়ার অবস্থার সঙ্গে বর্তমানে পশ্চিমবাংলার অবস্থার পার্থক্য আছে, তথাপি কমরেড লেনিনের তখনকার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ১৯০২ সালে পলতাভা, খারকভ ও অন্যান্য প্রদেশে কৃষকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। তারা জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, "তাঁদের গোলা ভেঙেছে, গোলার খাবার নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে, চাষীরা যে ফসল চাষ করেছিল অথচ জমিদাররা আত্মসাৎ করেছিল তা উপবাসী চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে এবং জমির নতুন বণ্টনের দাবী করেছে। কৃষকেরা সিদ্ধান্ত করেছিল এবং সঠিকভাবেই সিদ্ধান্ত করেছিল যে, বিনা সংগ্রামে না খেয়ে মরার চেয়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়াই করে মরা ভালো।...জারের সরকার তাদের সাধারণ দাঙ্গাকারী ও দস্যু বলে ঘোষণা করেছে। (যে ফসল চাষীরা তৈরী করেছে তা দস্যু জমিদারদের কাছ হতে নেওয়ার জন্য।) এবং তাদের শত্রু মনে করে তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়েছে কৃষকেরা পরাজিত হয়েছে।"

যুক্তফ্রণ্টের বিশেষ বিশেষ শরিক দল একটু ভেবে দেখবেন তাঁরা কৃষকদের লুণ্ঠনকারী অন্যায় জবর দখলকারী বা অরাজকতা সৃষ্টিকারী বলে নিজেদের কোথায় এনে দাঁড় করাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ভাববেন যে, এখানে যুক্তফ্রণ্ট সরকার ছিল বলেই কৃষকদের বিরুদ্ধে পুলিস ব্যবহৃত হতে পারে নি এবং তারই জন্য পুলিসকে নিষ্ক্রিয় করার ও দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। কৃষক আন্দোলনের কুৎসাকারীদের সমর্থন করে মুখে কমরেড লেনিনের নাম নিতে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের লজ্জা বোধ হয় না। যাঁরা কৃষকদের উদ্যোগকে বন্ধ করে উপর হতে শুধু আইন করে অফিসারদের দিয়ে কল্যাণ করার কথা বলেন, তাঁরা যেন কমরেড লেনিনের এই কথা মনে রাখেন যে, "কৃষকেরা জেনে রাখুন যে পুরানো কর্তৃপক্ষের দ্বারা কার্যকর হলে কোন ভূমিসংস্কারই কোন কাজে আসবে না।" গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা কমরেড লেনিনের এই কথারই সারবত্তা প্রমাণ করেছে।

১৯০২ সালে উপরোক্ত কৃষক বিদ্রোহ হতে যে শিক্ষা নেবার জন্য কমরেড লেনিন বলেছেন, তা পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী কৃষক কর্মীদের বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, কৃষক অভ্যুত্থান বিধ্বংস হয়েছিল, কারণ এটা ছিল আজও অজ্ঞ ও রাজনীতি গতভাবে অচেতন

জনগণের অভ্যুত্থান যে অভ্যুত্থানে পরিষ্কার ও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দাবী ছিল। অর্থাৎ, রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তের দাবী ছিল না। কৃষক অভ্যুত্থান বিধ্বস্ত হয়েছে। কারণ, এর জন্য কোন প্রস্তুতি করা হয় নি। কৃষক অভ্যুত্থান বিধ্বস্ত হয়েছে। কারণ, গ্রামের সর্বহারা সহরের সর্বহারাদের সঙ্গে তখনও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নি। এই হলো কৃষকদের প্রথম ব্যর্থতার তিনটি কারণ। এই কারণ বিশ্লেষণ করে কমরেড লেনিন বলেছেন, "সাফল্য অর্জন করতে হলে অভ্যুত্থানের সচেতন রাজনৈতিক লক্ষ্য থাকতে হবে, আগে হতে তার প্রস্তুতি করতে হবে, তাকে সমগ্র রাশিয়ায় ব্যাপ্তি লাভ করতে হবে এবং শহরের শ্রমিকদের সংগে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।" আবার একথা বলতে চাই যে, তখনকার রাশিয়ার অবস্থা ও আজকের ভারতের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে, তথাপি কমরেড লেনিনের এই শিক্ষা খুবই মূল্যবান।

পশ্চিমবংগের কৃষক আন্দোলন যে স্তরে পৌঁছেছে তাতে কৃষকদের রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন করা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে শুধুমাত্র জমি পাবার তাগিদ তাকে বেশী দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। শুধু তাই নয়, তাতে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। আরো কিছু বেনামী জমি নিশ্চয় উদ্ধার করা যাবে, আইনের সম্ভাব্য সংশোধন করে আরো কিছু এগোনো যাবে, কিন্তু তাতে জমি সমস্যার মূল সমাধান হবে না, হতে পারে না। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে পারলে তবেই জমিদারদের সমস্ত জমি ও যাদের পর্যাপ্ত অন্যান্য আয় আছে সেই অ-কৃষক ধনী জোতদারদের জমি বিতরণ করা সম্ভব হবে; তখনই অ-কৃষক ছোট মালিকদের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করে অ-কৃষকদের হাতে জমি না রাখার ব্যবস্থা হতে পারবে; তখনই অনেক জমিহীন ও গরিব কৃষকের অন্য জীবিকার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। এই চেতনায় কৃষকদের দ্রুত শিক্ষিত করা প্রয়োজন।

বিপ্লবের প্রস্তুতি বলতে শুধু সাংগঠনিক প্রস্তুতিই বোঝায় না, প্রয়োজনীয় শ্রেণী সমাবেশ ও গরিব কৃষকের ভিত্তিতে সম্ভাব্য ব্যাপকতম কৃষক ঐক্য গড়ে তোলাও তার অন্তর্ভুক্ত। কৃষক আন্দোলনকে ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া, এলাকাগুলির মধ্যে যোগ সূত্র গড়ে তোলা এবং শ্রমিক আন্দোলনের সংগে তার মিতালি গড়ে তোলার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। পশ্চিমবংগের কৃষক আন্দোলন বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করলেও তার অনেক ত্রুটি ও দুর্বলতা আছে। কমরেড লেনিনের শিক্ষার আলোকে থেকে সেগুলি দূর করতে হবে।

আমাদের দেশে কৃষকদের থেকে বিচ্ছিন্ন মুষ্টিমেয় হঠকারী আছে, যারা কৃষক আন্দোলনের অগ্রগতির বৈপ্লবিক তাৎপর্য বোঝে না। কৃষকদের জমির

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস ও বৈপ্লবিক শক্তির স্ফুরণ ঘটেছে এবং নিশ্চিতভাবেই ঘটেছে, এটা হঠকারীদের কাছে কিছুই নয়। তারা মনে করে যে কৃষক নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝুক বা না বুঝুক বাইরে থেকে বিপ্লবের স্লোগান দিতে পারলেই কৃষকেরা তাকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিপ্লব যেন অত্যন্ত সস্তা ও সহজ, যেন শাসকশ্রেণীর সমগ্র রাষ্ট্র শক্তির অস্তিত্ব নেই। এদের তথাকথিত সস্তা বিপ্লব বিচ্ছিন্ন লুটপাট ও গোপন হত্যার কাজে অধঃপতিত হতে বাধ্য এবং তাতে কৃষকদের বিপ্লবী শক্তির বিকাশকে অপরিণত অবস্থায় ধ্বংস করে দিতে ও কৃষকদের হতাশাগ্রস্ত করতেই সাহায্য করে। বাস্তব অভিজ্ঞতাই তা প্রমাণ করছে। বর্তমান জমির ব্যাপক আন্দোলনের তাৎপর্যকে নস্যাৎ করার জন্য তারা অন্যান্য শক্তির মধ্যে একটা যুক্তি দেখায় যে, জমির সংগ্রাম করলে জমি পেয়ে কৃষকরা অবিপ্লবী ও শান্ত হয়ে পড়বে। কমরেড লেনিনের একটা কথাতেই এর জবাব মিলবে। তিনি বলেছেন: "বর্তমান অবস্থায় কৃষকদের আন্দোলন নিঃসন্দেহে বিপ্লবী। কেউ কেউ বলেন, যে কৃষকরা জমি দখল করার পর তারা শান্ত হয়ে যাবে, হয় তো হতে পারে। কিন্তু কৃষকরা জমি দখল করলে স্বৈরাচারী সরকার তাদের শান্ত করবে না এবং এটাই হলো মূল কথা। একমাত্র বিপ্লবী সরকারই তাদের দখলকে অনুমোদন করতে পারে।"

পশ্চিমবংগে যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকায় কৃষকরা এগিয়ে যাবার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু ভুললে চলবে না, যে ভারতে পুঁজিপতি জমিদারদের রাষ্ট্র রয়েছে, যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ এবং তাকে ভাঙার চক্রান্ত হচ্ছে। তাই কৃষকের জমির সংগ্রাম তাকে শান্ত করবে না, তার বৈপ্লবিক শক্তিকে বিকশিত করে তুলবে। কমরেড লেনিনের শিক্ষায় একে পুষ্ট করে তুলতে হবে।

—গণশক্তি, কমরেড লেনিন শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৭০

১০ সংকট ও গণ-প্রতিরোধের পরিপ্রেক্ষিত

জমিদার-প‍ুঁজিপতি শাসিত কোন দেশে যখন ঘনীভূত অর্থনৈতিক সংকট গভীরতর হতে থাকে, যখন প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নষ্ট হয়ে যায়, যখন শ্রমিক, কৃষক জনসাধারণের আন্দোলন গত চেতনা নিছক অর্থনৈতিক দাবির গণ্ডি ছাড়িয়ে রাষ্ট্র শক্তির প্রশ্ন নিয়েও আলোড়িত হতে থাকে, এবং যখন সংকটের চাপে শাসকশ্রেণীর মধ্যে শাসন ব্যবস্থার কায়দা সম্বন্ধে বিতর্ক ও বিরোধ দেখা দেয়, তখনই সেই দেশ অনিবার্যভাবে এমন এক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়, যেখানে শাসকশ্রেণীর সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ও জনগণকে দাঁড়াতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির—মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাস করে এমন পার্টির অবশ্য করণীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, আত্মসন্তুষ্টি ও স্বতঃস্ফূর্ততার মনোভাব কাটিয়ে অতি দ্রুত শ্রমিক, গরীব কৃষক ও মেহনতী জনগণকে মনের দিক দিয়ে ও সংগঠনের দিক দিয়ে প্রস্তুত করে তোলা—অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর আক্রমণকে মোকাবিলা করার মতো রাজনৈতিক শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করা, ধাপে ধাপে তাদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, তাদের সংগ্রামী শক্তির স্ফূরণ ঘটানো এবং সংগ্রামের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সংগঠনকে গড়ে তোলা।

তার বদলে যদি জনগণকে শাসকশ্রেণীর কোন অংশের লেজুড়ে পরিণত করার এবং তার উপরে নির্ভরশীল করে তোলার অপচেষ্টা করা হয়, তাহলে জনগণকে শাসক শ্রেণীর সশস্ত্র আক্রমণের অসহায় শিকারে পরিণত করা হয়। একেই বলে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী বিশ্বাসঘতকতা। অন্য দিকে যদি শ্রমিকশ্রেণী, মেহনতী কৃষক ও জনগণের সংগঠন এবং চেতনার স্তর না বুঝে তাদের সংগ্রামকে ধাপে ধাপে উন্নীত করার কষ্টকর পন্থার বদলে সংকট জর্জরিত সমাজের আশাহত মধ্যবিত্ত সমাজের অস্থির চিত্ততার উপর নির্ভর করে সস্তায় হঠাৎ কিছু করে ফেলার মত পাগলামী ঘাড়ে চেপে বসে, তাহলে বিপ্লবী শক্তির বিকাশকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। একেই বলে বামপন্থী হঠকারিতা। গভীরতর সংকটের মাঝে শাসকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম যতই বাড়তে থাকে, ততই ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে এই দুই বিচ্যুতি নগ্ন ও বিভৎস রূপ গ্রহণ করে। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি বুঝতে হলে, এই কথাগুলি মনে রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্তমানে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বৃহৎ ধনিক-গোষ্ঠীর পরিচালিত জমিদার-পুঁজিপতি শাসনের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে, এখানে অর্থনৈতিক সংকট যেভাবে গভীরতর হচ্ছে, তার কারণ ও চরিত্র বিশ্লেষণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখানে শুধু মনে রাখা দরকার যে, এই অর্থনৈতিক সংকটের একটা বিশেষ রূপ হলো দেশে ধনবৈষম্য দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, বেশীর ভাগ জনগণের দুঃসহ বোঝা বাড়ছে, বেকার সমস্যা তীব্র হচ্ছে, গ্রামের গরীবদের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, এবং এই সবের ফলে ব্যাপক জনগণের অসন্তোষ ও আন্দোলন বাড়ছে। এক দিকে অর্থনৈতিক সংকটের চাপ, অন্য দিকে ব্যাপক জনগণের বিক্ষোভ ও আন্দোলন—এই উভয়ের আঘাতে দেশে গভীর সংকট দেখা দিয়েছে। শুধু দেখা দিয়েছে বললে ভুল হবে, এই সংকট দিন দিন গভীরতর হচ্ছে। এই সংকট ও তার গভীরতার তাৎপর্য ভালভাবে বোঝা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ বহু জাতি-গোষ্ঠী অধ্যুষিত একটা বিরাট দেশ। কোন দেশেই গণ-সংগ্রামের বিকাশ সর্বত্র সমান হয় না। ভারতের মত বিরাট দেশে এটাই স্বাভাবিক যে, এখানে তার বিকাশ অসম হবে। ভারতে যে সংকট দেখা দিয়েছে তার তীব্রতাও বিভিন্ন রাজ্যে অসম হতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গে এই সংকট সবচেয়ে কেন্দ্রীভূত আকারে দেখা দিয়েছে। এখানে শ্রেনী সংগ্রাম সবচেয়ে তীব্র, জনগণের সংগ্রাম সবচেয়ে উচ্চ স্তরে উঠেছে; এখানে শ্রমিক, গরীব কৃষক, মেহনতী জনসাধারণ, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি সমস্ত অংশের জনগণই সংগ্রামের মধ্যে সামিল হয়েছে; অর্থনৈতিক দাবির সঙ্গে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবির সংগ্রাম এখানে সবচেয়ে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন সুবিধাবাদী পার্টির বদলে জনগণের গণ-সংগ্রাম এখানে বিভিন্ন অংশের সংগঠক হিসাবে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি দিন দিন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সেই জন্য এখানে শাসকশ্রেণীর আক্রমণও সবচেয়ে নগ্ন ও তীব্র।

সঠিক মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে মূলতঃ সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেই এখানে গত তিন বছরে, বিশেষতঃ গত এক বছরে গণ-সংগ্রাম দ্রুত বেড়েছে ও উচ্চ স্তরে উঠেছে। সেই জন্যই শাসকশ্রেণী এত ক্ষিপ্ত হয়েছে এবং তাদের আক্রমণকে তীব্রতর করেছে। রাজ্য পুলিসের ক্ষমতার উপর পুরো ভরসা করতে না পেরে শাসকশ্রেণী এখানে ক্রমশঃ বেশী করে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিসকে বল্গাহীন অত্যাচারের জন্য ব্যবহার করছে। ১৪৪ ধারার প্রয়োগ, গ্রেপ্তার, জামিন, মামলা প্রভৃতি সম্বন্ধে এতদিনের চলতি ধারণা বাতিল করে এখানে স্বৈরাচার আরো নগ্ন রূপ নিচ্ছে। যে বুর্জোয়া, সংসদীয় গণতন্ত্র ধনিক

শ্রেণীর শ্রেণী শাসনের সবচেয়ে "বাঞ্ছনীয়" পন্থা—শাসকশ্রেণী যে ভোটের শাসনের গুণগান সব সময় করে থাকে, সেই সংসদীয় গণতন্ত্রই পশ্চিমবংগে শাসকশ্রেণীর কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। অবশ্য শাসকশ্রেণী এখনও নির্বাচনকে পুরো বাতিল করে নাই। কিন্তু, নির্বাচনে জনগণকে ভয় করছে; তাই জনবিরোধী রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ খেয়াল-খুশিমত বাড়িয়ে দিয়ে নির্বাচনের আগে পশু শক্তির জোরে জনগণকে পিটিয়ে তারা শায়েস্তা করতে চাইছে এবং তা না পারা পর্যন্ত নির্বাচন না করার জন্য সদম্ভে ঘোষণা করেছে। এইভাবে দেখলেই যাদবপুর, বিজুড়, দুর্গাপুর, সরকারী কর্মচারী ধর্মঘট, ৩১শে আগস্ট শহীদ দিবসের গণ-অভিযান প্রভৃতি বিষয়ে শাসক শ্রেণীর নগ্ন আক্রমণকে বোঝা যাবে।

যে সৈন্যবাহিনীকে বহিরাক্রমণ হতে দেশ রক্ষার বাহিনী বলে প্রচার করা হয়, কিন্তু আসলে তা হলো শ্রেণী শোষণ বজায় রাখার জন্য শাসকশ্রেণীর শেষ হাতিয়ার, সেই সৈন্যবাহিনীকেও এখন কথায় কথায় জনগণের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আন্দোলনকে দমন করার জন্য, সংগ্রামী জনগণের মনে ভীতি সৃষ্টি করার জন্য পথে নামানো হচ্ছে। বুর্জোয়া সংবিধান অনুযায়ীও অভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের ও তার পুলিসবাহিনীর। তার বদলে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিস ও মিলিটারির ব্যবহার নিঃসন্দেহে সংকটের নূতন স্তরের সূচনা করছে। বুঝতে হবে যে সারা ভারতে গভীরতর রাজনৈতিক সংকটের পটভূমিকায় পশ্চিমবংগে প্রতিক্রিয়ার তীব্রতর আক্রমণ চলছে। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবংগে বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ, জনগণের স্বার্থে কর্মনিয়ত মার্কসবাদী কর্মীদের সামনে একটি পথই খোলা আছে, তা হলো—পশ্চাদপসরণ বা আত্মসমর্পণ নয়, আবার হঠকারিতাও নয়, শাসক-শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী, গরীব কৃষকসহ সমস্ত মেহনতী কৃষক, মেহনতী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের প্রতিরোধ সংগ্রামকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। জনগণ যাতে শাসক-শ্রেণীর আক্রমণের অসহায় শিকারে পরিণত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এরই উপর নির্ভর করছে, দেশের বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য সংগ্রামের ভবিষ্যৎ। ইতিহাস পশ্চিমবংগে সংগ্রামী জনগণের এবং তাদের সংগঠক ও নেতা হিসাবে মার্কসবাদী কর্মীদের উপর এক গুরু দায়িত্ব অর্পন করেছে। এই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতার উপর অনেকটা নির্ভর করছে—ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস কোন্ পথে যাবে।

সংকটের তাৎপর্য্য

এই দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে হলে, সংকট ও তার বর্তমান স্তরের তাৎপর্য বোঝা প্রয়োজন। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে মূল শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখা ও শোষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করাই হলো রাষ্ট্র শক্তির অর্থাৎ রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান কাজ। শোষক ও শাসকশ্রেণীগুলি সব সময় চেষ্টা করে, রাষ্ট্রের এই শ্রেণী-চরিত্র ঢেকে রাখার জন্য, যাতে শোষিত শ্রেণীগুলি শোষণে জর্জরিত হয়ে অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার আন্দোলন করলেও শাসন ব্যবস্থার উপর আঘাত হানতে উদ্যত না হয় অর্থাৎ যাতে শাসন ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বজায় থাকে। শাসন ব্যবস্থা অক্ষত থাকলে শোষণ ব্যবস্থা নিরাপদ থাকে। এই সংকটের সহজ অর্থ হলো শাসন ব্যবস্থার এই স্থায়িত্ব নষ্ট হয়ে গেছে এবং অস্থায়িত্ব দেখা দিয়েছে। ভারতে রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র হলো বৃহৎ বুর্জোয়া পরিচালিত জমিদার-পুঁজিপতি শ্রেণীর রাষ্ট্র। কিন্তু এই শাসন ব্যবস্থা কংগ্রেস পার্টির মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। কংগ্রেস শাসনে জনজীবনে সংকট বাড়লেও এবং জনসাধারণ নিজেদের দাবি দাওয়ার জন্য আন্দোলন গড়ে তুললেও ১৯৬৭ সালের আগে পর্যন্ত শাসকশ্রেণী ও শোসিত জনগণ উভয়েই মনে করেছে, যে কংগ্রেসের শাসন ব্যবস্থাই থাকবে। তাই শাসকশ্রেণী নিশ্চিন্ত ছিল।

কিন্তু ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে দেখা গেল যে, শুধু পশ্চিমবংগ ও কেরালায় নয়, ভারতের অন্য অনেকগুলি রাজ্যে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল যে, জনসাধারণ আর শুধু আর্থিক দাবি দাওয়ার কথাই ভাবছে না, শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাবোধও তাদের মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছে। শুধু ভাবা নয়, তার জন্য তারা সচেষ্ট হয়েছে। ভারতের এই পরিস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ নূতনত্ব দেখা দিল এবং তা হলো জনগণের মধ্যে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন-কামনা এবং তার জন্য প্রচেষ্টা। এই হলো বর্তমান সংকটের একটা দিক। এর ইতিবাচক তাৎপর্য অপরিসীম, কারণ জনগণের এই পরিবর্তন-কামনা ও প্রচেষ্টাই ধাপে ধাপে দেশকে বিপ্লবী সংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, যদি মার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক কর্মীরা ঠিক মতো তাকে পরিচালিত করতে পারে। একবার যখন জনগণ শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনকে প্রয়োজন ও সম্ভব বলে মনে করেছে, তখন জনগণের সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা সঠিক পথেরও সন্ধান পাবে। এই কাজে তাদের সাহায্য করতে হলে পরিস্থিতির মধ্যে দুর্বলতার নেতিবাচক দিকটিও দেখা প্রয়োজন।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অসম বিকাশের জন্য জনগণের এই

পরিবর্তন কামনা ও প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন রাজ্যে রূপ নিয়েছে। পশ্চিমবংগে ও কেরালায় জনসাধারণ কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে সঠিকভাবে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে পুরোভাগে রেখে গণতান্ত্রিক শক্তিকে ও গণ-সংগ্রামকে পুষ্ট করেছে, অন্যত্র প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক বা সুবিধাবাদী পার্টিগুলি এর সুযোগ নিয়েছে। এর অন্যতম কারণ হলো, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিকল্প নেতৃত্বদানে ব্যর্থতা। ভারতে আগের ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির সংশোধনবাদী নীতির প্রভাবে যেখানেই দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নাম করে শাসক পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে দ্বিধা করেছে, এমনকি কংগ্রেসকে সমর্থনের কথা বলেছে, সেখানেই জনগণ প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদীদের বুকনিবাজির খপ্পরে বেশী পড়েছে। এই দুর্বলতা ছাড়াও জনগণের চেতনার অন্য একটা সীমাবদ্ধতার দিকও আছে। জনসাধারণ এখনও পর্যন্ত মূলত: নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা ভেবেছে ও তার জন্য প্রস্তুত হয়েছে বা হচ্ছে।

পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাসের শিক্ষা হতে মার্কসবাদী কর্মীরা বোঝে যে, জনগণের কঠোর কঠিন বৈপ্লবিক সংগ্রাম ছাড়া, সংগঠিত শক্তির দ্বারা পুরানো রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ভাংগা ছাড়া সত্যকার মৌলিক পরিবর্তন আনা যায় না। নির্বাচনের মাধ্যমে সমাজের মৌলিক পরিবর্তন করা যায় না। শাসক-শ্রেণীর হাতে সশস্ত্র শক্তি আছে বলেই তা সম্ভব নয়। এই সশস্ত্র বাহিনীই জনগণের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। নির্বাচনের মাধ্যমে শুধু জনগণের সংগ্রামী শক্তিকে বাড়ানো যায়। মার্কসবাদী কর্মীরা এ সব কথা বুঝলেও শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ শুধু মার্কসবাদের বই পড়ে বা নেতাদের বক্তৃতা শুনে এসব কথা বোঝে না। তারা প্রধানত: বোঝে নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। তাই মার্কসবাদী কর্মীদের কাজ হলো জনগণের অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে তাদের রাজনৈতিক চেতনাকে উন্নত করা। জনগণের চেতনার এই দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার দিক ভুলে না গিয়েও যা প্রধানত: লক্ষ্য করতে হবে তা হলো এই যে, জনগণ শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইছে ও তার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টাও করছে। এই হলো সংকটের একটা দিক।

সংকটের আর একটা দিক—যা হলো তার গভীরতার প্রতিফলন—তা প্রকাশ পেল ১৯৬৯ সালে। তা হলো শাসকশ্রেণীর মধ্যে বিরোধ এবং তারফলে চারিদিকে শাসক পার্টির মধ্যে ভাংগন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস অনেক রাজ্যে পরাজিত হলেও তাদের নেতারা একে হয়ত মৃত্যুর নিশ্চিত পরোয়ানা বলে মনে করে নি। তারা হয়ত ভেবেছিল যে,

রাষ্ট্রের আসল ক্ষমতা যেখানে কেন্দ্রীভূত সেই কেন্দ্রে তাদের ক্ষমতা অক্ষত আছে ও থাকবে এবং একে কাজে লাগিয়ে তারা ইতিহাসের গতিকে ঘুরিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনগুলি তাদের সে আশা ভেঙ্গে দিল। তাদের পক্ষে সবচেয়ে বিপদের কথা হলো এই যে, পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা অত্যন্ত বেড়ে গেল এবং এমন এক যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলো যা এই পার্টির নেতৃত্বে গণ-সংগ্রামের এক শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হলো। ১৯৬৭-৬৮ সাল ভারতের ও বিভিন্ন রাজ্যের জনগণের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার সময় ছিল। শাসক-শ্রেণী ও জনগণ উভয়েই বিভিন্ন পার্টিকে কাজের মধ্যে চিনতে শিখেছে।

বিহার, উত্তর প্রদেশে, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলির মধ্যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না। তাই এই সব স্থানে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি, এস. এস. পি. প্রভৃতি পার্টিগুলির কংগ্রেস-বিরোধী বাম-পন্থী ছাপ থাকলেও এদের সুবিধাবাদী চরিত্রের জন্য এই সরকারগুলি কংগ্রেস সরকারের মতো সেখানে জমিদার-পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রমিকদের সংগ্রামকে সামান্য পরিমাণেও অগ্রসর হতে দেয় নাই। তাই মধ্যবর্তী নির্বাচনে এখানে গণতান্ত্রিক শক্তি বাড়তে পারে নাই, কিন্তু যে কংগ্রেস সম্বন্ধে জনগণ একবার আস্থা হারিয়েছে তার প্রতিও তাদের আস্থা ফেরে নাই। এখানে মূলতঃ সুবিধাবাদী জোট—পাল্টা জোটের খেলা চলেছে। অবশ্য শাসকশ্রেণীর উদ্বেগ এই জন্য যে, এখানেও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা চলছে। উড়িষ্যা ও তামিলনাড়ুতে কংগ্রেস-বিরোধী সরকার হলেও কায়েমী স্বার্থের কাছে তা কংগ্রেস হতে ভিন্ন চরিত্রের বলে মনে হবার কারণ ঘটে নাই। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ১৯৬৭ সালেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান শক্তি থাকায় শ্রমিক, গরীব কৃষক ও মেহনতী জনগণের মধ্যে সংগ্রামী শক্তির স্পন্দন সৃষ্টি হতে পেরেছিল। তাই মধ্যবর্তী নির্বাচনে (১৯৬৯) এখানে কংগ্রেস শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো, খোলাখুলি প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিগুলি জনমনে কোন দাগ কাটতে পারল না এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি অত্যন্ত বেড়ে গেল। ফলে নূতন যুক্তফ্রন্ট সরকারের সংগ্রামী চরিত্র আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

১৯৬৭ সালে যা জনগণের মনে সংগ্রামের স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল তার ফলে ১৯৬৯ সালে গণ-সংগ্রামের বিপুল জোয়ার সৃষ্টি করল। সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরের জন্য যে বিপুল সংগ্রামী গণশক্তি প্রয়োজন, তা দ্রুত গতিতে বাড়তে লাগল। অন্যান্য রাজ্যের জনগণের উপর এর প্রভাব পড়তে

বা বাড়তে লাগল। এক দিকে সারা ভারতে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অন্য দিকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কেরল ও পশ্চিমবংগে সংগ্রামী গণশক্তির অগ্রগতি যেমন ব্যাপক জনগণের মধ্যে নূতন পথের সন্ধান দিতে লাগল, তেমনি ভারতের শাসকশ্রেণীর মনে সত্যিকার আতংক সৃষ্টি করল এবং শাসনের কায়দা সম্বন্ধে তাদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করল। কংগ্রেসের মারফতই এতদিন শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা সুরক্ষিত ছিল। এখন সে সম্বন্ধে আর নিশ্চিত থাকা সম্ভব নয়। কংগ্রেসের মধ্যে আগেও ঝগড়া ছিল, কিন্তু তা ছিল ক্ষমতা ও ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এখন তার সংগে শাসনের কায়দা সম্বন্ধে বিতর্ক জড়িত হয়ে পড়ল। এই বিতর্ক হতেই শাসক পার্টির মধ্যে বিরোধ ও শেষ পর্যন্ত ভাংগন। যে পার্টির একচ্ছত্র ক্ষমতা ছিল জমিদার-পুঁজিপতি শাসনের ভিত্তি, সেই পার্টির ভাংগন নিঃসন্দেহে শাসকশ্রেণীর সংকটের সূচনা করে। এতে সংগ্রামী জনগণের উৎসাহিত হবার বিষয় আছে ; আত্মবিশ্বাস নিয়ে দ্রুত বিপ্লবী শক্তিকে বাড়াতে হবে।

কিন্তু এই বিরোধ ও ভাংগনের মধ্যে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব খোঁজা এবং শাসকশ্রেণীর একাংশের পিছনে ছোটা বা জনগণকে সমবেত করার চেষ্টা সর্বনাশ ডেকে আনবে অথচ দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি তাই করছে। ব্যক্তি বিশেষকে দেখে এই ভাংগনের চরিত্র ব্যাখ্যা করা খুবই মারাত্মক। কংগ্রেসের মধ্যে "প্রগতিশীল" নেতা মনে করে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা যে কামরাজের জন্ম দিবস পালন করেছে, সেই কামরাজ আজ সিন্ডিকেটের নেতা। যে ওয়াই. ভি. চাবন ও তাঁর মহারাষ্ট্রের কংগ্রেসী সভ্যরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভি ভি গিরির বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁরাই নাকি "প্রগতিশীল" হয়ে উঠেছেন। আসলে এই বিরোধ প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নয়। শাসক পার্টির মধ্যে এই ভাংগনের তাৎপর্য হলো এই যে, প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী তাদের শাসন প্রচলিত শাসন কায়দা সম্বন্ধে আর নিশ্চিত নয়। ক্রমবর্ধমান গণ-সংগ্রামের মোকাবিলা কী ভাবে করা যাবে, তাই নিয়ে বিতর্ক ও ভাংগন। একাংশ, যাদের সিন্ডিকেট পন্থী বলা হয়, তারা বলতে চেয়েছে যে, জনগণের সংগ্রামকে আর বাড়াবার পক্ষে গণতান্ত্রিক সুযোগ দিলে পরে তাকে ধ্বংস করা কষ্টকর হবে ; তাই এখনই গণ-সংগ্রামের বিরুদ্ধে সোজাসুজি রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তিকে প্রয়োগ করতে হবে, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে গণতান্ত্রিক অধিকার হতে বঞ্চিত করতে হবে, বে-আইনী করতে হবে, এবং জনসংঘ, স্বতন্ত্র প্রভৃতি চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক পার্টিগুলির সংগে কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

অন্য অংশ যাদের ইন্দিরা-পন্থী বলা হয় এবং যাদের হাতে বর্তমানে শাসন ক্ষমতা রয়েছে—তারা বলতে চেয়েছে যে, সিন্ডিকেটের প্রস্তাবিত কৌশল ক্ষতিকর হবে ; জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টিগুলির সংগে খোলাখুলি মিলিত হলে বামপন্থী বলে পরিচিত বিভিন্ন কংগ্রেস-বিরোধী পার্টিগুলির সংগে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ থাকবে, তার ফলে গণ-সংগ্রাম বেড়ে যাবে ; অথচ গত দুই বছরের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, বর্তমান শাসন ব্যবস্থার পক্ষে এই সব পার্টিগুলি ক্ষতিকারক নয় ; আসলে বিপজ্জনক হলো মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। তাই, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে এই সব পার্টি হতে আলাদা করার এবং এই সব পার্টিদের শাসক শ্রেণীর দিকে টেনে নেবার কৌশল নিতে হবে ; তা করতে পারলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে জনগণের মধ্যেও দুর্বল করা যাবে ও গণ-সংগ্রামকে বিধ্বস্ত করা যাবে। আর এই জন্যই সংসদীয় গণতন্ত্রের মুখোশ বজায় রাখতে হবে এবং ব্যাংক জাতীয়করণের মতো কিছু লোক দেখানো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিতে হবে।

শাসক পার্টির মধ্যে এই বিরোধ ও তা হতে উদ্ভূত ভাঙন কোন নীতিগত প্রশ্ন নিয়ে নয় ; উভয় পক্ষই বর্তমান শ্রেণীর শাসন বজায় রাখতে চায়। এ বিরোধ হলো ক্রমবর্ধমান গণ-সংগ্রাকে প্রতিহত করার কায়দা অর্থাৎ শাসনের কায়দা সম্বন্ধে কৌশল গত বিরোধ। কিন্তু কৌশল গত বিরোধ হলেও শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টি ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি এ সম্বন্ধে নিস্পৃহ থাকতে পারে না। যে প্রশ্ন নিয়ে শাসক পার্টি ভেংগে যায় তা নিশ্চয়ই উপেক্ষার বিষয় হতে পারে না। সিন্ডিকেট-পন্থীদের বক্তব্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হলে তা হবে এই মুহূর্তে জনগণের পক্ষে বেশী বিপজ্জনক। কিন্তু ইন্দিরা-পন্থীদের কৌশলও জনগণের সহায়ক নয়, বরং অত্যন্ত ক্ষতিকারক। সেই জন্যই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গত জানুয়ারী মাসে সঠিক ভাবেই সিদ্ধান্ত করেছিল, যে সিণ্ডিকেট-পন্থী কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র প্রভৃতি জোটের বিরুদ্ধে আক্রমণ যেমন চালাতে হবে, তেমনি ইন্দিরা-পন্থীদের সম্বন্ধে কোন মোহ বিস্তার করা বা এদের পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রামকে কোন মতে দুর্বল করা চলবে না। বরং অতি দ্রুত শ্রমিক, গরীব কৃষক ও গণতান্ত্রিক জনগণকে পৃথক শক্তি হিসাবে সংকটের মোকাবিলা করার জন্য সংগঠিত করে তুলতে হবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এখনে করছি না। এখানে শুধু মনে রাখতে হবে যে, শাসক পার্টির বিরোধ ও ভাংগন দেশে সংকটের গভীরতা * এবং নূতন ধাপ সূচিত করেছে। জনগণের রাজনৈতিক পরিবর্তন কামনা ও শাসক পার্টির ভাংগন-বর্তমান সংকটের এই হল সামগ্রিক রূপ।

বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা

এই গভীর সংকট বিশেষভাবে শাসক পার্টির মধ্যে ভাংগন সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে এক জরুরী ভাব এনে দিয়েছে। মার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক কর্মীদের গতানুগতিকভাবে চলার অভ্যাস ত্যাগ করে, অতি দ্রুত জনগনের সংগ্রামী শক্তি ও সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। চরম প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে ইন্দিরা-পন্থীদের "প্রগতিশীল" আখ্যা দিয়ে শাসকশ্রেণীর একাংশের পেছনে দৌড়ালে এবং জনগণকে তাদের সংগে তথাকথিত প্রগতিশীল ঐক্যের উপর নির্ভরশীল করে তুললে সর্বনাশ হবে। তাতে জনগণকে প্রতিক্রিয়ার হঠাৎ আক্রমণের অসহায় শিকারে পরিণত করা হবে। বরং যেহেতু রাজনৈতিক সংকট গভীর হয়ে উঠেছে, সেই জন্য অতিদ্রুত জনগণের সংগ্রামী শক্তির স্ফুরণ ঘটাতে হবে, শাসকশ্রেণীর যে কোন আক্রমণকে মোকাবিলা করার মতো তাদের প্রস্তুত করে গড়ে তুলতে হবে। তার কারণ এতদিন শাসক-গোষ্ঠী যে নীতি নিয়ে চলেছে, তার কোন মৌলিক পরিবর্তন হচ্ছে না এবং হতে পারে না।

সেই জনাই আগামী দিনে অর্থনৈতিক সংকট আরো দ্রুত বাড়বে বই কমবে না। ফলে জনগণের অসন্তোষ, বিক্ষোভ, সংগ্রাম যতই তীব্রতর হোক না কেন, শাসকশ্রেণী গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তি নিয়ে তারা কি চুপ করে বসে থাকবে ? তাই আজকে শাসনের কায়দা নিয়ে শাসকদের মধ্যে যতই মত পার্থক্য থাক না কেন, রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের যা-ই স্থান থাক না কেন, জনগণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের আক্রমণ তীব্রতর হতে বাধ্য। তাই, জনগণকে যে কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত করার বদলে শাসকশ্রেণীর কোন অংশের উপর নির্ভরশীল করে তুললে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকেই পুষ্ট করা হবে। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা ঠিক এই কাজই করেছে—শাসকশ্রেণীর সমস্ত চক্রান্ত নগ্নভাবে সমর্থন করেছে। দেশে দেশে এমনি করেই সংকটের মুখে সোস্যালিস্টরা ধনিক ও শাসকশ্রেণীর দালালি করছে।

অবশ্য এই সংকটজনক পরিস্থিতিকে বিপ্লবী পরিস্থিতি মনে করলে এবং ধাপে ধাপে জনগণের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার বদলে এখনই অর্ডার দিয়ে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখলে সমান সর্বনাশ করা হবে। তাতে বিপ্লবী শক্তিকে অংকুরেই নষ্ট বা ধ্বংস করে দেওয়া হবে। এই ভাবে শাসকশ্রেণীকে সাহায্য করা হবে। সমাজের ভাংগন ও ক্রমবর্ধমান সংকটের মুখে শাসকশ্রেণীর প্ররোচনার ফাঁদে পা দেওয়ার ঝোঁক অস্বাভাবিক নয়, বিশেষতঃ ভাবপ্রবণ মধ্যবিত্ত যুবকদের মধ্যে। কিন্তু ভাবাবেগ দিয়ে বিপ্লব হয় না। এই

প্রসঙ্গে পরিস্থিতি সম্বন্ধে কমরেড লেনিনের শিক্ষাকে মনে করা প্রয়োজন। পার্টি বা মুষ্টিমেয় কর্মী বিপ্লব করে না, তারা বিপ্লবের পথ দেখায়, কিন্তু বিপ্লব করে শ্রমিকশ্রেণী, মেহনতী কৃষক ও গণতান্ত্রিক জনগণ। কমরেড লেনিন বলেছেন যে, যখন জনগণ বর্তমান অবস্থা আর মানতে পারে না এবং যখন শাসকশ্রেণীও পুরণো কায়দায় শাসন চালাতে পারে না, তখন বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

তিনি আরো বলেছেন যে, শুধু শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ বর্তমান অবস্থা মানতে পারছে না, এটা হলেই হবে না,—যখন তাদের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তনের জন্য লড়বার ও মরবার মতো মনোভাব সৃষ্টি হবে, তখন বিপ্লব হতে পারে। তার কারণ, বিপ্লব হলো রাষ্ট্রের সমগ্র সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। বিপ্লব যে ছেলেখেলা নয় বা দেওয়ালে শ্লোগান লেখা বা বই পোড়ানো নয়, তা রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব ও বর্তমানের ভিয়েতনামের সংগ্রাম দেখলেই বোঝা যায়। কমরেড লেনিনের এই কথাগুলি মনে রাখলে বুঝতে সহজ হবে, যে আজকের ভারতের পরিস্থিতি এখনও বিপ্লবী পরিস্থিতি নয়, তাই হটকারিতার কোন স্থান নেই। অন্য দিকে এটা স্বাভাবিক অবস্থাও নয়, এটা সংকটজনক পরিস্থিতি, এর মধ্যে বিপ্লবী পরিস্থিতির দিকে যাবার প্রাথমিক লক্ষণও রয়েছে। জনগণ শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইছে। কিন্তু তার জন্য এখনই তাদের মধ্যে মরণপণ করার মতো অবস্থা ও সংগঠন তৈরী হয় নাই। তেমনি শাসকশ্রেণীর মধ্যে শাসনের কায়দা সম্বন্ধে বিরোধ দেখা দিয়েছে, কিন্তু এখনও মোটামুটি পুরনো কায়দা চলছে। অবশ্য পুলিশী অত্যাচার দ্রুত বাড়ছে, কিন্তু পুলিশী অত্যাচার ও ফ্যাসিস্ট জল্লাদ গিরি এক নয়। ক্রমবর্ধমান পুলিশী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনগণের সংগ্রাম উচ্চ স্তরে উঠবে।

তাই বুঝতে হবে যে সংকট এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না, এটা দ্রুত বাড়বে। যদি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি ও মার্কসবাদী কর্মীরা কোন রকমের আত্মসন্তুষ্টি না রেখে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা, সংগ্রামের ক্ষমতা ও সংগঠন গড়ে তুলতে পারে, তাহলে শাসকশ্রেণীর সমস্ত রকমের সম্ভাব্য আক্রমণকে প্রতিহত করে ও প্রতিরোধ করে জনগণ দেশকে বিপ্লবী পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বুঝতে হবে যে, দীর্ঘদিন ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টিতে সংশোধনবাদের প্রভাব থাকায় শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি তার কর্তব্য যথাযথ পালন করতে পারে নাই। তাই আজ মার্কসবাদী কর্মীদের দ্বিগুণ পদক্ষেপে এগিয়ে সেই পিছিয়ে পড়া ফাঁক পূরণ করতে হবে। তার বদলে যদি জনগণকে ধনিকশ্রেণীর লেজুড়ে পরিণত করার চেষ্টা হয়—যা

দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা করেছে। অথবা যদি জনগণকে হঠকারী কার্য-কৌশলে টানার চেষ্টা হয়—যা নকশালপন্থীরা চাইছে। তাহলে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিপদ ডেকে আনা হবে এবং সংকট গ্রস্ত শাসকশ্রেণীকেই সাহায্য করা হবে।

ইন্দোনেশিয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা এই প্রসংগে স্মরণ করা প্রয়োজন। ইন্দোনেশিয়ার কথা তোলায় কেউ যেন মনে না করেন যে ভারতে ঐরূপ বিপর্যয় প্রতিক্রিয়াশীলরা সৃষ্টি করতে পারে বা পারবে, যদিও কেউ কেউ তার জন্য আস্ফালন করছে। ইন্দোনেশিয়ার তখনকার অবস্থার সংগে ভারতের ও বিশেষ করে পশ্চিমবংগের বর্তমান অবস্থার পার্থক্য আছে। একটা বড় পার্থক্য হলো এই যে, এখানে জনগণ সক্রিয়ভাবে সংগ্রামের মধ্যে রয়েছে এবং এই সংগ্রামের ব্যাপকতা ও তীব্রতাও বাড়ছে। এখানে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের চেষ্টা জনগণের তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে বাধ্য। কিন্তু, ইন্দোনেশিয়ায় যখন প্রতিক্রিয়াশীলেরা আক্রমণ করেছে, তখন জনগণ এমনি সংগ্রামী অবস্থার মধ্যে ছিল না। তাই, ইন্দোনেশিয়ার পুনরাবৃত্তি এখানে সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এখানে প্রতিক্রিয়া আক্রমণের বিপদ নাই। তাই মার্কসবাদী কর্মীরা অবস্থা বুঝে ঠিকমত কাজ না করতে পারলে প্রতিক্রিয়ার হিংস্র আক্রমণের সামনে পিছু হটার কঠিন বিপদ সৃষ্টি হতে পারে। ১০ কোটি মানুষের দেশ ইন্দোনেশিয়ায় বিরাট শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি এবং শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব প্রভৃতি সংগঠন ছিল এবং সরকারের মধ্যে পার্টির প্রভাব ছিল।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ ধনিকশ্রেণীর নেতা হলেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলেন এবং তাঁর সংগে কমিউনিস্ট পার্টির যুক্তফ্রণ্ট ছিল। এই সব সত্বেও সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এতবড় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে ও এত নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালাতে পারল কী করে? ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির পার্টির ভুলত্রুটি আলোচনা করার ক্ষমতা ও দুঃসাহস আমার নাই। যে পার্টিকে এত বুকের রক্ত ঢালতে হয়েছে, সেই পার্টির নেতা ও কর্মীরা আমাদের শ্রদ্ধা দাবি করেন। তাঁরা যদি কিছু ভুল করে থাকেন তাহলেও তাঁরা জেনে শুনে করেন নাই। তাঁদের বিচার বিশ্লেষণে ভুল হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাঁরা পালিয়ে যান নাই, নিজেদের রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন এবং এখনও আত্ম-সমর্পণ না করে নতুন ভাবে জনগণকে সংঠিত করে যাচ্ছেন। তাদের অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষা নেবার জন্যই আমি এই প্রসংগের অবতারণা করেছি। ইন্দোনেশিয়ার সরকারের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে জনগণের সংগ্রামী শক্তিকে ঠিকমত উত্তরোত্তর বাড়িয়ে

তোলা যায় নাই। বরং সুকর্ণ ও তাঁর ধনিক নেতৃত্বের সংগে ঐক্যের উপর জনগণকে নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল বলে শুনেছি। সেখানে কৃষকদের মধ্যে ইঁদুর মারার অভিযান চালানো হয়েছে, কিন্তু সামন্ত-শোষণের প্রাধান্য সত্বেও জোতদার-মজুতদারদের বিরুদ্ধে জমির সংগ্রাম তেমনভাবে করা হয় নাই। আমি জানি না, পাছে সুকর্ণর ধনিক নেতৃত্ব চটে যায় (যেমন পশ্চিমবংগে অজয় মুখার্জিরা চটেছেন) সেই জন্যই এমনি করা হয়েছে কিনা।

ইন্দোনেশিয়ার সমাজ ব্যবস্থা হলো সামন্তবাদী-পুঁজিবাদী, তাই স্বাভাবিক নিয়মেই সেখানে জনজীবনে সংকট বেড়েছে। অথচ তার বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকের নিজস্ব শ্রেণী সংগ্রাম তেমন গতিবেগ পায় নাই। এই অবস্থায় ধনিকশ্রেণীর উপর নির্ভরতার ফলে জনগণের মনে সংগ্রামী দৃঢ়তা ও উদ্দীপনা তেমন দানা বেঁধে উঠতে পারে নাই। অন্য দিকে এই সংকটের জন্য মার্কিন গুপ্তচর বিভাগ ও প্রতিক্রিয়াশীলেরা জনগণের কিছু অংশকে বিভ্রান্ত করতে এবং ভাবপ্রবণ ছাত্র-যুবকদের একাংশকে কমিউনিস্ট-বিরোধী খুনী বাহিনীতে পরিণত করতে পেরেছিল। তারপর যখন প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ আসন্ন হয়ে উঠেছে, তখনও জনগণকে মরণপণ সংগ্রামের জন্য আহ্বান দেওয়া হয় নাই। নিজেদের শক্তিকে বড় ভেবে ও শত্রুর শক্তিকে ছোট মনে করে প্রতিক্রিয়ার মোকাবিলা করার জন্য প্রধানতঃ "প্রাসাদ অভ্যুত্থান" ও কিছু চক্রান্তকারীকে অপসারিত করার মত হঠকারী কৌশল নেওয়া হয়েছে। ফলে সাম্রাজ্যবাদের অনুচর প্রতিক্রিয়াশীলদের বীভৎস আক্রমণের মুখে জনগণ অসহায়ের মতো খালি মার খেয়েছে।

ভিয়েতনামে সাড়ে পাঁচ লাখ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সৈন্য থাকা সত্বেও জনগণের মুক্তি সংগ্রাম এগিয়ে গেছে, আর ইন্দোনেশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী গুপ্তচর বিভাগের চক্রান্ত থাকলেও প্রধানতঃ, অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার শক্তি এত বড় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারল: জমিদার-জোতদার-মজুতদার-পুঁজিপতি ও প্রতিক্রিয়াশীল অফিসারচক্র—যারা এতদিন মাথা নীচু করেছিল, তারা হঠাৎ আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল। "কামি" ও "কাপি" নামে যে দুটি ছাত্র ও যুব সংগঠনের নাম এতদিন শোনা যায় নাই, তারা কোথা হতে জল্লাদ-বাহিনীতে পরিণত হয়ে গেল। এই প্রসংগে ভারতবর্ষে কতকগুলি বিপজ্জনক লক্ষণের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। যত সংকট বাড়ছে, তত মার্কিন গুপ্তচর বিভাগের অনুপ্রবেশ সমাজের শিক্ষা জগতের ও রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, শিবসেনা, ছাত্র পরিষদ, আনন্দ মার্গ ও সেই সংগে তথাকথিত আট পার্টির ও নকশালপন্থীদের ঘৃণ্য কার্যকলাপও লক্ষ্য করা

প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের বড় শহরে ও গ্রামে জোতদার, মজুতদার ও কোটি-পতিদের ক্ষিপ্ত মনোভাবকেও ছোট করে দেখা ঠিক নয়।

ইন্দোনেশিয়ার এই তিক্ত অভিজ্ঞতা দেখার পরও ভারতে যারা ইন্দিরা গান্ধীর লেজুড় বৃত্তি করার উপদেশ দেয় বা অন্য দিকে বই পুড়িয়ে বিপ্লবের কথা বলে, তাদের কী বলা যেতে পারে? ডাঃ সুকর্ণ ধনিক নেতা হলেও অন্ততঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু ইন্দিরা-পন্থীরা তাও নয়। ইন্দোনেশিয়ার কমরেডরা ভুল করে থাকতে পারে, কিন্তু জেনেশুনে দালালি ও জনগণের দুশমনি করেন নাই। কিন্তু ওখানের শিক্ষার পরেও ভারতের দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা জেনেশুনে দালালি করছে—যা জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়। এরা প্রকাশ্যে পুলিশের সাহায্যে গুন্ডামি করে ধর্মঘট ভাংগার কাজেও নেমেছে। ইন্দোনেশিয়ায় প্রাসাদ বিপ্লবের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তার পরিণতি দেখার পরও ভারতের নকশালপন্থীরা সস্তায় বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে এবং পরিণতিতে সমাজ-বিরোধীদের সংগে মিলে মার্কসবাদী কর্মীদের খুন করে "বিপ্লবের কর্তব্য" সমাধা করছে। কমরেড লেনিন ঠিকই বলেছিলেন, যে সংশোধনবাদ ও হঠকারিতা ধনিকের স্বার্থে নিয়োজিত দুই যমজ ভাই।

ভারতের সংকট যখন ঘনীভূত হয়ে উঠছে, তখন ভিয়েতনাম ও ইন্দো-নেশিয়ার অভিজ্ঞতা এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে, মার্কসবাদী গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী কর্মীদের কোন আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব রাখা চলবে না। অতি দ্রুত ধাপে ধাপে জনগণের বিপ্লবী ক্ষমতাকে বিকশিত করে তুলতে হবে—শাসক-শ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে গড়ে তুলতে হবে। তাদের চেতনাকে অর্থনীতিবাদের গন্ডি কাটিয়ে রাজনৈতিক স্তরে তুলতে হবে। সংগে সংগে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের ও নকশালপন্থীদের দালালি নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে।

প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ

শাসক পার্টির মধ্যে ভাংগনের পরবর্তীকালের ঘটনাবলী মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিশ্লেষণের বাস্তবতা প্রমাণ করেছে। এই সময়ে সংকট আরো বেড়েছে এবং দ্রুতই বেড়েছে। শাসক-গোষ্ঠীর জন-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র আরো নগ্ন হয়ে উঠেছে। জনগণের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণ জঘন্য রূপ নিয়েছে। ইন্দিরা-পন্থী শাসক-গোষ্ঠী জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং গণ-সংগ্রামে বিভেদ সৃষ্টির জন্য নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল চেহারায় "প্রগতিশীলতার" প্রলেপ লাগাতে চেষ্টা

করেছে, তাই ব্যাংক জাতীয়করণকে "বিরাট" এক পদক্ষেপ বলে উচ্চ স্তরের প্রচার চালিয়েছে। কৃষকদের সংগ্রামকে বানচাল করার জন্য ভূমিসংস্কার করতে হবে এবং সরকার হতেই তা করা হচ্ছে বলে ফাঁকা চিৎকার চালিয়েছে।

যে সব পার্টি এতদিন কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী পার্টি বলে পরিচিত ছিল, তাদের অনেক নেতাদের মনে শাসক-গোষ্ঠী রং ধরাতে পেরেছে; দক্ষিণ-পন্থী কমিউনিস্টদের মতো বেশ কিছুকে তারা হাতছানি দিয়ে কাছেও টানতে পেরেছে। কিন্তু তাদের একচেটিয়া পুঁজিপতি ও জমিদার—জোতদারদের স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত শাসক কংগ্রেস-গোষ্ঠীর কদর্য চেহারা আর ঢেকে রাখা যায় নাই। ঘণায়মান সংকট ও ক্রমবর্ধমান গণ-সংগ্রামের ঝড়ো হাওয়ার আঘাতে এদের "প্রগতিশীলতার" প্রলেপ উঠে গিয়ে চেহারাকে কদর্য করে তুলেছে। ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত শাসক-গোষ্ঠী জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণকে আরো তীব্র করেছে।

ইন্দিরা-পন্থী শাসক-গোষ্ঠীর গৃহীত কৌশল যে আসলে প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমীস্বার্থেই পরিচালিত তা বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে। শাসকশ্রেণীগুলি বিশেষ করে ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিরা এই গোষ্ঠীকে সমর্থন করেছে; অবশ্য সংগে সংগে ভবিষ্যতের কথা ভেবে সিন্ডিকেট, জনসংঘ, স্বতন্ত্র জোটকেও তারা হাতে রেখে দিচ্ছে। ইত্যবসরে কেন্দ্রীয় সরকারে নিজেদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে এবং চাপ ও সুবিধার খেলা খোলে শাসক কংগ্রেস-গোষ্ঠী পার্লামেন্টারী ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নিজেদের শক্তিকে খানিকটা "সংহত" করেছে। বিহার, উত্তর প্রদেশ, পানজাবে জোট পাল্টা জোটের খেলায় ইন্দিরা-গোষ্ঠী কিছুটা সুবিধা করেছে। তারা তামিলনাড়ুতে ডি. এম. কে সরকারের সংগে খানিকটা বোঝাপড়া করেছে। কয়েকটি উপনির্বাচনে সিন্ডিকেট-পন্থীদের তুলনায় তারা বেশী জিতেছে। খুব অনিশ্চিত হলেও এবং এর মধ্যে চাপ পাল্টা চাপের খেলা থাকলেও দৈনন্দিন রাজনীতির বিচারে এ সবের মূল্য আছে।

ইন্দিরা-পন্থী শাসক-গোষ্ঠী গণ-সংগ্রামের মোকাবিলা করার ব্যাপারেও তাদের কৌশলের কিছুটা "সাফল্য" দাবি করতে পারে। কেরালায় তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেংগে দিতে পেরেছে; মিনি ফ্রন্টের গভর্ণমেন্টও করতে পেরেছিল। গণ-আন্দোলনের চাপ ও অভ্যন্তরীণ কলহে মিনি ফ্রন্ট সরকার ভেংগে গেছে বটে, কিন্তু আসন্ন নির্বাচনে শাসক কংগ্রেস মিনি ফ্রন্টের প্রধান পান্ডাদের সংগে সমঝোতা করতে পেরেছে। পশ্চিমবংগে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল কায়েমীস্বার্থের কাছে তা আরো ভয়ের জিনিস, তার বিরুদ্ধেও শাসক-গোষ্ঠী চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা সংগঠিত করতে পেরেছে এবং তার ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেংগেও দিতে পেরেছে। যদিও এখানে মিনি ফ্রন্ট সরকার

করা সম্ভব হয় নাই এবং শেষ পর্যন্ত বিধান সভাকেও ভেংগে দিতে হয়েছে। তথাপি শাসক-গোষ্ঠী এখানে তাদের অনুচর বৃত্তি করার জন্য বাংলা কংগ্রেসকে পাওয়া ছাড়াও আট পার্টির জোট তৈরী করতে পেরেছে। ভারতের রাজনীতিতে এক নূতন ঘটনা দেখা দিয়েছে।

শাসক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন পার্টির যুক্তফ্রন্টকে অবলম্বন করে গণ-সংগ্রাম এতদিন অগ্রসর হতে পেরেছে। এখন (রাজনৈতিক) সংকট ও কংগ্রেসের ভাংগনের ফলে নিছক কংগ্রেস বিরোধিতার রাজনীতি আর চলছে না। সিন্ডিকেট, জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টিও শাসক কংগ্রেস বিরোধী, কিন্তু এদের বিরোধিতা আসছে আরো বেশি বেশী প্রতি-ক্রিয়াশীলতার দিক থেকে। অন্য দিকে যারা এতদিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুক্ত গণ-আন্দোলনে ছিল তাদের অনেকে—যার মধ্যে প্রধান হলো দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি—তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেংগে শাসক কংগ্রেসের সহযোগিতায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী জোট তৈরী করতে উঠে পড়ে লেগেছে। এই ঘটনা যেমন শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা প্রমাণ করে, তেমনি গণ-সংগ্রামকে নূতন ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা না করলে তার পক্ষে বিপদও সৃষ্টি করে। বাস্তবে তার ব্যবস্থাও হচ্ছে।

ইন্দিরা-পন্থী শাসক কংগ্রেসের কৌশলগত নীতি ছিল—অন্যান্য পার্টিকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি হতে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের দিকে টেনে নেওয়া ও এইভাবে গণ-সংগ্রামকে আঘাত করা। নিঃসন্দেহে এই কাজে শাসক-গোষ্ঠী আংশিক "সাফল্য" লাভ করতে পেরেছে। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই শাসক-গোষ্ঠী এই কাজ করতে পেরেছে। অবশ্য শাসক গোষ্ঠী তার জন্য দালালদের শাসনের অংশীদার করতে রাজী হচ্ছে না। দালাদের সংগ্রামী মুখোশ খসে পড়ছে, অথচ ক্ষমতার ভাগ মিলছে না। তাই দালালেরা "জমি-গ্রাসের" খেলা খেলে এক দিকে রাগ প্রকাশ করছে, অন্য দিকে ছিঁড়ে যাওয়া সংগ্রামী মুখোশে তালি দেবার চেষ্টা করছে। দালালদের দিয়ে দালালি করানো যায়, কিছু পুরস্কারও দেওয়া যায়, কিন্তু চরম বিপদ না এলে অন্দর মহলে স্থান দেওয়া যায় না—এ কথা দালালদের বোঝা প্রয়োজন এবং বুঝেছেও পরে।

ইন্দিরা শাসক-গোষ্ঠীর আংশিক সাফল্য তাদের মধ্যে আত্মম্ভরিতা এনে দিয়েছে, কিন্তু তাদের সাফল্য আংশিক, অন্য দিকে তাদের কৌশলগত নীতির আংশিক পরাজয়ও ঘটছে এবং এ পরাজয় তাদের মারাত্মক। তারা ভেবেছিল যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলি ভাংগতে পারলে ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে অন্যান্য পার্টি হতে আলদা করতে পারলে এই পার্টির গণ-ভিত্তি তারা দুর্বল

করতে পারবে এবং গণ-সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে পারবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই তাদের পরাজয় ঘটেছে। কেরালায় তারা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে একটুকুও দুর্বল করতে পারে নি, পার্টির গণ-সমর্থন বজায় আছে, বরং আরো বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো অতটা তীব্র ও ব্যাপক না হলেও এখানে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙ্গার পর গণ-সংগ্রাম বন্ধ হয় নাই, বরং তার শক্তি বেড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে শাসক-গোষ্ঠী ও তার দালালদের পরাজয় আরো বেশী। গত এক বছরে এখানে জনগণের সংগ্রামী শক্তি দুর্বার বেগে বেড়েছে। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে তুলনামূলকভাবে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি ও প্রভাব অনেক বেশী বেড়েছে। যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার পর এই শক্তি আরো সংহত হয়েছে, জনগণের সংগ্রামের ব্যাপকতা ও তীব্রতাও বেড়েছে। পুরানো যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, ছয় পার্টির জোট ও বিভিন্ন গণ-সংগঠনকে কেন্দ্র করে গণ-সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। বাংলা কংগ্রেস ও আট পার্টি জোটের কোন প্রভাব নাই তা নয়, কিন্তু তাদের প্রভাব প্রধানত: কিছু ঘনিষ্ঠ সমর্থক ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ, ব্যাপক সংগ্রামী জনগণকে তারা সংগ্রাম হতে সরিয়ে নিতে পারে নাই, বরং জনগণের সংগ্রামী শক্তি বেড়েছে। জোতদার-মজুতদার-পুঁজিপতি কেন্দ্রীয় সরকার ও পুলিশের আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়েছে।

১৭ই মার্চ ও ১৪ই জুলাই-এর হরতাল-ধর্মঘট, গ্রামের কৃষকদের অধিকার রক্ষার সফল সংগ্রাম, দুর্গাপুর শ্রমিক-সংগ্রাম, সরকারী কর্মচারী ধর্মঘট, শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক প্রভৃতিদের সংগ্রাম হতেই তাও বোঝা যায়। মিনি ফ্রন্ট সরকার গঠনের ব্যর্থতার মধ্য দিয়েও তা বোঝা যায়। নিজেদের হাতে শাসন যন্ত্র, পুলিশ, মিলিটারী থাকা সত্ত্বেও শাসক কংগ্রেস নির্বাচন করতে চাইছে না, এর দ্বারা তারা কার্যত: স্বীকার করে নিয়েছে, যে তারা জনগণকে ভয় পায় এবং তাদের হতে তারা বিচ্ছিন্ন। শাসন যন্ত্র, পুলিস, সি আর পি, বাংলা কংগ্রেস, আট পার্টির জোট, গুণ্ডার দল—সব মিলিয়েও তারা জনগণের আন্দোলনকে ধ্বংস করতে পারছে না, তাই মিলিটারীর ডাক পড়ছে।

আগে উল্লিখিত আংশিক "সাফল্য" যেমন শাসক-গোষ্ঠীর স্পর্ধা বাড়িয়েছে, তেমনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে তাদের পরাজয় হয়েছে, এবং গণ-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি তাদের ক্ষিপ্ত ও বেপরোয়া করে তুলেছে। সেই জন্যই জনগনের আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং তাদের প্রাথমিক গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে আগের যে

কোন সময়ের তুলনায় শাসকশ্রেণীর আক্রমণ তীব্রতর রূপ নিয়েছে। পার্লামেন্টারী ক্ষমতার সংগ্রামে সিণ্ডিকেট জোটের বিরোধিতা করলেও শাসক কংগ্রেস-গোষ্ঠী এই জোটের প্রস্তাবিত জনগণের বিরুদ্ধে সোজাসুজি সশস্ত্র আক্রমণাত্মক পথই নিয়েছে। জমিদার-পুঁজিপতিশ্রেণীর অনুগত ভৃত্য হিসাবে ইন্দিরা-পন্থী শাসকচক্রের জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র অল্প দিনের মধ্যেই তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। দেশের রাজনীতিতে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাথমিক অধিকারের উপরও আক্রমণ চলেছে। সোজাসুজি রাষ্ট্রের সশস্ত্র পুলিশ ও মিলিটারীর উপর দাঁড়িয়ে দেশে স্বৈরাচারী রাজ প্রতিষ্ঠার পথে শাসকশ্রেণী অগ্রসর হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে জনগণের সংগ্রাম সবচেয়ে তীব্র হয়েছে ও উচ্চ স্তরে উঠেছে বলে এখানে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সীমাবদ্ধ বুর্জোয়া সংবিধানের প্রাথমিক নিয়ম হলো নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকারের মারফতে শাসন চালানো। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা বাতিল করে কেন্দ্রীয় শাসকেরা ক্ষুদে ডিক্‌টেটরের ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করেছে এবং কোন নির্বাচনের আগে সশস্ত্র পশু শক্তির সাহায্যে জনগণকে পিটিয়ে শায়েস্তা করার কথা ঘোষণা করেছে। জনসাধারণের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ চালানো হচ্ছে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতার ও আইন-শৃংখলার নাম করে। এই অজুহাতেই পৃথিবীর দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারী শক্তি আক্রমণ চালায়। এই পরিস্থিতি ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের সামনে কঠিন কঠোর প্রতিরোধ সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত উপস্থিত করেছে। গতানুগতিকভাবে জনগণের আন্দোলনকে রক্ষা করা বা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আর যাবে না। তীব্রতর আক্রমণের মোকাবিলা করেই অগ্রসর হতে হবে এবং তার মধ্য দিয়ে জনগণের সংগ্রাম সামগ্রিকভাবে উচ্চতর পর্যায়ে এসে দাঁড়াবে। শাসকশ্রেণীর আক্রমণ যেমন বেড়েছে তেমনি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো জনগণের ক্ষমতাও তত বেড়েছে। মার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক কর্মীদের এই নতুন পরিস্থিতি বুঝে কাজ করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ পরিস্থিতি

সারা ভারতে ঘণীভূত এবং আরো ঘণায়মান সংকটের পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ তীব্রতর হওয়ায়, এখানের জনগণের সংগ্রাম আজ এক বিশেষ কেন্দ্রীয় গুরুত্ব অর্জন করেছে। সারা ভারতের সমস্ত

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এখানে শাসকশ্রেণীর আক্রমণের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, অন্য দিকে সারা ভারতের গণতান্ত্রিক শক্তিও পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সংগ্রামকে অধীর আগ্রহে দেখছে। শ্রেণী সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এখানে সবচেয়ে তীক্ষ্ণরূপ নিয়েছে। এখানের শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের দায়িত্ব গুরুতর। সেই জন্যই মার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক কর্মীদের এখানের পরিস্থিতিকে ভালভাবে বোঝা প্রয়োজন।

১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন এখানে গঠিত হয়, তখন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সঠিকভাবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যে এই সরকারকে মূলত: গণ-সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের সঠিক প্রয়োগের এ এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। গত তিন বছরের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, এই সিদ্ধান্ত সঠিক। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এই শিক্ষা দেয় যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নির্বাচনের দ্বারা জনগণের মূল সমস্যার সমাধান করা বা শ্রেণী শোষণ ব্যবস্থার অবসান করা যায় না। নির্বাচনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সমস্যা সমাধানের কথা বলা হলো ধনিকশ্রেণীর সেবা করা। কিন্তু তাই বলে নির্বাচন উপেক্ষার বস্তু নয়, নির্বাচনের মাধ্যমে একে কাজে লাগিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর ও জনগণের সংগ্রামকে পুষ্ট করা যায়—তাদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য নির্বাচনকে কাজে লাগানো। সংশোধনবাদী সোস্যাল ডেমোক্রাট ও বামপন্থী অতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে দুই দিকে সংগ্রাম করে কমরেড লেনিন এই শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এই শিক্ষার উপর দাঁড়িয়েই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা নির্দিষ্ট করেছে ও তার ভিত্তিতে কাজ করেছে।

ভারতের বর্তমান সংকটের তাৎপর্য আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই সংকট যে বিপ্লবী সংকট নয় তাও দেখানো হয়েছে। এই অবস্থায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করতে অস্বীকার করার অর্থ হলো জনগণের চেতনার বাইরে চলে যাওয়া ও তাদের সংসদীয় মোহ বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করা। কারণ, জনগণের চেতনায় নির্বাচন এখনও মূল্যহীন হয়ে যায় নাই। অবশ্য এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, জনগণের স্বার্থে ব্যবহারের অর্থ হলো তাদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। রাজ্য সরকারগুলির অস্তিত্ব দেশের জমিদার-পুঁজিপতি রাষ্ট্র কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই এগুলির ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। শাসকশ্রেণী চায় যে, এই সরকারগুলি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ক্ষমতার অনুগত বাহন হিসাবে কাজ করুক।

এই ফাঁদে পা দিলে চরম সুবিধাবাদ করা হবে। এবং জনগণকে ভুল বুঝিয়ে "শান্ত" করে রাখা হবে।

অন্য দিকে, ধনিকশ্রেণী যাই মনে করুক না কেন, শ্রমিকশ্রেণী যেমন নির্বাচনকে কাজে লাগাতে পারে, তেমনি এই সরকারগুলির সীমাবদ্ধ ক্ষমতা গণ-আন্দোলনকে উৎসাহিত ও শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহার করতেও পারে। কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই তা করা যেতে পারে। এই ভূমিকা পালন করা কতটা সম্ভব যুক্তফ্রন্টের মধ্যে মার্কসবাদীদের ক্ষমতা ও বাইরে গণ-আন্দোলনের শক্তির উপর নির্ভর করে এইভাবে নির্দিষ্ট শক্তি সমাবেশের কথা বিবেচনা করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলি গণ-সংগ্রামের হাতিয়ার হতে পারে বলে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত করেছিল; জমিদার-পুঁজিপতি রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে এমনি রাজ্য সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা সহজ নয়, কিন্তু বিপ্লবের পথও সরল সহজ নয়। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এই সিদ্ধান্তের দ্বারা ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্কসবাদী শিক্ষার সঠিক প্রয়োগ করেছে এবং সেই জন্যই গণ-সংগ্রামকে বিপুল বেগে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে।

কিন্তু, দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম হতেই এই মার্কসবাদী শিক্ষাকে বাতিল করেছে এবং বিশ্বাসঘাতক সোস্যাল ডেমোক্রাটদের মতো যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতা দখলের ধাপ বলে মনে করেছে। সেই জন্যই তারা মন্ত্রি সভায় গিয়ে বুর্জোয়া "ভদ্রলোকের" মতো চলতে চেয়েছে এবং কায়েমী স্বার্থে ও শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিতালি করার দিকে গেছে। তাই তারা বুর্জোয়া সংবিধানের বিরুদ্ধে কোন কথা বলাকে অন্যায় বলেছে এবং আইনের চৌহদ্দির (বুর্জোয়া সংবিধানের মধ্যের আইন) বাইরের গণ-সংগ্রামকে জমিদার-পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিদের মতো "বিশৃংখলা-সৃষ্টি", "গুণ্ডামি" ও "দলবাজী" বলে কুৎসা করেছে।

শুধু তাই নয়, এমনি গণ-সংগ্রামের বিরুদ্ধে কেরালায় মিনি ফ্রন্টের আমলে তারা প্রচণ্ড পুলিশী আক্রমণ চালিয়েছে। অন্য দিকে নকশালপন্থীরা কমরেড লেনিন দ্বারা নিন্দিত হঠকারীদের মতো নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের সংগ্রামী তাৎপর্যকে, জনগণের সংগ্রাম ও সংগ্রামী শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার হাতিয়ার হিসাবে এদের ভূমিকাকে অস্বীকার করেছে এবং জনগণকে বাদ দিয়ে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে নিয়ে বিপ্লবের বুকনি চালিয়েছে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে তারা শাসক-গোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বদলে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ও তার প্রধান সংগ্রামী শক্তি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রধান

শত্রু মনে করে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনের আগে ও পরে (১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে) জনসাধারণকে পরিষ্কারভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সীমাবদ্ধতা ও সংগ্রামী ভূমিকা সম্বন্ধে বলেছে ও এ ব্যাপারে তাদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করেছে। তারা পরিষ্কার বলেছে, যে যুক্তফ্রন্ট সরকার জনগণের মূল সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, এ তাদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ও কিছু আংশিক দাবি আদায়ে সাহায্য করতে পারবে। জনগণের সংগ্রামী শক্তিকে বাড়িয়ে তোলাই হবে এর প্রধান কাজ। এই কথা মনে রেখে পার্টি কাজ করেছে ও জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়েছে। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান শক্তি হিসাবে থাকলেও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের তুলনায় তাদের শক্তি ও প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম ছিল। গণ-আন্দোলনও অপেক্ষাকৃত কম জোর ছিল। তবু পার্টি এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করেছে।

প্রথম প্রথম কিছু কর্মী ও সমর্থক জনগণের একাংশের মধ্যে তদ্বির তদারক করে কিছু পাইয়ে দেবার ঝোঁক যে ছিল না, তা নয়, কিন্তু পার্টি একে কাটিয়ে তোলে। ফলে শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী জনগণের মধ্যে উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস ও সংগ্রামী শ্রেণী চেতনা বাড়ে। গ্রামের গরীবদের মধ্যে উচ্ছেদ-বিরোধী ও জমির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নূতন স্পন্দন জাগে। জনগণের এই শ্রেণী-চেতনাই ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে খাদ্য সংকট সম্বন্ধে শাসকশ্রেণীর মিথ্যা প্রচার সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্টকে বিপুলভাবে জয়যুক্ত করে এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। এই পরিস্থিতিই ১৯৬৯-৭০ সালে গণ-সংগ্রামে বিপুল গতিবেগ এনে দেয়। বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মতো শ্রমিক, কৃষক ও সর্বস্তরের মেহনতী মানুষের সংগ্রামের ব্যাপকতা, গভীরতা ও চেতনা দ্রুতবেগে এগিয়ে যায়। এমনি দুর্বার অগ্রগতি অতীতে কোন দিন ভাবা যায় নাই। যেন কোন সোনার কাঠির স্পর্শে জনগণের সংগ্রামের উৎসমুখ খুলে গেল।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের ভেতর থেকে ও বাইরে হতে জোতদার-মজুতদার-মিল মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী জনগণকে সর্বতোভাবে সংগ্রামে উৎসাহ দিয়েছে, তাদের সংগঠিত করেছে ও তাদের সংগ্রাম পরিচালিত করেছে। সীমাবদ্ধ আইন কানুনের গুরুত্বকে তারা অস্বীকার করে নাই। কিন্তু তারা এমন কিছু করে নাই, যাতে এ সম্বন্ধে জনগণের মনে কোন মোহ সৃষ্টি হয় বা তাদের মনে এমন ধারণা

সৃষ্টি হয় যে, তাদের নিজস্ব সংগ্রামী শক্তি নয়, উপর হতে আইন করে কেউ তাদের উপকার করে দিয়েছে! পুলিশের ব্যবহারকে সংযত করে তারা গণ-সংগ্রামের বিকাশকে বিশেষ সাহায্য করেছে। এইভাবেই তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে; আর এই জন্যই কায়েমী স্বার্থ ও শাসকশ্রেণী তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করেছে।

কোটি কোটি সাধারণ মানুষ যখন বিরাট সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সেই বিপুল অগ্রগতির মাঝে কিছু কিছু অতি উৎসাহজনিত বাড়াবাড়ির ঝোঁক দেখা যায় বা কিছু কর্মীদের মধ্যে সাফল্যের আনন্দে অহমিকাবোধ দেখা দিতে পারে। বিপুল অগ্রগতির তুলনায় এগুলি নগণ্য হলেও এগুলিকে উপেক্ষা করলে ভবিষ্যতে সংগ্রামের বিকাশে ও জনগণের গণতান্ত্রিক মোর্চা গড়ে তোলার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে; কিছু পাওয়া বা পাইয়ে দেবার ধারণা প্রশ্রয় পেলে ভবিষ্যতে যে কঠিনতর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন তাতে দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এ সব সম্বন্ধে সচেতন থেকেছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নিয়েছে। পার্টির কর্মীরা এই সব ভূমিকা পালন করতে পেরেছে বলেই, গণ-সংগ্রাম ও জনগণের সংগ্রামী চেতনা এত বেড়েছে। আমি নিজে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট কর্মী বলে পার্টির প্রশস্তি করার জন্য এ সব কথা বলছি না। ভবিষ্যতের কঠিন কর্তব্য পালন করতে হলে, সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ ও কর্মীর পক্ষে পার্টির ভূমিকা জানা ও স্বীকার করা প্রয়োজন।

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণ যে সব আংশিক দাবি আদায় করতে পেরেছে, তা সকলেই জানেন। এক বছরে মালিকের কাছ থেকে শ্রমিকদের ৫০ কোটি টাকার বেশী আদায়, জমি হতে উচ্ছেদ বন্ধ হওয়া, জোতদারদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে খাস ও বেনামী জমি মিলিয়ে প্রায় ১২ লাখ বিঘা অতিরিক্ত জমি গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের হাতে যাওয়া, মজুতদারিকে আঘাত করে বিপুল পরিমাণ ধান ঋণ হিসাবে আদায় করা ও খাদ্যের দর বৃদ্ধি বহুলাংশে প্রতিহত করা, শিক্ষক, কর্মচারী প্রভৃতিদের আংশিক সুবিধা পাওয়া, সমস্ত জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারিত হওয়া—আংশিক দাবির বিচারে এগুলি খুবই বড়। কোন কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে আজ পর্যন্ত জনগণ এমনি অধিকার অর্জন করতে পারে নাই। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের আমলে পশ্চিমবঙ্গে যা সবচেয়ে বড় সাফল্য এবং ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান তা হলো সর্বস্তরের জনগণের সংগ্রামী শক্তি, সংগঠন ও চেতনার বিকাশ। কৃষক,

শ্রমিক, কর্মচারী, সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, ছাত্র-যুব প্রভৃতি সকলের ক্ষেত্রেই এই অগ্রগতি অভূতপূর্ব, কয়লা খনি, চা-বাগান প্রভৃতিতে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রগতি লক্ষণীয়।

কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হলো, সারা রাজ্যে প্রায় সর্বত্র লক্ষ লক্ষ গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরের এক বিরাট সংগ্রামী শক্তি হিসাবে আবির্ভাব। যে গ্রামের গরীবদের কথা কমরেড লেনিন বারে বারে এত জোর দিয়ে বলেছেন, সমাজের পরিবর্তনে যাদের সংগ্রামী ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যারা না জাগলে বিপ্লবী রূপান্তরের কথা মুখের কথাই থেকে যায়। সেই সব অগণিত ক্ষেতমজুর, বর্গাদার, গরীব চাষী দীর্ঘদিনের জড়তা ও সামন্তবাদী গোলামির মনোভাব কাটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এক প্রধান নায়কের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছে। এদের সংগ্রাম গ্রাম্য জোতদারী-মজুতদারী শোষণ ব্যবস্থার ভিত্তির উপর জোর আঘাত হেনেছে। সমগ্র গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত বুর্জোয়া-সামন্তবাদী ধ্যান ধারণাকে নাড়া দিয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর উপর শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভাব আগেই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল; কিন্তু গ্রামের কৃষকদের উপর জোতদার-মহাজনদের প্রভাবের উপর ভিত্তি করে শাসক-গোষ্ঠী তাদের রাজনৈতিক অধিকার বজায় রাখার ভরসা করত। গরীব কৃষকদের জাগরণ, এই ভিত্তিকেই ভেঙ্গে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের এই সংগ্রাম সত্যিকার ভূমিসংস্কারের সঠিক পথের নিশানা দিয়েছে এবং সারা ভারতে ভূমিসংস্কারের প্রশ্নকে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসাবে সামনে নিয়ে এসেছে।

এই প্রসঙ্গে জনগণের সংগ্রামী শক্তির বিকাশের কতকগুলি বিশেষ দিক লক্ষ্য করা প্রয়োজন। তাদের রাজনৈতিক ও শ্রেণী চেতনা লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে; শ্রেণী সৌভ্রাত্র ও একতা বোধ বেড়েছে। রাষ্ট্রের, তার সংবিধানের, বিচার ব্যবস্থার ও প্রচলিত ধ্যান ধারণার শ্রেণী-চরিত্র তারা ক্রমশঃ বেশী বুঝতে শিখছে। দলিল দস্তাবেজ ও আইনের প্রতিক্রিয়ার ব্যাভিচার সম্বন্ধে তারা এতদিন কার্যতঃ অজ্ঞ ছিল, এগুলির কাছে তারা মাথা নোয়াত। এসবের বিরুদ্ধে তারা দাঁড়াতে শিখছে। ন্যায় অন্যায়, শৃংখলা-বিশৃংখলা সম্বন্ধে ধারণার উপর শ্রেণী সংগ্রামের প্রভাব পড়েছে। দলিলের কারচুপি করা, আইন ফাঁকী দিয়ে উচ্ছেদ করা, বেশী জমি চুরি করে রাখা, খাদ্য মজুত করে মানুষ মেরে মুনাফা করা, মজুরদের বঞ্চিত করা প্রভৃতিকে শাসকশ্রেণী ও তাদের স্তাবকের দল ন্যায়সংগত অধিকার এবং আইন-শৃংখলার কথা বলে তারা এতদিন সেই ভাবে চালিয়েছে। আলোচ্য সময়ে জনগণ এই সবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকেই ন্যায় ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা বলে ঘোষণা করছে। বিচার, ন্যায়, শৃংখলা, অধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে দুই পরস্পর বিরোধী ধারনা

আজ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। এক কথায় শ্রেণী সংগ্রাম, অর্থনীতি ও চেতনা সর্বস্তরে তীব্র হয়েছে।

শ্রেণী সংগ্রামের এই তীব্রতা, গণ-সংগ্রামের এই বিপুল জোয়ার যেমন গণতান্ত্রিক শক্তিকে উৎসাহিত করেছে, তেমনি কায়েমীস্বার্থ ও তাদের সমর্থকদের ক্ষিপ্ত করেছে। এই ঘটনা অনিবার্য ভাবেই যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিভিন্ন পার্টির পারস্পরিক সম্পর্কের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। শাসকশ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থের চাপ এর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা ও চক্রান্তের জন্ম দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই বিশ্বাসঘাতকতার বাহন হয়েছে বাংলা কংগ্রেস ও একে উৎসাহিত করেছে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার বন্ধুরা। এরই পরিণতিতে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেংগে দেওয়া হলো। মার্কসবাদ এই শিক্ষা দেয় যে, বিভিন্ন পার্টির যুক্তফ্রন্ট কোন স্থিতিশীল ধারনা নয়। গণ-সংগ্রামের বিশেষ স্তরে যে ধাঁচের পার্টিগত যুক্তফ্রন্ট জনগণের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, পরবর্তীকালে গণ-সংগ্রামের অধিকতর বিকাশের স্তরে তাই আবার বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তখন পুরানো ফ্রন্ট ভেংগে যায়, নূতন ফ্রন্টের ভিত্তি তৈরী হয় এবং তাকেই গড়ে তুলতে হয়। সেই জন্যই পরবর্তীকালের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের সংগ্রামী ইতিবাচক ভূমিকাকে ও সেই যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার যৌক্তি-কতাকে যেমন অস্বীকার করা ভুল, তেমনি সংগ্রামের উচ্চতর অবস্থায় পুরানো যুক্তফ্রণ্টকে ফিরিয়ে আনার চেস্টা হবে ততোধিক ক্ষতিকর।

যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে বিশ্বাসঘাতকতা করে ভেংগে দেওয়ার অর্থ শুধু এই নয় যে, জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ারকে ভেংগে দেওয়া হলো। ঘণীভূত সংকট ও তীব্রতর সংগ্রামের মুখে এই ঘটনা নিশ্চতভাবে জনগণের বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণীর ও প্রতিক্রিয়াশীলদের তীব্রতর আক্রমণের সূচনা করে। অন্য দিকে এই আক্রমণকে মোকাবিলা করার মতো শক্তি জনগণও গত এক বছরে অর্জন করেছে। ফলে পশ্চিমবংগে জনগণের সংগ্রাম এক নূতন, তীব্রতর স্তরে পৌঁছল। গত ছ মাসের ইতিহাস দেখিয়ে দিচ্ছে যে, শাসকশ্রেণীর আক্রমণ দিন দিন হিংস্র হয়েছে এবং তার মোকাবিলা করে জনগণের সংগ্রাম ও শক্তি অর্জন করে চলেছে এবং ক্রমশ: তাকে আরো কঠিন প্রতিরোধ সংগ্রামের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় শাসক-গোষ্ঠী এবং তাদের সমর্থক চক্রান্তকারীরা ভেবেছিল যে, গণ-সংগ্রামের সমর্থক মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও তার বন্ধুদের বাদ দিয়ে এবং তাদের বিরুদ্ধে এখানে কেরালার মতো মিনি ফ্রণ্ট সরকার তারা করতে পারবে।

কিন্তু ১৭ই মার্চের সর্বাত্মক হরতাল-ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে জনগণ তা ব্যর্থ

করে দিল। প্রাক্তন যুক্তফ্রণ্টের অনেকগুলি পার্টি চক্রান্তে যোগ দিলেও তারা সংগ্রামী জনগণকে বিভ্রান্ত করতে বা টানতে পারে নাই। জনগণের রুদ্র মূর্তি দেখে তাদের কেউ কেউ তখন মিনি ফ্রণ্ট করতে সাহস পেল না। ফলে শাসক-গোষ্ঠী আরো ক্ষিপ্ত হলো ও জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণকে জোরদার করার পরিকল্পনা নিল। তাদের আক্রমণের উদ্দেশ্য হলো : জোতদার-মিল মালিকদের হারানো অধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়া এবং পুলিশী আক্রমণের দ্বারা জনগণের সংগ্রামী মনোভাবকে ভেঙে দেওয়া এবং তখন মিনি ফ্রণ্ট সরকার গঠন করা। এই জন্যই বিধান সভাকে বাঁচিয়ে রাখা হলো। এ কথা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না যে, যেহেতু যুক্তফ্রণ্টের আমলে জনগণের সংগ্রামী ক্ষমতা অনেক বেড়েছে, তাই প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ আগের তুলনায় অনেক তীব্র হবে এবং হয়েছেও তাই। পুলিশী হামলা সম্বন্ধে অতীতের ধারণা বদলে গেল। মিথ্যা সাজানো মামলা, যথেচ্ছ গ্রেপ্তার করা ও জামিনে বাধা দেওয়া সমানে চালানো হল। যেহেতু ১৯৬৯ সালে গ্রামাঞ্চলেই কৃষকদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তি বেশী বেড়েছে, তাই পুলিশী আক্রমণ এখানে কেন্দ্রীভূত হলো। রাজ্যের পুলিশ কম অত্যাচারী নয়; কিন্তু তাও যথেষ্ট বিবেচিত হলো না, কেন্দ্রীয় সরকারের সি. আর. পি. বাহিনীর বল্গাহীন অত্যাচার চালানো হলো। এমনি অবস্থায় গণ-সংগ্রামের পাল্টা রণধ্বনি ছিল—যে কোন মূল্যে—প্রয়োজন হলে বুকের রক্ত দিয়ে—অর্জিত অধিকার রক্ষা করতে ও সম্প্রসারিত করতে হবে, বিধান সভা ভেঙে দিয়ে নূতন নির্বাচন করাতে হবে।

গণ-সংগ্রামের এই দাবিকেই অভিব্যক্ত করেছে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, ছয় পার্টির জোট, ও বিভিন্ন সংগ্রামী শক্তিশালী গণ-সংগঠন। এই সংগ্রামের তাগিদেই সংগ্রামী শ্রমিক কেন্দ্র সি. আই. টি. ইউ জন্ম নিয়েছে। শ্রমিকেরা সংগ্রামী, তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব জনগণের সংগ্রামের পুরোভাগে থাকা ও তাকে নেতৃত্ব দেওয়া, কিন্তু দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি কৃত্রিমভাবে এ. আই. টি. ইউ. সি.কে দখল করে শ্রমিকদের সংগ্রামে ও তাদের কর্তব্য পালনে প্রচণ্ড বাধা দিচ্ছিল। সি. আই. টি. ইউ. এই চক্রকেই ভেঙে দিয়েছে। সমস্ত বিষয়কে এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে হবে। মেহনতী কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের প্রধান সংগঠন হিসাবে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক সভা সংগ্রামের চাহিদাকে প্রতিফলিত করেছে।

গণ-সংগ্রামের এই পর্যায়ে কেন্দ্রীয় শাসক-গোষ্ঠী এবং সমস্ত চক্রান্তকারীদের আক্রমণকে প্রতিহত করে সংগ্রামী জনগণ অগ্রসর হয়েছে। কৃষক ও ক্ষেতমজুররা তাদের অধিকৃত প্রায় ১২ লাখ বিঘা জমিকে রক্ষা করা ছাড়াও

আরো কিছু বেশী জমি অধিকার করেছে। কৃষকদের মাথা ফেটেছে, কিন্তু জোতদার, পুলিশ, সি. আর. পি-র কাছে তারা মাথা নোয়ায় নাই। যত কৃষককে পুলিশ মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করতে চেয়েছে, তার কম অংশকেই গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। কৃষকরা পালিয়ে যায় নাই, জেলে গেলে বা পালিয়ে গেলে সংগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হত। তারা সংগ্রামের ময়দানে থেকেছে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, জনগণ এবং কর্মীদের মধ্যে জল ও মাছের সম্পর্ক গড়ে তোলার দিকে এটা একটা পদক্ষেপ, যদিও তা এখনও শক্ত নয়। যুক্তফ্রণ্টের আমলে যে কৃষকরা জোতদার-মজুতদারদের আঘাত করার শক্তি অর্জন করেছিল, তা বর্তমানেও সরকার-পুলিশ-জোতদারদের মিলিত আক্রমণের মোকাবিলা করার মতো শক্তি বর্তমানে আছে। কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ছাত্র-যুব প্রভৃতিরা মাথা উঁচু করে সংগ্রাম চালিয়েছে।

সমস্ত সংগ্রামগুলি এক সঙ্গে ১৪ই জুলাই সাধারণ ধর্মঘট-হরতালে মিলে শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আঘাত হেনেছে। জনগণের এই সব সংগ্রামই শাসক-গোষ্ঠীর চক্রান্তকে পর্যদস্তু করেছে, তাদের রাজনীতি-গতভাবে পিছু হঠতে বাধ্য করেছে, বিধান সভা ভেঙ্গে দিতে হয়েছে অর্থাৎ তাদের মিনি ফ্রন্টের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তার ফলে শাসক-গোষ্ঠী আরো ক্ষিপ্ত ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। রাজনীতিগতভাবে পিছু হঠতে বাধ্য হওয়ায় তারা রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তির দ্বারা জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণকে আরো তীব্র করেছে। বিধান সভা ভেঙ্গে দিলেও তারা সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাথমিক নিয়মকে পদদলিত করে খোলাখুলি ঘোষনা করে যে, কোন নির্বাচনে রাজী হবার আগে তারা জনগণকে পিটিয়ে শায়েস্তা করবে। তাই শাসক-গোষ্ঠীর আক্রমণ হয়ে উঠেছে আরো হিংস্র। তাই, সি আর পি ছাড়াও সোজা মিলিটারীকে পথে নামানো হচ্ছে। শাসক-গোষ্ঠী প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, সংসদীয় গণতন্ত্র তাদের কাছে অলংকার ছাড়া আর কিছু নয়, তারা দরকার হলে জনগণকে দাবাবার জন্য নিয়মিত মিলিটারী ব্যবহার করবে। নিঃসন্দেহে এ এক গরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রস তো অনেক দিন হতে এমনি আক্রমণের জন্য ওকালতি করেছে। গণ-সংগ্রামের তীব্রতা দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট ও তাদের আট পার্টির জোটের নগ্ন চেহারা তারা খুলে ধরছে। আগে তারা নিজেদের চেহারাকে কিছু ঢেকে রাখার চেস্টা করেছে, কিন্তু দিন দিন তা বজায় রাখা দুস্কর হয়ে উঠছে। তাই, তারাও খোলাখুলি গণ-সংগ্রামকে ভাঙ্গার জন্য শাসক-গোষ্ঠীর অনুগত বাহিনীর কাজ করতে লেগেছে। কলিকাতার যাদবপুর, বর্ধমানের বিজুড় হতে শুরু করে দুর্গাপুর শ্রমিক সংগ্রাম, সরকারী

কর্মচারী ধর্মঘট ও ৩১শে আগস্টের শহীদ দিবস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের তীব্রতা দিন দিন ফুটে উঠছে। সংগ্রামী জনগণও এর মোকাবিলা করতে শিখছে। দুর্গাপুরে সশস্ত্র আক্রমণের সামনে শ্রমিকদের পিছু হঠতে হয়েছে বটে, কিন্তু নিঃসন্দেহে তাদের সংগ্রাম নূতনত্বের ইংগিত বহন করছে। এই পরিস্থিতি জনগণের সংগ্রামকে নূতন কঠিন স্তরে উন্নীত করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ও মার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক কর্মীদের সামনে এক নূতন তীব্রতর প্রতিরোধ সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত উপস্থিত করেছে। এই সংগ্রামের রূপ কী হবে, তা নির্ভর করবে শাসকদের আক্রমণের চরিত্রের উপর। তবে বুঝতে হবে যে, সংগ্রাম কঠিন হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতের কথা ভুলে গেলে মার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক কর্মীরা তাঁদের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হতে পারবেন না, এই কথা মনে রেখেই জনগণের প্রতিটি সংগ্রামকে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে হবে।

এই দৃষ্টিভংগী দিয়ে আশু নির্বাচনের দাবি ও তার জন্য সংগ্রামকে বিচার করতে হবে। বুঝতে হবে যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের অংগ হলেও নির্বাচন এবং তার ফলাফলকে শাসক-গোষ্ঠী ও তাদের অনুগতরা ভয় পাচ্ছে। এমনি অবস্থায় নির্বাচন ও তার ফলাফল শাসক-গোষ্ঠীকে কোনঠাসা করতে ও গণ-সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। সেই জন্যই এগুলিকে কঠিন গণ-সংগ্রামের অংগ হিসাবে দেখতে হবে। বুঝতে হবে যে, শাসক-গোষ্ঠী ও বিভিন্ন কায়েমীস্বার্থ নির্বাচনের দাবীকে সহজে মেনে নেবে না, নির্বাচনেও জনগণকে কঠিন আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে এবং নির্বাচনের পর জনগণের জয়ের বিরুদ্ধেও কেন্দ্রীয় আক্রমণের বিপদ বাড়বে। সেই জন্যই কঠিন প্রতিরোধ সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত দূরে সরে যাবে এমন মনে করা মারাত্মক ভুল হবে।

কেন্দ্রীয় শাসক-গোষ্ঠী শুধু যে নির্বাচনের অধিকারকে অস্বীকার করছে তাই নয়, অন্যভাবেও সংবিধানে স্বীকৃত অধিকারকে কেড়ে নিচ্ছে। খুব সীমাবদ্ধ হলেও রাজ্য সরকারগুলিকে সংবিধানে কিছু অধিকার দেওয়া আছে। বহু জাতি ভিত্তিক দেশে জাতীয় ঐক্যের জন্য রাজ্যগুলির ক্ষমতা ও অধিকার বৃদ্ধি করা দরকার: তার বদলে সংকট যত বাড়ছে, ততই কেন্দ্রীয় শাসক-গোষ্ঠী এই ক্ষমতাকে কেড়ে নিয়ে কেন্দ্রের স্বৈরাচারী আধিপত্য বাড়াচ্ছে। কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী গঠন, সি. আর. পি নিয়োগ তারই বিপজ্জনক লক্ষণ। পশ্চিমবঙ্গে শাসক-গোষ্ঠী সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন বলে এই রাজ্যকে কেন্দ্র কার্যত: একটি দখলীকৃত দেশের মতো চালাচ্ছে ও জনগণের নির্বাচিত সরকার করতে না দিয়ে এবং বাইরে থেকে পুলিশ ও সৈন্য এনে

তাদের সাহায্যে নিজেরা দখলদার শক্তির মতো ব্যবহার করছে। অর্থ বরাদ্দের দিক দিয়েও একে পংগু করা হচ্ছে। সারা ভারতে ক্রমশঃ স্বৈরাচারী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার বিপদ বাড়ছে। এই কেন্দ্রীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে পশ্চিমবংগের সংগ্রাম তাই ভারতে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অংগ। তাই নির্বাচন, সি. আর. পি ও বি. আই. এস. এফ প্রত্যাহার প্রভৃতির দাবি এই সংগ্রামের নির্দিষ্ট রূপ। পশ্চিমবংগের সংগ্রাম সারা ভারতে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সংগে এইভাবে যুক্ত হয়েছে। এই সব কথা মনে রেখেই গণতান্ত্রিক কর্মীদের প্রস্তুত হতে হবে।

দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ও নকশালপন্থীদের ভূমিকা

শাসক-গোষ্ঠীর তীব্রতর আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য শ্রমিক, কৃষক ও সমস্ত মেহনতী জনগণকে সংগ্রাম এবং সংগঠনের দিক দিয়ে প্রস্তুত করতে হলে, যেমন শাসক-গোষ্ঠীর আক্রমণের স্বরূপ নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে। এর বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে হবে, তেমনি দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির অধঃপতন ও ঘৃণ্য কার্যকলাপ সম্বন্ধে জনগণকে নিয়মিত সচেতন করতে হবে। তার কারণ, এই পার্টিই শাসক-গোষ্ঠীর হিংস্র আক্রমণকে আড়াল করে রাখছে ও তাকে আক্রমণ চালাতে সাহায্য করছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এদের রাজনীতির কথা আগেই বলা হয়েছে। পৃথিবীর দেশে দেশে কমিউনিস্ট বিরোধিতার ধ্বজার আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলেরা জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে থাকে। ভারতে মার্কস-বাদী কমিউনিস্ট পার্টির শত্রুতা করার নামে দক্ষিনপন্থী কমিউনিস্টরাই কমিউনিস্ট-বিরোধী ফ্রন্ট গঠনে উদ্যোগী হয়েছে। জনসংঘ, স্বতন্ত্র, কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস প্রভৃতির চরিত্র বুঝতে জনগণের কষ্ট হয় না, কিন্তু এই পার্টি মার্কসবাদের নাম ব্যবহার করে ধনিকশ্রেণীর দালালি করছে।

পশ্চিমবংগে শাসকশ্রেণীর সংকট ও জনগণের সংগ্রাম খুব তীব্র বলে এখানে এদের চক্রান্ত খুব ঘৃণ্য রূপ নিয়েছে। যেমন করে শাসক-গোষ্ঠীর আক্রমণ তীব্র হয়েছে, এদের অনুচর বৃত্তিও তেমনি করে নীচ স্তরে নেমে গেছে। এদেরই উৎসাহে ও প্ররোচনায় বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে ভেংগেছে। এদেরই শত্রুতার জন্য সংগ্রামী বিকল্প যুক্তফ্রণ্ট সরকার হতে পারে নাই। এরাই প্রশাসন ও পুলিশ দপ্তরকে [১৯৬৯-এ] কায়েমী-স্বার্থের পোষক বাংলা কংগ্রেসের হাতে দেবার জন্য জিদ ধরেছিল। যুক্তফ্রণ্টকে ভাংগার পর এদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, জনগণের যে কোন সংগ্রামের বিরুদ্ধে পুলিসী হামলাকে সমর্থন করা। এরাই তথাকথিত

আট পার্টির জোট তৈরী করে কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের সংগে গাঁটছড়া বাঁধবার চক্রান্তের নায়ক। প্রত্যেকটি গণ-সংগ্রামকে মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের "দলবাজী" বলে এরা তার বিরোধিতা করছে ও পুলিশকে তীব্রতর হামলা চালাতে বলেছে। সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি প্রভৃতি প্রতিটি সংগ্রামী ও দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী সংগঠনকে ভাংগার ব্যর্থ চেষ্টায় এরাই অগ্রণী হয়েছে।

অতীতে এমন অনেক আন্দোলন হয়েছে, যাতে বিভিন্ন পার্টির মধ্যে মত-পার্থক্য হয়েছে। কিন্তু এমন কখনও দেখা যায় নাই যে, কোন বামপন্থী পার্টি গণ-আন্দোলন দাবানোর জন্য পুলিশের সংগে খোলাখুলি যোগ দিয়ে গুণ্ডামির ব্যবস্থা করেছে। দুর্গাপুরেও সরকারী কর্মচারীদের সংগ্রামে এরা তাই করেছে। দুর্গাপুরে এরা পুলিশের গাড়ীতে গিয়ে শ্রমিক নেতা ও কর্মীদের মারধর করেছে, গ্রেপ্তার করতে সাহায্য করেছে এবং এখনও করছে। অসত্য ভাষণে পটু সরকারী শয়তান অফিসারদের সুরে সুর মিলিয়ে এরা গণ-আন্দোলনের নেতা ও কর্মীকে "খুনী" "গুণ্ডা" আখ্যা দিচ্ছে, প্রতিটি পুলিশী আক্রমণের সাফাই গাইছে, প্রতিটি সংগ্রামকে ব্যর্থ বলে কুৎসা চালাচ্ছে এবং অত্যাচারের সামনে জনগণের কোন অংশ পিছু হঠতে বাধ্য হলে (যেমন দুর্গাপুরে) এরা শয়তানের হাসি হাসছে।

কুৎসা প্রচার এদের "কালান্তর", "আনন্দবাজার", "যুগান্তর" "স্টেটসম্যান" কেও ছাড়িয়ে গেছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে দুর্বল করতে ও গণ-সংগ্রামকে বানচাল করতে এরা যত ব্যর্থ হচ্ছে, ততই ক্ষিপ্ত হয়ে দালালির পাঁকে ডুবছে। অন্য দিকে নিজেদের ক্ষীয়মান প্রভাবকে বজায় রাখার জন্য তথাকথিত আন্দোলনের খেলা খেলছে। ঘনীভূত সংকটের মোকাবিলা করতে হলে সেই জন্যই প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক কর্মীকে এদের স্বরূপ বুঝতে হবে, এদের বিরুদ্ধে নিয়মিত সংগ্রাম করতে হবে এবং সংগে সংগে এদের প্রভাবে এখনও পর্যন্ত জনগণের যে সামান্য অংশ আছে তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে টানার চেষ্টা করতে হবে।

সংগে সংগে হঠকারিতা সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। পশ্চিমবংগে নকশালপন্থীদের প্রভাব বিশেষ নাই, কিন্তু তার জন্য হঠকারিতাকে উপেক্ষা করা ভুল হবে। কারণ ঘনীভূত সংকটের মাঝে ভেসে পড়া মধ্যবিত্ত-প্রধান সমাজে হঠকারিতার ঝোঁক বারে বারে মাথা চাড়া দিতে পারে। প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের মুখে দিশেহারা হয়ে, জনগণকে সংগঠিত করার দুরূহ পথ ছেড়ে হঠাৎ কিছু করার ঝোঁক অস্বাভাবিক নয়। এমনি অবস্থা নকশালপন্থীদের

সুযোগ দেয়। দ্বিতীয়তঃ, সাবধান না হলে এরা কিছু ক্ষতি করতে পারে। পশ্চিমবংগে গণ-সংগ্রাম যেমন যেমন বাড়ছে, তেমনিভাবে নকশালপন্থী হঠকারিতা অধঃপতিত হয়ে প্রতিক্রিয়ার বাহনে পরিণত হচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাস এই শিক্ষা দেয় যে, হঠকারিতার নীতি তার ধারকদের জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং তারপরও হঠকারিতা নিয়ে আঁকড়ে থাকলে তারা প্রতিক্রিয়ার দোসরে পরিণত হয়।

ট্রট্স্কীর অধঃপতনের ইতিহাস এই প্রসংগে স্মরণীয়: রুশ বিপ্লবের সময় যে ব্যক্তি তাতে যোগ দিয়েছিল, যে হঠকারিতার জন্য প্রথমে হলো কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের বিরোধী, পরের ধাপে পার্টির বিরোধী, তারপর রুশ বিপ্লবের বিরোধী এবং শেষে ফ্যাসীবাদের সহায়ক। নকশালপন্থীরা ট্রট্স্কীর চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র; তাই তাদের অধঃপতন আরো দ্রুত। পশ্চিমবাংলার মতো অন্যান্য রাজ্যে গণ-সংগ্রাম তীব্র নয় বলে সেখানে এদের অধঃপতন শেষ স্তরে যায় নাই; তারা গণ-সংগ্রামের ক্ষতি করছে, কিন্তু পশ্চিমবংগে তারা চরমে গেছে।

১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ীতে হঠকারিরূপে এদের জন্ম। কৃষকদের ন্যায়সংগত বিক্ষোভকে এরা ভুল পথে চালাল, ফলে আন্দোলন দুর্বল হল এবং নকশালপন্থীরা নকশালবাড়ীতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাহলেও এরা পশ্চিমবংগে হঠকারী শ্লোগান নিয়ে আঁকড়ে থাকল। তাদের প্রচারের প্রধান কথা ছিল—গ্রামে গ্রামে মুক্ত এলাকা করা ও গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা। গ্রামে গ্রামে কৃষি বিপ্লব করতে হবে, এই পোস্টার সহরের দেওয়াল ছেয়ে গেল। কিন্তু কৃষকের সাড়া মিলল না; তারা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সঠিক সংগ্রামের পথ পেয়েছে। তাই নকশালপন্থীরা কিছুটা মেদিনীপুর জেলার ডেবরায় ও কিছুটা গোপীবল্লভপুরে অল্প দিনের জন্য কৃষক আন্দোলনের ক্ষতি করা ছাড়া আর ক্ষতি করার স্থান পেল না।

কিন্তু এরা শিক্ষা নিতে নারাজ। কৃষক যখন কৃষি বিপ্লব করছে না, তখন শ্রমিক গিয়ে ঐ বিপ্লব করবে। তাও যখন হল না, তখন কলেজের কিছু ছাত্র করবে। কৃষক নয়, শ্রমিক নয়, কিছু মধ্যবিত্ত ছাত্র কৃষি বিপ্লব করবে; কলেজের ছাত্র বিশেষ যখন মিলছে না, তখন স্কুলের তরুন কিছু ছাত্রকে বিপ্লব করতে হবে। কিন্তু, তারা তো গ্রামে গিয়ে বিপ্লব করতে পারবে না, তাই স্কুল কলেজে "বিপ্লব" তৈরী করতে হবে। মার্কসবাদ বলে সমাজ ব্যবস্থার উপর উপরতলার কাঠামো নির্ভর করে; তাই সমাজ ব্যবস্থা না বদলালে উপরতলার কাঠামো বদলানো যায় না। কিন্তু নকশালপন্থীরা এই শিক্ষার শ্রাদ্ধ করে বুর্জোয়া শিক্ষাকে ভেংগে কৃষি বিপ্লব করার কথা ভাবল।

কিন্তু এই শিক্ষাকে তো ভাঙ্গা যায় না, তাই অতর্কিতে কিছু বোমা ফেলা, পরীক্ষা নষ্ট করা, কিছু বই পোড়ানো ও পরীক্ষার বই দেখে লেখার "বিপ্লব" চালাতে বলা হলো। পৃথিবীতে ফ্যাসিস্ট ছাড়া আর কেউ বই পোড়ায় নাই। নকশালপন্থীরা সেই কাজই করতে বলল। কিন্তু এসবেও যখন সুবিধা হলো না এবং ভাল ছেলেমেয়ে পাওয়া গেল না, তখন তারা অধঃপতনের চরমে নামল। ভাল ছেলে না মিললেও সমাজ-বিরোধী ও মালগাড়ীর ওয়াগন ভাঙ্গার লোকদের মিলতে পারে, কারণ এরা সাহসী ও কৌশলী এবং "বিপ্লবের" ছাপ লাগাতে পারলে এদেরও সুবিধা হয়। কমরেড লেনিন এদের হতে শত হস্ত দূরে থাকার কথা বারে বারে বলেছেন।

কিন্তু এরাই হল এখন নকশালপন্থীদের প্রধান অবলম্বন। সকলেই জানেন যে, এদের সঙ্গে পুলিস ও গুপ্তচর বিভাগের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে বা আছে। সঙ্গে সঙ্গে নকশালপন্থীদের কাজ হয়ে দাঁড়াল, গণ-সংগ্রামের কর্মীদের হত্যা কর। যেহেতু মার্কসবাদী কর্মীদের জন্যই জনগণ সংগ্রামের সঠিক পথে যাচ্ছে এবং হটকারীদের তথাকথিত বিপ্লব হচ্ছে না, তাই তাদের কাছে মার্কসবাদী কর্মীরাই প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হতে শুরু করে ভারতের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও বিভেদকামী শক্তির শত্রু হলো মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। এখন তারা নকশাল-পন্থীদেরও শত্রু। কী চমৎকার মিল ও অধঃপতন।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক কর্মীদের এই ইতিহাস বোঝা প্রয়োজন। সত্যিকারের বিপ্লবে বিশ্বাসী সমস্ত তরুণদের সতর্ক হতে হবে। মনে রাখা দরকার যে, মার্কিন গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এমন কিছু শিক্ষক, অধ্যাপক ও ডাক্তারও আমাদের দেশে আছে। তাদের মধ্যে নকশালপন্থী থাকা অস্বাভাবিক নয়। নকশালপন্থীদের মধ্যে কিছু পথভ্রষ্ট যুবক বা তরুণ নাই তা নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নকশালপন্থীরা আর শুধু হঠকারী অতিবিপ্লবী নয়। এরা প্রতিক্রিয়ার ঘৃণ্য অনুচরে পরিণত হচ্ছে। তাই হঠকারীতা সম্বন্ধে কোন দুর্বলতা থাকলে তা ক্ষতিকর হবে।

তীব্রতর প্রতিরোধ সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত

পরিশেষে, সমস্ত মার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক কর্মীকে আবার স্মরণ করানো কর্তব্য বলে মনে করি যে, পশ্চিমবংগের জনগণের সামনে প্রতিক্রিয়ার তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত উপস্থিত হয়েছে। তাই, গতানুগতিকতা ও পুরাতন অভ্যাস চলবে না। কী করা দরকার তা

আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে, এইটুকু বলতে পারি যে, অতি দ্রুত সমস্ত অংশের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়াতে হবে, গণ-সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী ও নূতন অবস্থায় উপযোগী করতে হবে, জনগণের চেতনাকে অর্থনীতিবাদের গণ্ডির ঊর্ধ্বে তুলতে হবে, রাজনৈতিক সংগ্রামে আরো বেশী করে অংশ গ্রহণ করাতে হবে। তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামের সংগে, আশু রাজনৈতিক সাধারণ দাবিগুলিকেও যুক্ত করতে হবে। সর্বোপরি কঠিন সংগ্রামের জন্য যেরূপ সংগঠন ও কর্মী বাহিনী তৈয়ার করা প্রয়োজন, তা গড়ে তুলতে হবে। নীতি নির্ধারণের পর কর্মীদের উপরই সব কিছু নির্ভর করে—কমরেড লেনিনের এই কথাকে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। জনগণের ও কর্মীদের শিক্ষার জন্য রাজনৈতিক পুস্তিকা, পত্রিকা প্রচারের গুরুত্ব খুব বেশী।

ইতিহাস পশ্চিমবংগের জনগণ ও কর্মীদের উপর গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছে। গত কয়েক বছরের ইতিহাস এই আত্মবিশ্বাস এনে দেয় যে, এখানের কর্মী ও জনগণ সে দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

—নন্দন, শারদীয়া ১৩৭৭ (১৯৭০)

১১ যুব সমাজ ও তার কর্তব্য

[১৯৭০ সালের ৫ই ডিসেম্বর, শীশমহল, হাওড়ায় অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ২য় রাজ্য সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশনে কমরেড কোঙারের উদ্বোধনী ভাষণের অংশ।]

কমরেড সভাপতি ও কমরেড প্রতিনিধিগণ,

সারা ভারতের অর্থনৈতিক সংকট সবচেয়ে যখন গুরুতর আকার ধারণ করেছে, যখন প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ সবচেয়ে তীব্র, তখন আপনাদের এই রাজ্য সম্মেলন হচ্ছে। সম্মেলনে আমাকে আজকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের প্রথম সম্মেলনে আমার উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল, তারপর দু'বছর কেটে গেছে। সারা পশ্চিমবাংলায় আপনাদের সংগঠন যুবকদের মধ্যে একটা ছাপ ফেলতে পেরেছে।

যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, সারা ভারত যেমন আজ পশ্চিম-বাংলার দিকে তাকিয়ে আছে, তেমনি প্রতিক্রিয়ার শক্তিও আজ পশ্চিমবাংলার দিকে তাকিয়ে আছে—কেন পশ্চিমবাংলাকে দমানো যাবে না এই লক্ষ্য নিয়ে। বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল দলের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কিন্তু সবাই ভাবছে কেন পশ্চিমবাংলায় মিলিটারী নামানো হচ্ছে না। তারা মনে করে পশ্চিমবাংলাকে দমন করা না গেলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সারা দেশে ছোঁয়াচে রোগের মত ছড়িয়ে পড়বে। বিভিন্ন জায়গায় আমি গিয়েছি—কেরালায় গিয়েছি, সেখানে দেখেছি পশ্চিমবাংলা সম্বন্ধে কি একটা অদ্ভুত আগ্রহ তাদের। পশ্চিমবাংলা আন্দোলনের পুরোভাগে, এতে যেমন গর্ব আছে, তেমনি চিন্তারও কারণ আছে। আমাদের মত বহু জাতি-ভিত্তিক বিরাট দেশে অসম বিকাশ থাকা স্বাভাবিক। সমস্ত জায়গায় সমস্ত দেশে দেশে দেখা গেছে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক অসম বিকাশ হয় না, গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও অসম বিকাশ হয়। যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই হচ্ছে, কিন্তু ভিয়েতনাম তার কেন্দ্রবিন্দু। রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্রেও আমাদের একই অভিজ্ঞতা। ১৯১৭ সালে পেত্রোগ্রাদ দখল হলেও তারপর দু'বছর ধরে তা সারা রুশ দেশে ছড়িয়েছিল। চীন দেশের একই অভিজ্ঞতা।

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে জুলাই মাসে কারখানা থেকে শ্রমিকরা বেরিয়ে পড়েছিল, সৈনিকরা ব্যারাক থেকে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু

কমরেড লেনিন বিপ্লবের ডাক তখনও দেননি—দিয়েছিলেন তার দু-মাস বাদে। তিনি প্যারি কমিউনের পুণরাবৃত্তি চান নি। প্যারি কমিউনের শ্রমিকরা প্রস্তুত ছিল। তখন কৃষকরা প্রস্তুত ছিল না। কমরেড লেনিন বলেছিলেন, ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকরা প্রস্তুত থাকলেও সমস্ত রুশ দেশ প্রস্তুত ছিল না। দু-মাস পরও কি সমস্ত রুশ দেশ প্রস্তুত ছিল? না, কিন্তু পরিস্থিতি এমন ছিল যার ফলে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। ভারতে বর্তমানে সেই অবস্থা নেই। কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতার সুযোগ আছে। বর্তমান সংকটের চুম্বক কথা হচ্ছে—অভাব, বেকারী বাড়ছে, সংকট ঘনীভুত হচ্ছে, মানুষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ পুলিশ, মিলিটারী ব্যবহার না করে মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রাখা শাসকশ্রেণীর কাজ। কিন্তু যখন মানুষের মোহমুক্তি ঘটে তখন তারা ব্যবহার করে শক্তি। মিলিটারী ব্যবহার করে সব শেষে। মোহ সৃষ্টি করে যখন তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারে না, তখন জনগণের উপর ওরা অত্যাচার চালায় নির্মমভাবে। এরপর সাধারণ মানুষ মুখোমুখি সংগ্রামে আসে।

১৯৬৭ সালের আগে কেউ মনে করত না শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। পরিবর্তনের চরিত্র আলোচনা না করলেও ১৯৬৭ সালে কেবল পশ্চিমবাংলায় নয়, অন্যান্য প্রদেশেও সাধারণ মানুষ চেয়েছিল রাজনৈতিক শাসনের পরিবর্তন। শাসন যখন বলি, তখন চিন্তা করতে হবে, কার শাসন? জমিদার-পুঁজিপতির শাসন—কংগ্রেসের শাসন। কিন্তু কিভাবে পরিবর্তন হবে? যেহেতু পথটা সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিষ্কার ছিল না সেই জন্য পশ্চিমবাংলা, কেরালা, আর বিহার, উত্তর প্রদেশে এ অবস্থা এক রকম হয় নি। মানুষের মধ্যে যদি পরিবর্তনের স্বাদ একবার আসে, ভুলত্রুটির ভিতর দিয়ে সে শেষ পর্যন্ত তার লক্ষ্যে পৌঁছবেই।

দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, শাসকশ্রেণী এতদিন নিশ্চিত ছিল। আজ আর তারা নিশ্চিত নয়। সেই জন্য তাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, যার জন্য তাদের মধ্যে বিরোধ লাগে—ভাঙ্গন হয়। গণ-আন্দোলনের চাপে নিজলিঙ্গাপ্পা ও শাসক কংগ্রেস সৃষ্টি হয়। একদল ভাবে সরাসরি আক্রমণ, অন্য দল ভাবে নতুন কথা বলতে হবে। কংগ্রেস কৌশল নিল—যে পার্টি জনগণকে সংগ্রামের পথে নিয়ে যাবে তাকে আঘাত কর, অন্য পার্টিকে দালালির কাজে লাগাও। এটা ইতিহাসের শিক্ষা, ভারতে নতুন কিছু নয়। এই কৌশলটা আমাদের বুঝতে হবে। শাসক পার্টির নীতি অংশত সফল। কেরালায়, পশ্চিমবাংলায় ইন্দিরার নীতি অনুসারে যুক্তফ্রন্ট সরকার তারা

ভাংগতে পেরেছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির উপর আঘাত তারা করতে পেরেছে। অংশত তারা সফল হয়েছে।

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে আমরা সংগ্রামের হাতিয়ার বলেছিলাম। ঐ অবস্থা অতীতে কখনও হয় নি। কেন্দ্রে শাসকশ্রেণী, কংগ্রেস সরকারের শাসন, রাজ্যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জয়—এ অবস্থা রাশিয়ায় হয় নি, চীনে হয় নি। কমরেড মার্কস-লেনিনের কথা বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে সমাজের মৌলিক পরিবর্তন করা যায় না। সেই সংগে কমরেড লেনিনের এটাও শিক্ষা যে নির্বাচনকে যদি মনে করা যায় শ্রমিকশ্রেণী তার সংগ্রামে কাজে লাগাতে পারবে না, তবে এটা ভুল। আমরা মনে করি নির্বাচন করে সমাজের মৌলিক পরিবর্তন হয় না, কিন্তু নির্বাচনকে শ্রমিকশ্রেণীর কাজে লাগানো যায়।

এইখানে বলা প্রয়োজন দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে এর ভিতর দিয়ে সমাজের পরিবর্তন করা যায়। এরপর আর একদল নকশালপন্থীরা বলল নির্বাচনে শোষিতের স্বার্থে কোন উপকার হয় না। আমরা দেখেছি যুক্তফ্রন্ট-এর আমলে তদ্বিরের দৃষ্টি ভংগি ছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি তা কাটানো গেছে। পশ্চিমবাংলায় শ্রমিক-কৃষকের চিন্তা-চেতনা অদভুতভাবে বেড়েছে। পশ্চিমবাংলায় শ্রমিক আন্দোলনে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা মনে করেন, অর্থনীতিবাদ থেকে সে আন্দোলনকে রাজনৈতিক স্তরে উন্নত করা গেছে। দুর্গাপুর এর প্রমাণ। যদিও সংগ্রামে শ্রমিকরা পিছু হঠেছে, তবু তাদের মধ্যে হতাশা আসে নি। যেমন গ্রামাঞ্চলে গত ২ বছরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছিল। আগে কৃষক আন্দোলন মূলতঃ মাঝারী কৃষকের হাতে ছিল। গরীব মানুষেরা পুরোভাগে ছিল না। ১০/১২ লক্ষ বিঘা খাস-বেনামী জমি দখল তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল, গ্রামাঞ্চলের কোটি কোটি গরীব মানুষ আত্ম-চেতনা বোধ নিয়ে মাথা উচু করে জেগে উঠে দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমবাংলায় দেখেছি যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাংগল তখন তারা ভেবেছিল কেরালার মত সরকার এখানে করা সম্ভব। ১৭ই মার্চের ঘটনা কেরালার মত হয় নি। মিনি ফ্রন্টের চক্রান্ত ১৭ই মার্চ ব্যর্থ করে দিয়েছে। বিপ্লব হঠাৎ হয় না, একটা নিরবিচ্ছিন্ন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে হয়। ১৭ই মার্চের পর থেকে শাসকশ্রেণী মনে করল পশ্চিমবাংলায় কেবলমাত্র সরকার ভেংগে দিয়ে পাল্টা সরকার করা যাবে না। তাই, শুরু হলো পেটাই। পেটাই হলো গ্রামাঞ্চলে বেশী। ১৯৬৭-তে পেটাই হয়েছিল শহরে। আমাদের শ্লোগান হলো, অর্জিত অধিকার বজায় রাখতে হবে। স্মরণ করুন কমরেড হো-চি-

মিন বলেছিলেন, প্রয়োজন হলে আরও ২০ বছর ভিয়েতনামের মানুষকে রক্ত দিতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতি কি? কিছু পাওয়া যাবে না বললেও আজ মিছিল করা যায়। আর একটি শ্লোগান হলো, মামলা রুজু হলেও ধরা দেওয়া যাবে না। বর্তমানে রাষ্ট্র বিপ্লব না ঘটলেও হাই কোর্টের অর্ডার কৃষকরা আর মানে না। বর্তমানে যখন বলা হয়েছে—পালাবে না আর ধরা দেবে না, তখন কিছু কিছু জায়গায় তা করা সম্ভব হয়েছে। ৭০ হাজার কৃষকের নামে ওয়ারেন্ট আছে, ১০ হাজার ধরা পড়েছে। তৃতীয় শ্লোগান হলো, মিনি ফ্রন্ট করতে আমরা দেবো না। জুলাই মাস পর্যন্ত ওরা মনে করেছিল পেটালে মানুষের মনে হতাশা আসবে, প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হ্রাস পাবে। ইতিমধ্যে বাংলা কংগ্রেস এবং দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারবে। ১৪ই জুলাই সর্বাত্মক হরতাল হলো: অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর ২য় স্তরের চক্রান্ত ব্যর্থ হলো, সংগ্রাম ৩য় পর্যায়ে উঠল। ২য় স্তর শেষ হ'ল অ্যাসেম্বলী ভাঙ্গার মধ্যে।

শাসকশ্রেণী মনে করল অল্প সময়ে প্রচণ্ড অত্যাচার চালাতে হবে। তাই, ১৪৪ ধারা থাকা সত্ত্বেও আগেও মিছিল হয়েছে, কিন্তু বিজুড়ের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালালো। সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট এই স্তরে দুর্গাপুরে শাসকশ্রেণী তার নতুন কৌশল প্রয়োগ করলো। বিজুড়ে ৬০০।৭০০ পুলিশ থাকা সত্ত্বেও ৩০।৪০ হাজার লোকের মিটিং হ'ল। কোন তীর ধনুক তারা সে দিন—না আনবার নির্দেশ ছিল। কিন্তু সে দিন তারা একটা প্রশ্ন করেছিল, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে যাব, কিন্তু গায়ে পড়ে আক্রমণ করলে আমরা কি করব? এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ কথা। দুর্গাপুরে একই জিনিস আমরা দেখলাম। সরকারী কর্মচারীদের সংগ্রাম খুবই বীরত্বপূর্ণ। ৩য় স্তর এখানে শেষ হ'ল। ৪র্থ স্তর আরম্ভ হ'ল।

এই সব স্তর ঐতিহাসিক স্তর নয় এটা সিঁড়ির ধাপের মত। শাসকশ্রেণী যা আশা করেছিল—জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে হারিয়ে দেবে, দাবিয়ে দেবে—তারা তা পারে নি। সেই জন্য তারা আরও প্রচণ্ড আক্রমণ, অল্প সময়ের মধ্যে ঘণীভূত আক্রমন শুরু করল। বর্তমান ৪র্থ স্তরে শুরু করেছে —বিশেষত গ্রামে। গ্রামে আক্রমণ সার্থক হলে, তারা তাদের পরিকল্পনায় অংশত সফল হবে। আজ তাই পি ডি অ্যাক্ট চালু করা হয়েছে। মিলিটারী আজ প্রস্তুত। কিন্তু মিলিটারী নামালে সারা পৃথিবীতে কংগ্রেস সরকারের প্রগতিশীলতার মোড়ক রাখা আর চলবে না। কিন্তু আজ ক্ষেত্র

প্রস্তুত করা হচ্ছে। জেল বাড়ানো হচ্ছে। নতুন পুলিশ রিক্রুট করা হচ্ছে। ২৫০০০-এর উপর সি. আর. পি. আট মাস ধরে পশ্চিমবাংলায় আছে।

কংগ্রেস এই সঙ্গে বুঝেছে, কংগ্রেসের নামে আর প্রচার চলানো যাবে না। ব্যাংক জাতীয়করণ বা প্রিভি পার্সের কথা বলে পশ্চিমবাংলাকে ভুল বোঝানো যাবে না। সংশোধনবাদী দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ও কয়েকটি মধ্যবিত্ত পার্টি মুখে সমাজতন্ত্র ও বামপন্থীর বুলি আউড়ে ইতিহাসের শিক্ষা নিতে অস্বীকার করছে এবং শাসকশ্রেণীর হস্তকেই শক্তিশালী করছে। ইতিহাসের শিক্ষা এ ব্যাপারে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। প্লেখানভ কম বড় নেতা ছিলেন না। কমরেড লেনিনের দূর দৃষ্টি ছিল বলে ১৯০২ সালের পর থেকে তিনি প্রচার করেছেন সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে। ১৯১৭ সালের আগে মেনশেভিকরা গভর্ণমেন্টের সাথে এক হয়ে যায় নি। শাসকশ্রেণী যতদিন পর্যন্ত নিজে সাক্ষাৎ ভাবে পারবে ততদিন তাঁরা শোধনবাদীদের আপন স্বার্থে ব্যবহার করবে না। কমরেড লেনিন এদের বলেছেন, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে 'ধনিকশ্রেণীর এজেন্ট'। ১৯৩৭ সালের আগে ধনিকশ্রেণী মেনশেভিক পার্টিকে ডাকে নি। প্রথমে ক্যাডেট এবং পরে মেনশেভিকদের নিয়ে গভর্ণমেন্ট হ'ল, তারপর ক্যাডেটদের বাদ দিয়ে শুধু মেনশেভিকরা সরকার করল। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময় এদের হাতে ক্ষমতা ছিল। একই জিনিস দেখা গেল ১৯১৮ সালে জার্মানীতে। কাইজারের পতনের পর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের ডাকা হোলো।

বর্তমানে আক্রমণ হচ্ছে তিন পার্য্যায়ে

১) পুলিশের আক্রমণ, ২) বিভেদের আক্রমণ, ৩) ব্যক্তি হত্যা।

এ ব্যাপারে একটা কথা বোঝার আছে। মাস তিনেক আগে থেকে ফিজিক্যাল এক্সটারমিনেশন (শারীরিকভাবে ধ্বংস করা) শুরু হ'ল। ভারতের রাজনীতিতে এই প্রথম আমদানী। নকশালপন্থী পাঞ্জাবে আছে, কিন্তু সেখানে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীকে খুন করা হচ্ছে না। কারণ অন্যান্য প্রদেশে শাসকশ্রেণীর সেই প্রয়োজন নেই। এই প্রয়োজন এখানেও আগে ছিল না। একে বলে ত্রিমুখী আক্রমণ। মারের ভয় দেখিয়ে কর্মীদের ঘরে বসিয়ে দিতে পারলে ওদের লাভ। জিনিসপত্রের দাম কমাতে হবে। বেকারী দূর করতে হবে। সেই সঙ্গে কমিউনিস্টদের খুন কর। ঝাড়খণ্ড, উত্তরখণ্ড, মুসলিম লীগের অনুপ্রবেশ যদি রাজনীতিগতভাবে পর্যুদস্ত করতে না পারি তাহলে কিছু করা যাবে না। সমাজ-তন্ত্রের নাম যারা মুখে করে তার বিরোধীতা করে তাদের স্বরূপ উদঘাটন

না করা যায়, তাহলে সংগ্রাম স্বার্থক হবে না। কারণ এটা সংগ্রামের অংশ।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত খুন-খারাপি যা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে, নকশালের নাম দিয়ে এখানে এ জিনিস করা হচ্ছে। শুরু হল হঠকারীতা দিয়ে। হঠকারীরা যখন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন তারা শত্রুর গুপ্তচরে পরিণত হয়। ট্রট্স্কি পলিটব্যুরোর সদস্য হিসাবে যদি সাম্রাজ্যবাদের দালাল, ফ্যাসিবাদের দালালে পরিণত হতে পারে, তবে চারু মজুমদার, কানু সান্যালও তা হতে পারে। নকশালপন্থী নেতারা আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে সেই একই কাজ করেছে। ১৯৬৭ সালের আগে ভুল হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু এখন যা হচ্ছে তা বুর্জোয়াদের দালালের কাজ। শ্রমিক বিপ্লব করবে না, কৃষক বিপ্লব করবে না, বিপ্লব করবে ছাত্ররা।

নকশালপন্থীদের কাজ হল তিনটি

১) মার্কবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের খুন করা ; ২) স্কুল কলেজ বন্ধ করা ; ৩) সাধারণ পুলিশকে খুন করা।

নকশালদের সম্পর্কে যে ঘৃণা থাকা উচিত, এখনও সে ঘৃণা সৃষ্টি করা যায় নি। এরা তো ভুল করেও কংগ্রেসকে খুন করে না। একটা করেছে, তার জন্য ৮ জনকে প্রায়শ্চিত্ত দিতে হয়েছে। এর প্রমাণ আছে ইটা চুনা কলেজে। নকশাল করছে গ্রামের যুব কংগ্রেস। আমাদের খুন করলে খুশী হবে সাম্রাজ্যবাদ, কংগ্রেস, সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেস। গান্ধিজীর সাথে সন্ত্রাসবাদীদের বিরোধ ছিল, কিন্তু তারা গান্ধীবাদীদের তো খুন করে নি।

রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেংগে কি বিপ্লব হবে? এটা ঘটনা যে স্কুল কলেজে শিক্ষার অনেক ত্রুটি। প্রশ্ন হচ্ছে স্কুল কলেজ খোলা থাকলে আমার লাভ হবে কিনা? ১৯৪৫ সালে সরকার স্কুল কলেজ বন্ধ করে দিয়েছিল। ১৯৫৯ সালে করেছিল। ১৯৬৬তেও করেছিল। নকশালের কথা বিশ্বাস করলেও স্কুল কলেজ খোলা রাখা দরকার। ছাত্ররা গণ-আন্দোলনের নেতা নয়, কিন্তু এদের রাজপথে সামিল করে দিলে এরা প্রচণ্ডভাবে কাজ করে। স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে গেলে ছাত্র হিসাবে এরা কাজ করতে পারে না। স্কুল কলেজ বন্ধ করতে চায় সাম্রাজ্যবাদ, ইন্দিরা গান্ধী, বি. বি. ঘোষ [রাষ্ট্রপতির শাসনকালে ১৯৭০-৭১-এ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের উপদেষ্টা।]

বর্ত্তমানে সরকার নির্দেশ দিয়ে স্কুল কলেজ বন্ধ করতে চায় না, কিন্তু অপরকে দিয়ে তা করাতে চায়। সি. আর. পি. এবং বাংলা পুলিশের মধ্যে একটা ঐক্য গড়ে তোলার জন্য পশ্চিমবাংলার পুলিশকে খেপানো হচ্ছে।

এই জন্যই পুলিশ মারা হচ্ছে। ভুল করে নিজের লোককে মারা যায় না। পুলিশের বড় অফিসারকে ওরা মারছে না। আপনারা বলবেন, নকশালপন্থীরাও খুন হচ্ছে। তা তো হবেই। ইতিহাসের শিক্ষাও তাই। সাধারণ পুলিশকে আর অফিসারকে পৃথকভাবে দেখা—এটা মার্কসবাদের চিরকালের কথা। কংগ্রেস নকশালদের সার্টিফিকেট দিচ্ছে। অজয় মুখার্জি সার্টিফিকেট দিচ্ছে, আর সি পি আই ওদের ঠিকাদারী নিয়েছে। তাই, এই ত্রিমুখী আক্রমণ।

পশ্চিমবাংলা আজ ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। ফসল রক্ষার সংগ্রাম এখন কেন্দ্রীয় সংগ্রাম। কৃষক তুমি লড়াই কর, আমরা তোমার পাশে আছি—এটা আজ আর আপ্ত বাক্য নয়। ফসল কাটার সংগ্রামকে যদি আমরা সফল সংগ্রামের রূপ দিতে পারি, সংগ্রাম আরো অগ্রসর হবে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন আজ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিভক্ত। এ অবস্থা থাকতে পারে না। এর পরিবর্তন হতে বাধ্য। যে পার্টি কমরেড় লেনিন সৃষ্টি করলেন, সেই পার্টি এত জঘণ্য হয়ে গেল! তা হতে পরে না। চীনের পার্টির অবস্থাটাই বা মানব কি করে? চীনের নেতাদের কথা অনুযায়ী আমরা বলতে পারি, যে মানুষ অপরের কাছে নিজের মাথাটা দিয়েছে সে আর যাই করুক, সে বিপ্লব করতে পারবে না। এটা ভিয়েতনাম বুঝেছে। ১৯৫০ সালে যখন কোরিয়া আক্রান্ত হয়েছিল, তখন চীন ভলেন্টিয়ার পাঠিয়েছিল। রাশিয়া সাহায্য করেছিল। আজ যখন ভিয়েতনামের পার্টিকে বলতে হয়, প্রয়োজন হলে বিশ বছর লড়াই, এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। ইন্দোনেশীয়ার পার্টি মার খেয়েছে, এ ব্যাপারে সবার দায়িত্ব আছে। তাই ইন্দোনেশীয়ার থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিৎ।

যুবক যারা তারা একটু অগ্রণী হয়। এই ট্রেড ইউনিয়নের সহযোগিতা, কৃষক সভার সহযোগিতা তাদের করা দরকার। প্রশ্ন হচ্ছে শাসকশ্রেণী গ্রামে পুলিসকে কেন্দ্রীভূত করতে পারবে কিনা তা নির্ভর করবে পুলিসের একটা অংশকে শহরে ব্যস্ত রাখা যাবে কিনা তার উপর। তাই, চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের একটা গুরুত্ব আছে। কৃষকের ফসল রক্ষার সংগ্রামের প্রচণ্ড গুরুত্ব আছে। তাই, কৃষকের সমর্থনে যুবকরা অর্থ সংগ্রহে এগিয়ে আসবেন।

পরিস্থিতির মূল্যায়ণ করার জন্য আমি এখানে যে কথা বলেছি তা একজন সাথী হিসাবে। আমরা যেন সেই ভাবে প্রস্তুত হতে পারি, যে পশ্চিম-বাংলার উপর আঘাত এলে ভারতের ৫০ কোটি লোকের হৃদয়তন্ত্রে তা আঘাত করবে এবং গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, যা হচ্ছে একটি সজীব সংগঠন। আজ আমি এই বলে আপনাদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলাম।

—যুবশক্তি, সেপ্টেম্বর, ১৯৭

১২ কৃষক আন্দোলনের কঠিন সমস্যা

একদিকে মাত্রাহীন ধাপ্পাবাজী, আকাশ-ছোঁয়া মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও বেপরোয়া কুৎসা, অন্য দিকে ক্রমবর্ধমান আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস, গুণ্ডামী ও পুলিসী হামলা এবং জনসাধারণের উপর আগের চেয়ে অনেক দ্রুত ও ভারী শোষণের এবং লুণ্ঠনের বোঝা চাপানো হচ্ছে। যত জোরে গরীবী হঠানোর চীৎকার করা হচ্ছে, তত দ্রুত জিনিসপত্রের দাম ও বেকারী বাড়ানো হচ্ছে। মানুষের প্রতি যত দরদের ভান করা হচ্ছে, তত বেশী রিলিফের ব্যাপারে খরা-পীড়িত দুঃস্থ জনগণকে নিয়ে ব্যংগ করা হচ্ছে এবং স্বল্প রিলিফ নিয়ে দলবাজী ও দুর্নীতি চালানো হচ্ছে। কৃষির উন্নতির ও গ্রামে বিদ্যুতের ঝলকানির কথা বলে সারের দর বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং গরীবের কেরোসিনের আলোকে নিভিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। যত নাটকীয় ভংগীতে ভূমিসংস্কারের বাগাড়ম্বর করা হচ্ছে, তত জোরে খাস জমি, উদ্ধার করা বেনামী জমি এবং ভাগের জমি থেকে প্রকৃত দখলকার কৃষকদের উচ্ছেদ করার ও ফসল লুট করার চেষ্টা হচ্ছে এবং গরীব ও মাঝারী চাষীর খাজনা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সংগে সংগে জনসাধারণ যাতে এই সব আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বা আন্দোলন করতে না পারে তার জন্য পুলিসের হাতকড়া, ডাণ্ডা ও রাইফেল এবং গুণ্ডা মস্তানদের ছুরি, পাইপগান ও পিস্তল দিয়ে তাদের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেবার অপচেষ্টা চলছে। এক কথায় "জনকল্যাণের" চীৎকারের আড়ালে দেশের জনগণকে হাত পা বেঁধে গলা টিপে জোতদার-মহাজন ও বৃহৎ পুঁজির যূপকাষ্ঠে বলি দেবার অপচেষ্টা হচ্ছে। পশ্চিমবংগের জনগণ অপেক্ষাকৃত সচেতন, সংগঠিত ও সংগ্রামী শক্তির ধারক। তাই, ব্যাপক সন্ত্রাস ও গুণ্ডামীর দ্বারা তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার চক্রান্ত হচ্ছে। পশ্চিমবংগের নির্বাচনে জালিয়াতি ও গুণ্ডামী করে ক্ষমতা দখলের পর জনগণ সম্বন্ধে ভীত সন্ত্রস্ত কংগ্রেসী শাসকদের এটাই হোল প্রধান চরিত্র।

১৯৭০ সালের মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেবার পর হতে এই আক্রমণ বাড়তে থাকে এবং জনগণের প্রতিরোধের মুখে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসী শাসকেরা হিংসায় উন্মত্ত হয়ে ১৯৭২ সালের নির্বাচনের সময় তাকে এক নূতন স্তরে তোলে। দমননীতি ব্যবস্থার পরিধির মধ্যে থাকত। দুর্নীতি

থাকলেও নির্বাচন হত, জনগণের অত্যাচার সব সময় থেকেছে এবং সময়ে সময়ে তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, তথাপি বিধানসভাকে সংসদীয় স্বার্থে সীমাবদ্ধভাবে হলেও তা ব্যবহার করা যেত। এখন সন্ত্রাস ও গুণ্ডামীকে সেই পরিধীর বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভারতের বেশীর ভাগ জায়গায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আপেক্ষিক দুর্বলতার জন্য, কংগ্রেসী শাসকেরা নতুন ধাপ্পাবাজী দিয়ে জনগণকে সাময়িকভাবে ভোলাতে পেরেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক শক্তি দ্রুত বিকাশ লাভ করেছিল বলে এখানে তাদের সে অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে তারা তা দেখেছে; ১৯৭২ সালের নির্বাচনে আবহাওয়ায় তারা নিশ্চিত পরাজয়ের গন্ধ পেয়েছিল। তারা বুঝেছিল যে, ভারতের অন্যান্য বহু স্থানের জনগণ সাময়িকভাবে ভুললেও বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সংকটের চাপে তারা নূতন করে মোহমুক্ত হয়ে গণ-সংগ্রামের মধ্যে নেমে পড়বে। তখন পশ্চিমবঙ্গের শক্তি-শালী গণশক্তি বেঁচে থাকলেও তা তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকবে ও বিকল্প পথের সন্ধান দেবে। তাই, কংগ্রেসী শাসকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রকেই হত্যা করেছে এবং আরো বেশী সন্ত্রাস ও গুণ্ডামীর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক শক্তিকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ধ্বংস করতে চায়। এই ভাবে না দেখলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী শাসকদের হিংস্রতাকে বোঝা যাবে না।

এমনি পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব ও কঠিন কর্তব্য উপস্থিত হয়েছে। এই গণতান্ত্রিক শক্তির অন্যতম প্রধান অংশ এবং সংখ্যা ও ব্যাপকতার দিক দিয়ে দেখলে সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ হোল সংগঠিত কৃষক আন্দোলন। প্রধানতঃ, পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছরে কৃষক আন্দোলনের দ্রুত বিকাশই এখানে শ্রেণী সম্পর্কের ভারসাম্যকে শাসকশ্রেণীর বিপক্ষে বিশেষভাবে পরিবর্তিত করেছে। গ্রামাঞ্চলে শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভাবের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গেছে। ১৯৬৭ সালের আগে পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সাধারণভাবে দেখতে গেলে কংগ্রেসের প্রভাব বেশী ছিল। পরবর্তী সময়ে সেটাই ভেঙে গেছে। কমরেড লেনিন, লক্ষ লক্ষ গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর—তাদের বিপ্লবী শক্তির বিকাশের গুরুত্বের উপর অত্যন্ত জোর দিয়েছিলেন, আমাদের দেশে যাদের সংগঠিত শক্তির দুর্বলতা ছিল, গণতান্ত্রিক শক্তির বড় দুর্বলতা—সেই অগণিত গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুররা অতীতের জড়তা কাটিয়ে নূতন চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে ইতিহাসের স্রষ্টা রূপে ও সংগঠিত শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। এটাই হয়ে উঠেছে জমিদার-পুঁজিপতি শোষকদের প্রতিনিধি কংগ্রেসী শাসকদের কাছে সবচেয়ে ভয়ের বস্তু। যখন এদের আর ভুলিয়ে স্বেচ্ছায়

গোলামে পরিণত করা যাচ্ছে না, তখন এদের পিটিয়ে, খুন করে ও ভয় দেখিয়ে গোলাম বানাতে হবে—এটাই হোল কংগ্রেসী শাসকদের নীতি। এরই ফলে সমগ্র পরিস্থিতিতে নূতনত্ব দেখা দিয়েছে।

আজকের দায়িত্ব ঠিকমত বুঝতে হলে সংক্ষেপে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনের বিকাশের ধারাকে স্মরণ করা প্রয়োজন। ১৯৩০-৩২ সাল হতে ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন প্রধানতঃ ছিল, রায়ত কৃষক ও প্রজাদের আন্দোলন। তখনও এটা আক্ষরিক অর্থে জমির সংগ্রাম ছিল না বটে, কিন্তু তা ছিল জমির সঙ্গে সম্পর্কিত ভাগের দাবীর আন্দোলন। এর থেকেই ধাপে ধাপে জমির অধিকারের প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রথম বর্গাচাষীরা ব্যাপকভাবে সংগ্রামের পুরোভাগে এল। ক্ষেতমজুরেরাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের পটভূমিকায় এই সংগ্রাম এক জাতীয় সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে তখন এই সংগ্রাম তেমন ব্যাপকতা লাভ করতে পারে নাই, বড় বড় জোতদার-প্রধান বিশেষভাবে জলপাইগুড়ি জেলায় এবং ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুরে তা কিছুটা বিস্তার লাভ করেছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর পশ্চিমবঙ্গে উপরোক্ত সংগ্রামের ঐতিহ্য বহন করে ১৯৪৮-৫০ সালে বড় জোতদার-প্রধান জেলাগুলিতে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ও ভাগের জন্য আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু তখনও এই সংগ্রাম ছিল প্রধানতঃ অল্প এলাকায় বর্গাদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

১৯৫৪-৫৫ সাল হতে অর্থাৎ জমিদারী ক্রয় আইন পাশের পর হতে সর্বত্র ব্যাপক উচ্ছেদ কৃষক আন্দোলনের সামনে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে উচ্ছেদ বিরোধী সংগ্রাম সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। বর্গাদার রেকর্ডের এবং ভাগের দাবীতেও আন্দোলন হয়। কিন্তু, এই শেষোক্ত দাবীর আন্দোলন সর্বত্র ব্যাপকতা লাভ করে না। ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুরের কিছু শক্ত বর্গাদার প্রধান এলাকা ছাড়া অন্যত্র রেকর্ডের আন্দোলন তেমন দানা বাঁধতে পারে নাই। কারণ, রেকর্ড করতে গেলে উচ্ছেদ বেড়েছে, অথচ তা প্রতিরোধের মত সংগ্রামের শক্তি গড়ে ওঠে নাই। প্রতি বছরে চাষ এবং ফসল কাটার সময় উচ্ছেদ প্রতিরোধ সমস্যা ও ফসল রক্ষা করা সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রশ্নে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস সরকারের আইনের আসল শ্রেণী চরিত্র কৃষকদের সামনে ফুটে উঠতে লাগল। এমনই ভূমি-সংস্কারের আইন হোল, জমির সিলিং ও বর্গাদারের অধিকার সম্বন্ধে এমনই বিধান হল, যে উদ্বৃত্ত জমি ও বেশী ভাগ পাবার বদলে কৃষকদের মাথায় নেমে এল উচ্ছেদের খড়্গ। কৃষকেরা যখন আইনে প্রদত্ত অধিকারগুলি আংশিক-

ভাবে কার্যকরী করার চেষ্টা করছে, তখন সরকার তাদের বিরুদ্ধে চালিয়েছে উৎকট দমননীতি। ফলে "দখল রেখে চাষ কর ও ফসল রক্ষা কর" এই আওয়াজ হয়ে দাঁড়াল সাধারণ রণধ্বনি। ভাগের সংগ্রাম জমি রক্ষার সংগ্রামে পরিণত হল। এই সংগ্রাম শুধু মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা প্রভৃতির কিছু অংশে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রায় সব জেলাতেই ছড়িয়ে পড়ল, যদিও তখন পর্যন্ত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। জমি সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে এইভাবে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে কৃষক আন্দোলন এক ধাপ এগিয়ে গেল।

উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের সংগে সংগে জমির আন্দালনে এক নূতন দাবী ও আওয়াজ দেখা দিতে লাগল, যা ১৯৬৭ সালের পরবর্তী যুগে অত্যন্ত গুরুত্ব অর্জন করেছে; তা হোল খাস জমি বিলি ও বেনামী জমি উদ্ধারের আন্দোলন। ১৯৫৮ সাল হতে এই আন্দোলন এগুতে লাগল। যে জেলাগুলিতে অনেক দিন হতে বর্গাদার আন্দোলন হয়েছে, স্বভাবতঃ সেই ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর প্রভৃতিতেই এই আন্দোলন প্রথম দানা বেঁধেছে। ভূমিসংস্কার আন্দোলনের এটা একটা নূতন পদক্ষেপ ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এতদিন পর্যন্ত বর্গাদারদের দখলে থাকা জমিগুলিতে ভাগ দখল রক্ষা করাই ছিল প্রধান সংগ্রাম। এই প্রথম সুরু হোল জোতদার-জমিদারদের বাড়তি জমি বন্টনের জন্য সংগ্রাম। আইনতঃ যে সামান্য পরিমাণ জমি খাস হয়েছিল, অথচ যেগুলি কংগ্রেস সরকার জোতদারদেরই দখলে রেখে দিয়েছিল, সেগুলি জমিহীন বা ভাগ দখলদার কৃষকদের মধ্যে বিলি করার এবং বেনামী জমি উদ্ধার করার জন্য সংগ্রাম শুরু হোল। বড় জোতদারদের যে জমি বেনামী বলে সন্দেহ হয়েছে সেগুলি দখলে রাখা, তার ভাগ না দেওয়া এবং সরকারকে আইন অনুযায়ী তদন্ত করতে বাধ্য করা ছিল আন্দোলনের কৌশল। তার জন্য প্রতি বৎসর হাজার হাজার কৃষককে গ্রেপ্তার হতে হয়েছে, অনেককে মার খেতে হয়েছে, ২।১ জন করে খুনও হতে হয়েছে। এর ফলে কিছু পরিমাণ জমি প্রকৃতই উদ্ধার করা গিয়েছিল। যদিও এমনি আন্দোলনের ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ এবং সাফল্যও ছিল সীমাবদ্ধ, তথাপি এটা কৃষক আন্দোলনে একটা নতুন পদক্ষেপের সূচনা করল।

এভাবে অতীত হতে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কৃষক আন্দোলন ধাপে ধাপে নূতন স্তরে উঠেছে, কংগ্রেস সরকারের আইন ও তার প্রয়োগের শ্রেণী চরিত্র সম্বন্ধে কৃষকদের সংগ্রাম লব্ধ তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং সংগে সংগে তাদের সংগ্রামের মনোভাবও বেড়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার একটি ঘটনায় দেখা

গেল কীভাবে কৃষকদের অভিজ্ঞতা ও চেতনা বাড়ে। এখানে বর্গাদাররা আধা ভাগও পেত না। ১৯৬৫ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আইনে বর্গাদারের অধিকার সম্বন্ধে এক ইস্তাহার প্রচার করে। এতে বিশ্বাস স্থাপন করে নবগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী থানার গরীব বর্গাদারেরা রসিদ ও আর মাত্র আধা-আধি (৬০।৪০ নয়) ভাগ দাবী করে। জোতদারেরা ক্ষিপ্ত হয়ে শুধু ধানই লুঠ করলো না, সংগে সংগে কৃষকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা শুরু করে দেয়। যে শাসনতন্ত্রই ইস্তাহার দিয়েছিল, সেই শাসন-যন্ত্রই পুলিসকে সর্বতোভাবে জোতদারদের সাহায্য করল। এমনি বহু অভিজ্ঞতা কৃষকদের চেতনা ও সংগ্রামী শক্তির বিকাশে সাহায্য করল।

কৃষকদের এই শক্তি ও চেতনাই ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করতে সাহায্য করল। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন এবং ১৯৬৯ সালে আরো উন্নত পর্যায়ের যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা কৃষক আন্দোলনের দুর্বার অগ্রগতির অনুকুল পরিস্থিতি সৃষ্টি করল। পশ্চিমবংগে সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন কংগ্রেসকে পরাজিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলেই এখানে যুক্তফ্রন্ট সরকারের চরিত্র ছিল সংগ্রামী। এই সব আন্দোলনের নেতা ও সংগঠক মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ছিল যুক্তফ্রন্টের প্রধান শক্তি। এই সরকার জনগণের মনে অলীক আশা সৃষ্টি করে নাই; জনগণের সংগ্রামের উৎস মুখ খুলে দিতে সাহায্য করেছিল মাত্র। গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিসের অত্যাচার বন্ধ করে এই সরকার এক তাৎপর্যপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।

এই প্রসংগে একটা কথা পরিস্কার বোঝা দরকার। এই সরকার গণ-আন্দোলনের বিস্তৃতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল; কিন্তু আন্দোলন করেছে সংগঠিত গণশক্তি। অতীতে নানা বাধা ও পুলিসী আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে কৃষক আন্দোলন ধাপে ধাপে যে স্তরে উঠেছিল, তাই পরবর্তী অনুকূল পরিস্থিতিতে ব্যাপক অভিযানের ভিত্তি তৈরী করেছিল। বাঁধ ভাঙা বন্যার মত কৃষক আন্দোলন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। শুধু মাত্র স্বল্প সংখ্যক অগ্রণী কৃষকই নয়, প্রতি জেলায় ও এলাকায় অগণিত গরীব কৃষক এবং ক্ষেতমজুর সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে জেগে ওঠার মত গোলামীর মনোভাব ছেড়ে মাথা তুলে দাঁড়াল। এরা নিজেদের মধ্যে নূতন শক্তির সন্ধান পেল। এরা শুধু সংগ্রামী শক্তিরই পরিচয় দিল না, গোলাম, সমাজের ক্লেদ ও ক্লীবত্ব দূর করে নূতন মনুষ্যত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করল। আন্দোলনের জোয়ারে কিছু কিছু ভুল হয়নি তা নয়, কিন্তু তা বড় ছিল না। আমি নিজে গরীব কৃষকদের বুদ্ধি, চেতনা ও নেতা হবার যোগ্যতা

দেখে অভিভূত হয়েছি। জোতদার-জমিদারদের বিচ্ছিন্ন করে সাধারণ মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ আমি দেখেছি। ছোটখাটো ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিলেই তারা দ্রুত শুধরে নিতে চেষ্টা করেছে।

১৯৬৬ সাল পর্যন্ত আন্দোলন যে স্তরে উঠেছিল, তারই উপর দাঁড়িয়ে এই সময়ে সংগ্রাম এগিয়ে গেল। একটা একটা করে ফুলের পাপড়ি খোলার মত কৃষকদের সংগ্রামী শক্তি ও চেতনা ধাপে ধাপে, অথচ দ্রুতগতিতে বেড়েছে। এক বছরের অভিজ্ঞতা এক মাসে, এক দিনে হয়েছে। প্রথম স্তরে সর্বত্র উচ্ছেদ বন্ধ করা হয়েছে, তারপর সংগ্রাম উঠেছে খাস জমি বিলির স্তরে। লক্ষ্য করতে হবে যে, সরকার এই সব কাজে সাহায্য করেছে মাত্র, কিন্তু কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে দ্রুতগতিতে করেছে সংগঠিত কৃষকরা।

পরবর্তী ধাপে ১৯৬৯ সালে সংগ্রাম আরো ব্যাপক ও উচ্চ স্তরে উঠেছে। যে সব জেলায় খাস জমি বিলির কাজ শেষ হয় নাই, তা শেষ করে অতি দ্রুত আন্দোলন বেনামী জমি উদ্ধারের স্তরে সর্বত্র উঠে গেল। সত্যকারের ভূমিসংস্কারের পথে এ এক বিরাট পদক্ষেপ। আইন ও প্রশাসন যা করতে পারে নাই, জাগ্রত কৃষক তাই করতে লাগল। কৃষকদের শ্রেণী চেতনাবোধ বেড়ে চলল, তাদের আত্মবিশ্বাস আরো বাড়ল। বুর্জোয়া আইন কানুন, বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কৃষকদের একটা মোহ থাকে ও ছিল। বিশেষ করে বিচার ব্যবস্থার শ্রেণী চরিত্র সম্বন্ধে তাদের সঠিক চেতনা বোধ ছিল না। জোতদাররা বেনামী জমি বাঁচাবার জন্য যখন বিচার ব্যবস্থার অপ-ব্যবহার করতে লাগল (এলোপাথাড়ি ইনজাংশন দ্বারা) তখন কৃষকরা প্রথম একটু থমকে দাঁড়ালেও শীঘ্রই এই বাধা অপসারিত করে ন্যায় নীতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে গেল। কমরেড কার্ল মার্কস বলেছেন, যে মানুষ যেমন নিজের কাজের দ্বারা পারিপার্শ্বিককে বদলায়, তেমনি তার মধ্য দিয়ে সে নিজেকেও বদলায়। তারই অদ্ভুত প্রমাণ দেখা গেল—জমির সংগ্রামের বাধা অপসারিত করতে গিয়ে কৃষক তার নিজের চেতনাকেই বদলাতে লাগল। বিচার ব্যবস্থারও শ্রেণী চরিত্র সে বুঝতে সুরু করল।

এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণ আরো এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগল। তা হোল, কৃষকদের সংগঠিত সংগ্রামের সাহায্য ছাড়া উপর হতে আমলাতন্ত্রের দ্বারা কোন ভূমিসংস্কার কার্যকরী করা যায় না। এই অভিজ্ঞতা সারা ভারতে গণতান্ত্রিক শক্তির প্রসারে সাহায্য করেছে।

আমি এই প্রবন্ধে ১৯৬৭-৭০ সালের সময়ের কৃষক আন্দোলনের বিরাট সাফল্য—উচ্ছেদ বন্ধ, খাস জমি বিলি, বেনামী জমি উদ্ধার, চোরাবাজারী সংকুচিত করা, মজুরী বৃদ্ধি—প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করছি না। তা

বহুবার আলোচিত হয়েছে। আমি কৃষক আন্দোলনের ব্যাপকতা, তীব্রতা, উচ্চ স্তরে উন্নয়ন এবং পুরানো যুগের অন্ধ, ভীরু গরীব কৃষকের আত্মবিশ্বাসে ভরপুর জাগ্রত নূতন কৃষকে রূপান্তর—এই সবের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। জমির সংগ্রামে কৃষক সমাজের বেশীর ভাগ অংশ নীচের তলাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে এল। জমিহীন মজুর শুধু জমির সংগ্রামে এগিয়ে এল না, গ্রামের গরীবের ঐক্যের পটভূমিকায় সে মজুরীর ও কাজের সংগ্রামে এবং মজুতদার বিরোধী আন্দোলনে তারা এগিয়ে গেল। কংগ্রেস শাসনে যে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, তাদের সক্রিয় ভূমিকাও আরো স্পষ্ট ফুটে উঠতে লাগল। খেতমজুর আন্দোলন এখনও দুর্বল, তবু তা এগিয়েছে।

আমাদের গ্রামগুলি দারিদ্র পীড়িত, বিষাদময় বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু, এই মানুষগুলির চিন্তায়, চেতনায় ও সংগ্রামী শক্তির বিকাশে বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে। স্বেচ্ছায় গোলামীকে মেনে নেবার মত পুরনো কৃষক আর নাই, তা আর কোন দিন ফিরে আসবে না। গরীব কৃষকদের মেরে কেটে সাময়িকভাবে দাবিয়ে রাখা যেতে পারে, কিছু দিন তার মুখ বন্ধ রাখা যেতে পারে, কিন্তু তাকে দিয়ে স্বেচ্ছায় গোলামী বানিয়ে নেওয়া যাবে না। এখানেই কংগ্রেস শাসকদের ভয়, আর এখানেই গনতান্ত্রিক শক্তির ভবিষ্যৎ। সমাজের প্রগতিশীল পরিবর্তনে আগ্রহী যে কোন গণতান্ত্রিক মানুষ গ্রামের কৃষকদের এই পরিবর্তনে খুশী না হয়ে পারে না। কিন্তু, শ্রেণী-সংগ্রামের এই তীব্রতার জন্য জোতদার-জমিদারেরা এবং সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের দল আতংকিত হয়ে উঠল। এর মধ্যে তারা তাদের মৃত্যুর পরোয়ানা দেখতে পেল। তাই, যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে গেল।

এই জন্যই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে শাসক-গোষ্ঠী নিশ্চিত হতে পারল না। তাই, জাগ্রত কৃষকদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার জন্য, জোতদার-মজুতদার-দের পুরাণ প্রভুত্ব ফিরিয়ে আনার জন্য উত্তরোত্তর তীব্র আক্রমণ চালাল। এলো সি আর পি, মিলিটারী; তৈরী হোল খুনী গুণ্ডা-মস্তানের দল, শুরু হোল খুন ও জেল ভর্তির পালা। দমননীতি আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের স্তরে উঠল। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার রূপী কৃষকদের রক্ষা কবচ কেড়ে নিলেও ঐ সময়ে ব্যাপক কৃষকদের মধ্যে যে আত্মচেতনা ও সংগ্রামী শক্তি গড়ে উঠেছে তাকে কেড়ে নেওয়া সম্ভব হয় নাই। এরই উপর দাঁড়িয়ে কৃষকরা তাদের অর্জিত অধিকার রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ শক্তির পরিচয় দিয়েছে। ১৯৬৭-৭০ সালের সংগ্রামের শিক্ষা না থাকলে এমনি একটানা হিংস্র আক্রমণের সামনে কৃষকেরা এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না। আর

একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে। জমির সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেভাবে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের কৃষক ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তাতে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিগত বাধা প্রচণ্ড আঘাত খেয়েছে। আজ আর জাতি বা সম্প্রদায়ের নামে কৃষকদের বিভক্ত করা আগের মত সহজ নয় অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে।

১৯৭০-৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপালের শাসনে কেন্দ্রের নির্দেশে যখন জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে, তখন কৃষক আন্দোলনের সামনে নূতন কর্তব্য দেখা দিল। সংগঠিত ও জাগ্রত কৃষকরা যোগ্যতার সঙ্গেই সে কর্তব্য পালন করেছে। এই প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে কৃষকরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের জমি ও অন্যান্য অর্জিত অধিকার রক্ষা করেছে। মাত্র ২-১টা ছোট এলাকা ছাড়া কার্যতঃ সমস্ত পশ্চিমবঙ্গেই তা দেখা গেছে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কৃষকদের সাহস, আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা, প্রতিরোধ ক্ষমতা ও ঐক্য এবং শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা আরো বেড়েছে। এটাই প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৭১ সালের নির্বাচনে। পরবর্তীকালে শাসকশ্রেণীর আক্রমণ আরো হিংস্র ও নগ্ন রূপ নিয়েছে, কিন্তু কৃষকেরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে।" রক্তাক্ত শরীর নিয়ে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে গেছে। ফলে কোন ভাবেই পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মধ্যে মোহ সৃষ্টি করা বা তাদের দাবিয়ে দেওয়া শাসকশ্রেণীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই, বরং জনগণের মনে কংগ্রেস বিরোধী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মনোভাব বেড়েছে। এটাই বামপন্থী ফ্রন্ট গঠনের বাস্তব অবস্থা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

১৯৭১ সালের শেষের দিকে কংগ্রেসী শাসকেরা তাদের আক্রমণকে আরো নগ্ন ও হিংস্র করে তোলে। আর শুধু গ্রেপ্তার বা গুপ্ত হত্যা নয়, কৃষক আন্দোলনের শক্ত এলাকাগুলিতে সি-আর-পি ও শসস্ত্র গুণ্ডাদের মিলিত আক্রমণ সুরু হল। বর্ধমান জেলায় তা সবচেয়ে জঘণ্য রূপ নিল। কৃষকদের ঐক্য ও দৃঢ়তা যতই থাক না কেন, এমনি নগ্ন হিংস্র ও সশস্ত্র আক্রমণের সামনে দাঁড়ান তাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠতে লাগল। কৃষক আন্দোলনের সামনে নূতন প্রশ্ন দেখা দিতে লাগল। তবু জাগ্রত কৃষকরা দমে নাই। তারা মার খেয়েছে, খুন হয়েছে, তাদের ঘর জ্বলেছে, তবু তারা মাথা নোয়ায় নাই। কৃষক ও অন্যান্য জনগণের এমনি মনোভাব এবং সেই অবস্থায় বামপন্থী ফ্রন্ট গঠন। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় বাস্তব সম্ভাবনায় পরিণত করল। সারা ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পরাজয় বৈপ্লবিক তাৎপর্য শাসকশ্রেণীকে পাগল করে তুলল এবং তারা তাই সংসদীয় গণতন্ত্রকেই হত্যার সিদ্ধান্ত নিল ও গুণ্ডামী,

জালিয়াতি এবং মিথ্যাচারের দ্বারা তাকে কার্যকরী করল। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিতে নূতন পর্যায় উপস্থিত হল।

এমনিভাবে নির্বাচনের পথ বাতিল করে শাসক-গোষ্ঠী তাদের সন্ত্রাসকে অনেক বাড়িয়ে দিল—পুলিসী অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র কংগ্রেসী মস্তান-বাহিনীর নগ্ন আস্ফালন ও হামলাবাজী তীব্রতর হোল। এমনি অবস্থায় কৃষক সংগ্রামের সামনে সম্পূর্ণ নূতন ও জটিল প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সর্বত্র কৃষকদের মধ্যে একটা থমথমে ভাব দেখা দিল। কেন এই থমথমে ভাব দেখা দিল তা না বুঝতে পারলে, আজকের কর্তব্য নির্ধারণ করা সহজ হবে না। এর প্রধান কারণ নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এর আগে শাসকশ্রেণীর আক্রমণ তীব্রতর হোলেও জনগণের সামনে নির্বাচনের বাস্তব সম্ভাবনা ছিল। জনগণের অন্যান্য অংশের মত সংগ্রামী কৃষকেরাও ভাবত যে, তখন বাইরের আন্দোলনের সঙ্গে বিধানসভার সুযোগকেও কাজে লাগানো যাবে। এই চেতনা তাদের প্রতিরোধ শক্তিকে বিশেষ গতিবেগ দিয়েছে।

কিন্তু যেভাবে ১৯৭২ সালের নির্বাচনকে শেষ করা হয়েছে, তাতে জনগণের সামনে নির্বাচনের পথ রুদ্ধ হয়েছে। সকলে এ বিষয়ে পুরা সচেতন হোক বা না হোক, তাদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে, যে নির্বাচনের পথ শাসক-গোষ্ঠী অস্ত্রের জোরে বন্ধ করে দিয়েছে। শাসকশ্রেণী সমগ্র রাষ্ট্র যন্ত্র নিয়ে তাদের সামনে নির্মমভাবে উপস্থিত। আজ আর তাদের সামনে লক্ষ্য হিসাবে কোন নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নাই, যে আগের কায়দায় রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তন করা যাবে। এখন অবস্থা অনেকটা "অনির্দিষ্টকালের জন্য" যাত্রা। একমাত্র নিজেদের সংঘ শক্তি, চেতনা ও দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে তাদের এখন এগুতে হবে। এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য জনগণের সংগঠন ও চেতনার আগের স্তর আর যথেষ্ট নয়। এই অবস্থায় সংগ্রামী কৃষকদের মধ্যে একটু থমথমে ভাব আসা খুবই স্বাভাবিক। এ থেকে মনে করা খুবই ভুল হবে যে, তাদের সংগ্রামী শক্তি ও চেতনা দুর্বল হয়েছে। জনগণ মেশিন নয়; নূতন অবস্থার তাৎপর্য তাদের বুঝতে হবে এবং নূতন অবস্থায় উপযোগী সঠিক পথ ঠিক করতে হবে ও প্রস্তুতি করতে হবে। জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সব সময় সোজা পথে চলে না। তার আঁকা বাঁকা মোড় আছে। অবস্থার পরিবর্তনে একটু থমকে দাঁড়ানো স্বাভাবিক। জনগণের অচেনা অচেনা পথে রাস্তার মোড়ে এসে থমকে দাঁড়ানর মত অবস্থা। এই অবস্থা বোঝানো ও তার জন্য প্রস্তুত হতে জনগণকে সাহায্য করাই হোল কৃষক কর্মীদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করতে হবে, যে এত প্রচণ্ড আক্রমণ সত্ত্বেও শুধু কৃষক কর্মীরাই নয়, সাধারণ সংগ্রামী কৃষকরা পর্যন্ত কংগ্রেসীদের কাছে মাথা নোয়ায় নাই। তাদের বেশ কিছুকে জমি হারাতে হয়েছে, অনেকে উচ্ছেদ হয়েছে; অর্জিত অধিকারের সবটা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। অনেকে খুন হয়েছে, এখনও হচ্ছে। অসংখ্য কৃষক এলাকা ছাড়া, অনেকে জেলে, হাজার হাজার কর্মী ও কৃষক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা মাথায় নিয়ে চলেছে। নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে অনেকে হয়ত একটু দম বন্ধ করে আছে, কিন্তু কেউ আত্মসমর্পণ করে নাই। সংগঠনের প্রতি তাদের নিষ্ঠা অবিচল রয়েছে। একটানা দীর্ঘস্থায়ী প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে এমনিভাবে দৃঢ় থাকার ঘটনা আমি আমার জীবনে অতীতে আর দেখিনি। এই দাঁতে দাঁত দিয়ে টিকে থাকার মনোভাব কৃষকদের জাগ্রত চেতনার পরিচয় দিচ্ছে এবং এরই মধ্যে রয়েছে আগামী দিনের অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনা। উপমা অনেক সময় ঠিক হয় না, তবু ইতিহাসের একটা শিক্ষা স্মরণ করা প্রয়োজন। একটা লড়াইয়ের অধিকতর শক্তির সামনে একটা সৈন্যবাহিনীকে সাময়িক-ভাবে পশ্চাদপসরণ করতে হলেও যদি তার মনোবল দৃঢ় থাকে এবং যদি তার শক্তি সংগ্রহের সুযোগ থাকে তাহলে শত্রুকে পযুর্দস্ত করে সে জয় অর্জন করে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনের এমনি মনোবল রয়েছে এবং তার শক্তি সংগ্রহের চমৎকার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই শাসক-গোষ্ঠী এত মরিয়া। তারা দেখছে, যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে জনগণের মধ্যে মোহমুক্তি ঘটতে সুরু হয়েছে, তারা ক্রমাগত সংগ্রামে নামছে। বোম্বাইয়ে শ্রমিক ধর্মঘট, দিল্লীতে গণ-বিক্ষোভ, বিহারে ছাত্র-শিক্ষকদের সংগ্রাম ও লক্ষ কৃষকের অভিযান, দক্ষিণ ভারত রেল শ্রমিকদের সংগ্রাম তারই লক্ষণ। এই মোহ মুক্তি ও গণ-সংগ্রাম নানাভাবে বাধা কেটে আরো বাড়বে।

এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সংগঠিত গণতান্ত্রিক শক্তির সংযোগের সম্ভাবনা শাসকশ্রেণীর সব চেয়ে দুশ্চিন্তার কারণ। তাই তারা পাগলের মত প্রলাপ বকছে, অন্য দিকে আরো হিংস্র হয়ে উঠছে। তারা চাইছে ভারতের অন্যত্র গণশক্তি বিপুল বেগ সঞ্চয় করার আগেই পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক শক্তিকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ধ্বংস করতে। একে পরাস্ত করতে হবে। কৃষক আন্দোলনকে শাসক-গোষ্ঠীর চক্রান্ত সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে; হঠাৎ কিছু করে ফেলার অবাস্তব ধারণা না রেখে ধাপে ধাপে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, আরো বেশী কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। বুঝতে হবে, যে জনগণের কিছু অংশ এখনও শাসক-গোষ্ঠীর দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে আছে; তাদের যুক্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মোহমুক্ত হতে, সাহায্য করতে হবে;

কংগ্রেসকে আরো বিচ্ছিন্ন করতে হবে। শাসকশ্রেণী যতই বিচ্ছিন্ন হবে, ততই তার আক্রমণকে পরাস্ত করার মত জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তি বাড়বে।

পশ্চিমবঙ্গে শাসকশ্রেণীর প্রধান হাতিয়ার সন্ত্রাসমূলক আক্রমণ হলেও তারা শুধুমাত্র সন্ত্রাসের উপর নির্ভর করছে না। তারা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে, জনগণের একাংশের মনে নূতন মোহ ও বিভেদ সৃষ্টি করতে। তারা দিনের পর দিন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা জনজীবনে সংকট বাড়াচ্ছে, কিন্তু ছোটখাটো মামুলী ব্যবস্থার ঢাক পিটিয়ে তারা কিছু প্রত্যাশা ও বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে। বেকারী বাড়ানো হচ্ছে অথচ দু-একজন দলীয় লোককে কাজ দিয়ে একই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা হচ্ছে। বাস্তবে জমি থেকে কৃষককে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, অথচ জমির সিলিং কমানো বা বর্গাদারী ভাগ বাড়াবার কথা বলে নূতন মোহ সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আন্দোলন এমন একটা স্তরে গেছে যে, এখানে নূতন আইনের কথা বলে শাসকশ্রেণী বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না, তবু চেষ্টা করে যাচ্ছে। কৃষকরা নূতন জমি বিশেষ পাচ্ছে না ও পাবে না (বরং অনেক বেশী উচ্ছেদ হচ্ছে), তবু খাস জমি পুনর্বণ্টনের নামে দলবাজী করে গরীবদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। কৃষির উন্নতি ও ব্যাংকের টাকা কর্জ প্রভৃতির নামে সাধারণ জমির মালিক কৃষকদের মধ্যে মোহ সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে, যদিও সাধারণ মাঝারি কৃষক এতে বাঁচবে না এবং এ সবের সুযোগ বেশী পাবে না। কংগ্রেসী ভূমিসংস্কারের দ্বারা ভূমিহীন কৃষক জমি পাবে না। তাদের কৃষির উন্নয়ন ব্যবস্থায় সাধারণ কৃষক উন্নতি করতে পারবে না, তাই এই দুই ব্যবস্থার দ্বারা শাসকশ্রেণী কৃষকদের উপরতলার ধনী অংশকে শক্তিশালী করার এবং মাঝারি কৃষকের মনে অনুরূপ উন্নতির অলীক প্রত্যাশা সৃষ্টির চেষ্টা করছে ও এই ভাবে কৃষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে।

আমি আগেই বলেছি যে, পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আন্দোলন বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তাতে শাসকশ্রেণীর ঐ অপচেষ্টা ফলবতী হবে না। তবু কৃষক আন্দোলনের পক্ষে ঐ সব অপচেষ্টাকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না। নিয়মিত প্রচারের দ্বারা জনগণের বিভিন্ন অংশের সামনে এই সবের মুখোস খুলে দিতে হবে; কৃষকদের নিজেদের অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের আরো সচেতন করতে হবে; সংগে সংগে কৃষকদের বিভিন্ন স্তরের দাবী দাওয়া নিয়ে প্রচার ও সম্ভাব্য কায়দায় আন্দোলন করতে হবে। স্বভাবতঃই, ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের ঐক্য গড়ে তোলার প্রতি বেশী নজর দিতে হবে, ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার উপর

বিশেষ জোর দিতে হবে। কিন্তু সেই সংগে কৃষকদের অন্যান্য অংশের সমস্যা যেমন চাষের সমস্যা, দরের ও ঋণের সমস্যা প্রভৃতি নিয়েও মাথা ঘামাতে হবে। এই ভাবে অগ্রসর হলে শাসকশ্রেণীর কৌশল ব্যর্থ করে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের ভিত্তিতে মেহনতী কৃষকের ঐক্যকে আরো বিস্তৃত করা যাবে, এমনকি শাসকশ্রেণীদের বিচ্ছিন্ন করে তাদের সমর্থক কৃষকদেরও এই ঐক্যের সংগে টেনে আনা যাবে।

শাসকশ্রেণী একদিকে যেমন হিংস্র সন্ত্রাস চালিয়ে কৃষকদের কণ্ঠরোধ করে রাখার চেষ্ট করছে, তেমনি পুঁজিবাদী পথের সংকটের বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপাচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো হচ্ছে, সাধারণ কৃষকের খাজনা বাড়ানো হয়েছে (জোতদারদের কমানো হয়েছে), ক্যানেল কর বাড়াবার কথা উঠেছে, বেকারী ও দারিদ্র্যতা বাড়ানো হচ্ছে। ফলে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে ও আরো বাড়বে। এই ক্রমবর্ধমান অসন্তোষই সন্ত্রাসের বাধা দূর করে কৃষকদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করাই হোল কৃষক কর্মীদের কর্তব্য। মনে রাখা দরকার যে অত্যাচারের ভয়ে জনগণ যদি বেশী দিন চুপচাপ থাকে তাহলে তা থেকে কিছু হতাশাও দেখা দিতে পারে। যন্ত্রনা-কাতর কৃষকদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা ধ্বনিত করে তোলা হোল একটা বড় কাজ। গত ছ-মাস ধরে কঠিন অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েও কৃষক আন্দোলনের কর্মীরা এই কাজ করে যাচ্ছে বলেই কৃষকরা ক্রমশঃ বেশী করে নড়তে আরম্ভ করেছে। আগের তুলনায় কৃষকরা সভা, গণ-মিছিল প্রভৃতিতে অনেক বেশী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে। ফলে কারখানায় শ্রমিকশ্রেণী আরো সক্রিয় সংগ্রামে এগিয়েছে। অফিসে কর্মচারী, শিক্ষায়নে ছাত্র-শিক্ষক প্রভৃতিরাও সেই একই পথ নিয়েছে। কৃষকদের দৈনন্দিন দাবীর ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়াকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সন্ত্রাস আছে তা বুঝেই অবস্থানুযায়ী কার্যক্রম নিতে হবে। শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের অন্যান্য অংশের আন্দোলনের সংগে দ্রুত কৃষক আন্দোনের রাখী বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করতে হবে।

এটা বলাই বাহুল্য যে, আজকের অবস্থায় আগের কায়দায় সংগঠন চলতে পারে না, অথচ কঠিন অবস্থায় দৃঢ় সংগঠন ছাড়া কাজ চলতে পারে না। শাসকশ্রেণীর দয়ার উপর নির্ভর করে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সংগঠন তার দায়িত্ব পালনে যোগ্য হতে পারে না। তাই, সন্ত্রাসের কথা মনে রেখেই আজকের উপযোগী সংগঠন কৃষক আন্দোলনে গড়ে তুলতে হবে।

বর্তমানে যখন প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন সর্বগ্রাসী সন্ত্রাসমূলক আক্রমণের সম্মুখীন, তখন জনগণের কোন আন্দোলন গণতন্ত্রের সংগ্রাম

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এগুতে পারে না। প্রতিক্রিয়াশীল একদলীয় একনায়কত্বের বিপদের সামনে গণতন্ত্রের সংগ্রাম কেন্দ্রীয় সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। কৃষক আন্দোলনকে একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে, যে গণতন্ত্রের সংগ্রাম শুধু সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষককেই নয়, সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে এবং করবে। জনগণ কখনও গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস হারায় না। এ সংগ্রামে জয় হবেই। কোন পথে কি ভাবে এ সংগ্রাম এগুবে তা শুধু জনগণের একার উপর নির্ভর করে না, শাসকশ্রেণীর কার্যকলাপের উপরও নির্ভর করে।

সংগ্রাম আজ কঠিন ও জটিল। কিন্তু কঠিন সংগ্রামের পথ দিয়েই তো জনগণের শক্তি আরো সুদৃঢ় হয়। পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলন গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত। কোন সন্দেহ নাই যে, এই সংগ্রামের পরীক্ষিত সৈনিকরা আজকের কঠিন দায়িত্বও সাফল্যের সঙ্গে পালন করবে।

—মুর্শিদাবাদ বার্তা, শারদীয়, ১৯৭২

১৩ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের বৈপ্লবিক তাৎপর্য

১৯৫২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ঊনবিংশ পার্টি কংগ্রেসে আগত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির নেতাদের সম্বোধন করে কমরেড স্তালিন বলেছিলেন যে, দেশে বুর্জোয়া শাসকেরা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পতাকাকে ধূলায় ফেলে দিচ্ছে, সেই পতাকা কমিউনিস্টদের তুলে নেওয়া কর্তব্য। বুর্জোয়া গণতন্ত্র যখন বুর্জোয়া-শ্রেণীর কাছে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা যখন এই গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে আরম্ভ করে, তখন সেই পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার অর্থ এই নয় যে, গলিত শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখা। এর অর্থ হল ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরাচারের পথে অগ্রসরমান বুর্জোয়াশ্রেণীকে জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন করা, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর সংগে ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা, জনগণের সংগ্রামের অনুকূল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা এবং এই ভাবে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রেণী-সমাবেশ গড়ে তোলা। গণতন্ত্রের জন্য যদি বেশীর ভাগ মানুষকে সক্রিয় আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করা যায় এবং তা সম্ভব,—তাহলে যেমন বুর্জোয়াশ্রেণীকে কোণঠাসা করে গণতন্ত্র রক্ষার বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করা যায়, তেমনি শাসকশ্রেণী তার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালে তাকে পর্যুদস্ত করার মতো ঐক্যবদ্ধ শক্তিও জনগণ অর্জন করতে পারে। কমরেড স্তালিনের উপরোক্ত বক্তব্যের বৈপ্লবিক তাৎপর্য এইখানেই।

স্থান, কাল ও পাত্রের পার্থক্য ভুলে না গিয়েও একথা বলা যায় যে, ভারতের বর্তমান অবস্থায় কমরেড স্তালিনের এই বক্তব্য খুবই মূল্যবান। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র নবম কংগ্রেস দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে, যে বৃহৎ বুর্জোয়া পরিচালিত বুর্জোয়া-জমিদার শাসকশ্রেণী গণতন্ত্র ধ্বংস করতে শুরু করেছে, পশ্চিমবঙ্গে (যেখানে শ্রেণী সংগ্রাম সবচেয়ে তীব্র) আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস কায়েম করেছে, অন্যত্র দমন-নীতি বাড়িয়ে চলেছে এবং সারা দেশে স্বৈরাচারী একনায়কত্বের বিপদ সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতিতে পার্টি কংগ্রেস সঠিকভাবেই গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করাকে কেন্দ্রীয় কর্তব্য হিসাবে উপস্থিত করেছে। পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবের সমস্ত দিক

আলোচনা করা আমার লেখার উদ্দেশ্য নয়। কেন ও কীভাবে বর্তমান পরিস্থিতি এবং কর্তব্য উপস্থিত হয়েছে, তার মধ্যেই আমি আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

১৯৬৭-৬৯ঃ শাসকশ্রেণী কোণঠাসা অবস্থা

আমাদের দেশে রাষ্ট্রের শ্রেণী-চরিত্র হল বৃহৎ বুর্জোয়া পরিচালিত পুঁজিপতি-জমিদারশ্রেণীর শাসন। এই শ্রেণী শাসন কংগ্রেস পার্টির মাধ্যমেই পরিচালিত হয়েছে। তাই, জনগণের চোখের সামনে শ্রেণী শাসন কংগ্রেস রাজত্ব হিসাবে পরিচিত। রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র ঢেকে রাখাই হল শোষক রাষ্ট্রের বেঁচে থাকার বড় গ্যারাণ্টি। জনবিরোধী পুঁজিবাদী বিকাশের শ্রেণী নীতি গ্রহণ করে চললেও এবং তার ফলে জনজীবনে সংকট বাড়লেও কংগ্রেস সরকার একটানা ২০ বছর ধরে জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে মোহ বজায় রাখতে পেরেছিল এবং ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে (কেরালায় কিছু সময় বাদে) কংগ্রেসের একচ্ছত্র শাসন ছিল। কিন্তু বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় জনগণের মধ্যে যে মোহমুক্তির প্রক্রিয়া চলছিল, তা ১৯৬৭ সালে এক বিশেষ স্তরে পেঁছিল। জনগণের বেশী বেশী অংশ কংগ্রেস হতে সরে আসতে লাগল। পশ্চাৎপদ কৃষকদের মধ্যেই কংগ্রেসের প্রভাব বেশী ছিল। কৃষকদের মধ্যেও এই কংগ্রেস হতে সরে যাওয়ার প্রক্রিয়া কাজ করল। এই প্রক্রিয়ার প্রভাবে কংগ্রেসের মধ্যেও কোন কোন অংশ বিক্ষুব্ধ হয়ে কংগ্রেস হতে বেরিয়ে গেল।

এই সবের ফল হিসাবে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস অনেকগুলি রাজ্যে হেরে গেল এবং এই সব রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকার গঠিত হল। এই সরকারগুলির চরিত্র এক রকমের ছিল না ; শ্রেণী চরিত্র হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা ছাড়া অন্যগুলির সঙ্গে কংগ্রেস সরকারের গুণগত পার্থক্য ছিল না। তাছাড়া, রাষ্ট্রের আসল ক্ষমতা যেখানে সেই কেন্দ্রে কংগ্রেসের শাসনই থেকে গেল। এসব সত্ত্বেও এতগুলি রাজ্যে কংগ্রেসের পরাজয় নিশ্চিতভাবে শাসকশ্রেণীর কোণঠাসা অবস্থার পরিচয় দেয়। এতে আপেক্ষিকভাবে জনগণের চেতনা বৃদ্ধির পরিচয় মেলে। ফলে গণ-আন্দোলনের বিকাশের পক্ষে আরো অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হল।

কেন্দ্রের ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস পার্টি নানা চক্রান্ত করে এবং কিছু বিধান সভার সদস্য কিনে অনেকগুলি অ-কংগ্রেসী সরকারকে ভেঙে দিল, কিন্তু তাতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল না। ১৯৬৯ সালে ক্ষুদ্র সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস এই রাজ্যগুলিতে আবার হেরে গেল। বিহার, উত্তর

প্রদেশ ও পাঞ্জাবে যেখানে অ-কংগ্রেসী সরকারগুলির চরিত্র ও কাজের মধ্যে কংগ্রেস সরকারগুলির কাজের গুণগত পার্থক্য জনগণ দেখতে পায় নাই, সেখানে কংগ্রেস-বিরোধী শক্তির অগ্রগতি না ঘটলেও কংগ্রেস জিততে পারল না। অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস অনেক বেশী আসনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। এ থেকে বোঝা যায় যে, জনগণের কংগ্রেস-বিরোধী চেতনা বেড়েছে এবং শাসক পার্টি আরো কোণঠাসা হয়েছে।

এই অবস্থায় জনগণের চেতনা ও সংগ্রামী শক্তির বিকাশ কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই দুটি রাজ্যে শক্তিশালী শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন ছিল এবং এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা শক্তি ছিল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। স্বাভাবতঃই, এই যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলিতে প্রধান শক্তি হল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং এগুলির চরিত্র হল মূলতঃ বামপন্থী গণতান্ত্রিক। বুর্জোয়া রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যে সীমিত অধিকার সম্পন্ন রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে মার্কসবাদীদের অংশ গ্রহণের প্রশ্ন বাস্তব প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিল। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে মার্কসবাদীদের এমনি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় নাই। নির্বাচন ও এমনি সরকারের মাধ্যমে ধাপে ধাপে জনগণের মৌলিক সমস্যা সমাধান সম্ভব বলে মনে করা হল চিরাচরিত সংস্কারবাদী ধারণা। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি এমনি সংস্কারবাদের ধারক হিসাবে ঘোষণা করল যে, শাসন ও আন্দোলন একসঙ্গে চলতে পারে না। অন্য দিকে দেশে বিপ্লবী পরিস্থিতি না থাকলেও নির্বাচন ও তার ফলাফল হতে সরে যাবার মানে হল হঠকারী ধারণা। নকশালপন্থীরা এই বিচ্যুতির ধারক হয়ে অধঃপতনের কোন অতলে তলিয়ে গেছে তা সকলেই জানেন। নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী ব্যবস্থাকে গণ-সংগ্রামের স্বার্থে ব্যবহার করার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতিকে ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্ট সরকারে অংশ গ্রহণ ও তাকে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের নীতি গ্রহণ করে। পরবর্তীকালের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, এটাই সঠিক নীতি।

পার্টির এই নীতি দুটি সরকারের সামগ্রিক চরিত্র ও কাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। পুলিস হল শ্রেণী শাসনের হাতিয়ার। গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই পুলিসের ব্যবহার বন্ধ করা হল যুক্তফ্রন্ট সরকারের সবচেয়ে বড় অবদান। এই নীতির সঠিক প্রয়োগের ফলে দুটি রাজ্যেই গণ-সংগ্রামের জোয়ার সৃষ্টি হল এবং সারা ভারতে জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধিতে তা বিশেষ ভূমিকা পালন করল। পশ্চিমবঙ্গে

গণ-সংগ্রামের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটল। এই প্রবন্ধে গণ-সংগ্রাম সম্বন্ধে বিশেষ লেখার প্রয়োজন নাই। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা তা জানেন। শ্রেণী-সংগ্রামের ব্যাপকতা ও গভীরতা তীব্র গতিবেগ পেল। লক্ষ লক্ষ পশ্চাৎপদ জনগণ গণ-সংগ্রামে সক্রিয় যোদ্ধায় পরিণত হল। গ্রামের দিকে পরিবর্তন হল সবচেয়ে বেশী ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সারা রাজ্যের সর্বত্র শ্রমিক, গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর ইতিহাসের গতিনিয়ন্তা হিসাবে সামনে এগিয়ে গেল। ২০ বছরের কংগ্রেস শাসনে যা হয় নাই, এই সময় তাই ঘটল। কর্মচারী, শ্রমিক, খেতমজুর-কৃষক ও জনগণ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার অর্জন করল। তাদের সংগ্রামী শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটল। জনগণের এই সাফল্য, বিশেষ করে ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সারা দেশে কংগ্রেস নীতির জনবিরোধী চরিত্রকে আরো পরিস্ফুট করে তুলল। স্বভাবতঃই, এই ঘটনাবলী দেশের শাসকশ্রেণী ও তাদের রাষ্ট্র শক্তিকে আরো বিচলিত করে তুলল এবং তাদের সংকটজনক অবস্থাকে আরো ঘোরালো করে তুলল। স্বভাবতঃই, এই দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণী তাদের আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করল।

১৯৬৯ ৭১ঃ শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক পাল্টা আক্রমণ

এমনি পরিস্থিতিকে শাসকশ্রেণী চুপ করে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু তারা এটাও বুঝেছিল যে, পুরোনো কৌশল আঁকড়ে ধরে থাকলে অবস্থার পরিবর্তন করা যাবে না। তাই কীভাবে শ্রেণী-শাসনকে বাঁচান যায় এবং গণ-সংগ্রামকে স্তব্ধ করা যায়, সেই কৌশলগত প্রশ্নে কংগ্রেস পার্টির মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল। এই কৌশলগত পার্থক্যই শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকে দুটি পার্টিতে ভাগ করে দিল এবং সিণ্ডিকেটপন্থীদের কৌশলের মূল কথা ছিল: স্বতন্ত্র, জনসংঘ প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল পার্টির সংগে যুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে তখনই সোজাসুজি আক্রমণ চালানো। কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে গায়ের জোরে ভেংগে দেওয়া ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করা। এটা ছিল স্থূল প্রতিক্রিয়াশীল সোজাসুজি আক্রমণের কৌশল।

অন্য দিকে ইণ্ডিকেটপন্থীদের, যারা পরে নব কংগ্রেসের রূপ নিয়েছে, তাদের কৌশলের মূল কথা হল: (১) জনগণের মধ্যে শাসক পার্টির হৃত প্রভাবকে উদ্ধার করা। তার জন্য 'প্রগতিবাদী' সাজতে হবে এবং জনগণকে নূতনভাবে মোহগ্রস্ত করার জন্য সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে কথার

বাগাড়ম্বর করতে হবে। এর থেকেই এল "গরিবী হঠাও"র স্লোগান। কিন্তু শুধু মুখে বুকনি দিয়ে হবে না, তাই এমন কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে, যেগুলি আসলে বৃহৎ বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণী-শাসনের সংহতির পক্ষে, কিন্তু যার দ্বারা জনগণের মনে নূতন প্রত্যাশা সৃষ্টি করা যায় তারই চেষ্টা সুরু হবে।

উদাহরণ হিসাবে ব্যাংক জাতীয়করনের কথা বলা যেতে পারে। বৃহৎ বুর্জোয়ার স্বার্থ নষ্ট করেও সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর সংহতি সাধনের ও উন্নয়নের নামে জনগণের একাংশের মনে আশা সৃষ্টি করতে একে কাজে লাগানো হচ্ছে। জাতীয়করনের সময় ব্যাংকগুলির মোট টাকা ছিল প্রায় ৪,৫০০ কোটি টাকা, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭,৫০০ কোটি টাকায়। এর শতকরা ৭৩ ভাগ টাকা বৃহৎ বুর্জোয়া-গোষ্ঠীই পাচ্ছে অর্থাৎ আগের তুলনায় তারা এখন বেশী টাকাই লাভ হিসাবে পাচ্ছে।

অন্য দিকে সরকার কিছু টাকা অ-বৃহৎ পুঁজিপতিদের দিচ্ছে, "সবুজ বিপ্লবের" নামে গ্রামাঞ্চলে বড় জমির মালিক ও ধনী কৃষকদের কিছু কিছু টাকা দিচ্ছে এবং সেই সংগে ২/১ জন সাধারণ মানুষের সামনে কিছু টাকা পাবার আশা তুলে ধরে লটারীর টিকিট কেনার মতো কিছু প্রত্যাশা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর "উন্নয়নের" ধোঁকাবাজীর মুখোস খুলে দিয়ে কমরেড লেনিন বলেছেন, যে দু-একজন মাঝারি চাষী হয়তো উপরে উঠতে পারে, বাকী সবাই নীচের দিকে নেমে যাবে। এখানে তার অন্যথা হবে না। কিন্তু তা হলেও সাময়িকভাবে কিছু মোহ সৃষ্টি করা যায়। ব্যাংক জাতীয়-করণের ন্যায় ভূমিসংস্কারের নূতন বাগাড়ম্বরকে একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে ভূমি সমস্যার সমাধান হবে না, কিছু বুর্জোয়া বিকাশ হতে পারে এবং যেখানে কৃষক আন্দোলন দুর্বল সেখানে সাময়িকভাবে কিছু মোহ সৃষ্টি হতে পারে।

২। শাসক কংগ্রেসের দ্বিতীয় কৌশল হল, যুক্তফ্রন্টের কিছু শরিককে কাছে টেনে ভেতর থেকে যুক্তফ্রন্টগুলিকে ভেংগে দেওয়া, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সহযোগীদের বিচ্ছিন্ন করা এবং এই ভাবে গণতান্ত্রিক শক্তিকে দুর্বল করা ও তার অগ্রগতি রোধ করা।

৩। এতেও যদি গণ-সংগ্রামকে স্তব্ধ করা না যায়, তাহলে শাসক কংগ্রেসের তৃতীয় কৌশল হল মার্কসবাদী পার্টি ও গণশক্তি বিচ্ছিন্ন করে প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো। প্রথম দুটি কৌশলে কাজ হলে তৃতীয়টির দরকার হয় না। তাই প্রথম দিকে প্রথমোক্ত দুটি কৌশলকেই সমানে দেখা গেল,

তৃতীয়টি এসেছে পরের দিকে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে এই তিনটিই হল শাসক কংগ্রেসের কৌশলের সামগ্রিক রূপ।

এইভাবে শাসক পার্টির দু-গোষ্ঠি (সংগঠন কংগ্রেস ও শাসক কংগ্রেস) জনগণের সামনে দুই পৃথক কৌশল নিয়ে এসে দাঁড়াল এবং এই দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নেবার আহ্বান জানাল। তারা দেখাতে চাইল, যেন এ ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। বেশীর ভাগ পরিচিত বামপন্থী দল স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে একটির বা অন্যটির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। শ্রমিকশ্রেণীর ও বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে এ ছিল এক কঠিন অবস্থা। এটা গর্বের কথা যে, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি তার আনুগত্য বজায় রাখতে পেরেছে। শাসকশ্রেণীর দুই কৌশলের শ্রেণী ভিত্তি যে একই, তা পার্টি প্রথম হতে ধরতে পেরেছিল এবং সেই জন্য কোনটিরই পিছনে লাইন না দিয়ে সত্যকার বিকল্প হিসাবে বামপন্থী ঐক্যের বিকল্প শ্লোগান নিয়ে জনগণের সামনে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, যেখানেই পার্টির শক্তি ছিল (কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা) এবং পার্টি জনগণের সামনে তার বক্তব্য নিয়ে বৃহৎ আকারে যেতে পেরেছে, সেখানেই শাসক-গোষ্ঠীর দুই কৌশলকে ঠেকিয়ে সে গণতান্ত্রিক শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। কিন্তু, সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে পার্টির শক্তি ছিল দুর্বল, এটাই ছিল গণতান্ত্রিক শক্তির বড় দুর্বলতা এবং শাসক শ্রেণী তার পুরো সুযোগ গ্রহণ করেছে।

শাসকশ্রেণী দুই লাইন হতে দূরে থাকলেও পার্টি এই দুই কৌশল সম্বন্ধে নির্লিপ্ত ছিল না এবং তা থাকা উচিত হত না। সিণ্ডিকেট-গোষ্ঠীর কৌশল ছিল, আরো প্রতিক্রিয়াশীল ও সোজাসুজি আক্রমণের কৌশল। এ কৌশল সফল হলে, আশু বিপদ হিসাবে তা হত বড় বিপদ; তাই ১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় কোন মোহ না রেখেও পার্টি ও গণতান্ত্রিক শক্তি সঠিকভাবেই ভি. ভি. গিরির পক্ষে ভোট দিয়েছিল। বর্তমানে শাসক কংগ্রেসই প্রধান বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তারাই পশ্চিমবঙ্গে আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস কায়েম করেছে। এ হতে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেওয়া ঠিক হয়েছিল কিনা। গণতান্ত্রিক কর্মীদের মনে এ বিষয়ে খটকা থেকে গেলে আজকের কঠিন কর্তব্য পালনে অসুবিধা হতো।

একটা বিশেষ সময়ে কে প্রধান বিপদ তা বিবেচনা করে মার্কসবাদীদের কৌশল নিতে হয়। এটা মনে রাখলে বুঝতে হবে যে ভি. ভি. গিরিকে সমর্থন করা সঠিকই ছিল। কারণ এখন সিণ্ডিকেটের অবস্থা করুণ হলেও তখন তা ছিল না এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এই গোষ্ঠী জিতলে বিপদ

ছিল। তাহলে কংগ্রেস এম পি-দের অনেকে ঐ দিকে ঢলে পড়ত। এই অবস্থায় তখন সিণ্ডিকেট, জনসংঘ, স্বতন্ত্র জোটের ক্ষমতা দখলের বিপদ ছিল এবং তা তখনকার অবস্থায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে আশু বিপদ হয়ে দাঁড়াত। দ্বিতীয়, সিণ্ডিকেট প্রার্থী জিতলে ইণ্ডিকেট-গোষ্ঠী বামপন্থীদের প্রতিক্রিয়ার সমর্থক হিসাবে দেখিয়ে নিজেদের তথাকথিত "প্রগতিশীল" দেখাবার বেশী সুযোগ পেত। ইতিহাসের উপমা সব সময় ঠিক হয় না। তবু স্মরণ করা দরকার যে, হিটলার-জার্মানীর চরিত্র জানা সত্ত্বেও আশু যুদ্ধের বিপদ রোখার জন্য এবং কিছুটা সময় পাবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে [হিটলারের প্রস্তাব গ্রহণ করে] ১৯৩৯ সালে জার্মনীর সংগে অনাক্রমণ চুক্তি করতে হয়েছিল। জার্মানীর পরবর্তী ঘৃণ্য আক্রমণ সত্ত্বেও এই চুক্তি সঠিক ছিল। তাই, পরবর্তী কালে শাসক কংগ্রেসের আক্রমণ সত্ত্বেও ঐ সময়ে সিণ্ডিকেটের বিপদকে রোখা গণতান্ত্রিক শক্তির স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর যখন কংগ্রেসীরা দলে দলে শাসক কংগ্রেসে যোগ দিতে লাগল, বিশেষ করে যখন কংগ্রেস ভংগে প্রকাশে। দুটো হয়ে গেল, তখন চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিপদ আর বড় থাকল না। এটা বুঝতে একটু দেরী হয়েছিল, যা পার্টির নবম কংগ্রেসই স্বীকার করেছে।

শাসক কংগ্রেসের কৌশলের সাফল্য ও ব্যর্থতা

১৯৭১ ও ১৯৭২ সালের নির্বাচনগুলি দেখিয়ে দিল যে, বুর্জোয়া-জমিদারশ্রেণীর স্বার্থে শাসক কংগ্রেস যে নূতন কৌশল নিয়েছে তা শাসক শ্রেণীর পক্ষে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছে। কংগ্রেস হতে জনগণের সরে যাবার যে প্রক্রিয়া ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে দেখা গেছে তাকে শাসক কংগ্রেসের নতুন কৌশল শুধু ঠেকিয়েই দেয় নাই, উপরন্তু জনমনে নূতন মোহ সৃষ্টি করতে পেরেছে এবং ভারতের বেশীর ভাগ রাজ্যে শাসক কংগ্রেস পুরাতন ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেসের হৃত প্রভাবকে অনেকাংশে পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে। বাস্তবে প্রমাণিত হল যে, শাসক কংগ্রেসের কৌশলই বর্তমান সময়ে বুর্জোয়া জমিদার শাসকশ্রেণীর পক্ষে সর্বোত্তম কৌশল। ঘনীভূত অর্থনৈতিক সংকট ও ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক চ্যালেঞ্জের মুখে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব শাসক শ্রেণীগুলির পক্ষে যোগ্য নেতৃত্বের কাজ করেছে। একদিকে ধাপ্পাবাজী ও বিভেদের নূতন কায়দা এবং অন্য দিকে লজ্জাহীন আক্রমণ হল এই নেতৃত্বের হাতিয়ার।

এর ফলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রেণী সমাবেশের পরিবর্তন ঘটেছে শাসক

শ্রেণীর পক্ষে। এটা উদ্বেগজনক হলেও বৈপ্লবিক নেতৃত্ব বাস্তবকে অস্বীকার করে এগুতে পারে না। বাস্তবকে মেনে নিয়েই তাকে বদলাতে হবে। কংগ্রেস সরকার জনগণের জীবনে সংকটের ও শোষণের বোঝা এতটুকু কমায় নাই, বরং বাড়িয়েছে। তথাপি শাসক কংগ্রেস জনগণের একটি বড় অংশের মধ্যে নূতন মোহ সৃষ্টি করতে পেরেছে। এর প্রধান কারণ হল, ভারতে বেশীর ভাগ রাজ্যে বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তির ও বিশেষ করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দুর্বলতা।

এর ফলে জনগণের সামনে দুটি বিকল্প রাস্তা জোরের সংগে উপস্থিত হল: একটি হল স্বতন্ত্র, জনসংঘ-সিণ্ডিকেট-গোষ্ঠির খোলাখুলি প্রতিক্রিয়াশীল প্রোগ্রাম, অন্যটি শাসক কংগ্রেসের বাহ্যিক তথাকথিত প্রগতিশীল বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রোগ্রাম। মার্কসবাদী শক্তির দুর্বলতার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর বিকল্প প্রোগ্রাম তাদের সামনে জোরে উথাপিত হতে পারল না এবং ব্যাপক জনগণের সামনে ও কার্যকরী বিকল্প হিসাবে দাঁড়াতে পারল না। দ্বিতীয় কারণ, দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের নাক্কারজনক বুর্জোয়া লেজুড়বৃত্তি। মার্কসবাদী ও বামপন্থী পার্টির ছাপ নিয়ে তারা এই নেতৃত্ব শাসক কংগ্রেসের নীতিকে সমর্থন করে "প্রগতিশীলতার" মুখোসকে শক্তিশালী করেছে। এই পরিস্থিতিতে ব্যাপক জনগণ স্বাভাবিকভাবে শাসক কংগ্রেসকেই বিকল্প হিসাবে মেনে নিয়েছে। শাসকশ্রেণী তার রাজনৈতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শাসক কংগ্রেসের কৌশলের সাফল্যের সংগে সংগে লক্ষ্য করতে হবে যে, পশ্চিমবংগ, কেরালা ও ত্রিপুরায় তারা জনগণকে টেনে নিতে এবং গণতান্ত্রিক শক্তিকে দুর্বল করতে ব্যর্থ হয়েছে। এসব রাজ্যে বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী ছিল এবং এই সময়ে আরো শক্তিশালী হয়েছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সহযোগীরা এখানে শক্তিশালী। এই শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর বিকল্প প্রোগ্রাম নিয়ে শাসক-শ্রেণীর দুই কৌশলের বিরুদ্ধে বিরাটভাবে জনগণের সামনে দাঁড়াতে পেরেছে ও তাদের সংগঠিত করেছে। সেই জন্যই কংগ্রেস এই সব রাজ্যে গণতান্ত্রিক শক্তিকে দুর্বল করতে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলা কংগ্রেস, দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে কেরালা ও পশ্চিমবংগে তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেংগে দিতে পেরেছে। জনগণের সংগ্রামের এই বিশেষ হাতিয়ারকে তারা ভেংগে দিয়েছে, কিন্তু জনগণের সংগ্রামী শক্তিকে ভাংগতে পারে নাই। পরবর্তী নির্বাচনে কেরালায় কংগ্রেস, দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি, মুসলিম লীগ জোট, আসন বেশী দখল করলেও তাদের মিলিত ভোটের হার বাড়াতে

পারে নাই, বরং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ও তার সহযোগীদের গণ-সমর্থন বেড়েছে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ব্যর্থতা আরো পরিস্ফুট। এখানে শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা ও জনগণের রাজনৈতিক চেতনার আপেক্ষিক উচ্চমানের জন্য কংগ্রেসের পক্ষে ১৯৭১ সালে সংযুক্ত বামপন্থী জোটের বিরুদ্ধে কোন ফ্রন্ট করা সম্ভব হয় নাই, কংগ্রেস ভোট বা আসন কোন দিক দিয়েই জিততে পারে নাই, বরং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং বামপন্থী জোটের ভোট ও আসন দুইই বেড়েছে। তীব্র সন্ত্রাস ও গুণ্ডা-পুলিসের আক্রমণ সত্ত্বেও তা হয়েছে। ফলে কংগ্রেস সরকার আরো মরিয়া হয়ে উঠেছে। "গণতান্ত্রিক প্রগতিশীলতা"-র সমস্ত মুখোস খুলে দিয়ে তারা কুৎসা ও নগ্ন হিংস্রতার আশ্রয় নিয়েছে। আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস বাড়িয়ে চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭২ সালের নির্বাচনে ব্যাপক ভিত্তিক যুক্তফ্রন্টের সামনে পরাজিত অবশ্যম্ভাবী জেনে জালিয়াতি ও গুণ্ডামীর সাহায্যে সমগ্র নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। ভারতের রাজনীতিতে এ এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে; শুধু গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণ নয়, সংসদীয় গণতন্ত্রকেই জবাই করা শুরু হয়েছে।

একদিকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে শাসক কংগ্রেসের অবস্থার উন্নতি, অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের কোণঠাসা হওয়া এবং তার ফলে গণতন্ত্রের ধ্বংসের সূচনা—এই পরস্পর-বিরোধী ঘটনাই আমাদের পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য।

গণতন্ত্রের ধ্বংসের সূচনা

পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলী শুধু একটি রাজ্যের জনগণের প্রশ্ন নয়। এর তাৎপর্য সর্বভারতীয়। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গণ-আন্দোলনের বিকাশের নীতি ও সেই সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের বৈপ্লবিক নীতিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছে বলেই এখানে কংগ্রেসের নূতন কৌশলকে ব্যর্থ করা গেছে, শ্রেণী সংগ্রামের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটানো গেছে, আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেড়েছে।

শাসকশ্রেণী ও তার অনুচরেরা তাদের অপরাধকে ঢাকার জন্য নিত্য নূতন কুৎসা প্রচার করে যাচ্ছে, যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মাতব্বরি ও সংকীর্ণ নীতির জন্য যুক্তফ্রন্ট ভেঙেছে এবং তারাই ব্যক্তি-হত্যার রাজনীতি নিয়ে এসেছে। বাস্তব ঘটনা ঠিক তার উল্টো। গণ-সংগ্রাম ও যুক্তফ্রন্টের নীতিকে সঠিকভাবেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গণ-সংগ্রামের জন্য ও তার প্রয়োজনে যুক্তফ্রন্ট, কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতে যুক্তফ্রন্ট কোন স্থিতিশীল ধারণা নয়। জনগণের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের বিশেষ ঐক্যের একটা পার্টিগত প্রতিফলন হল যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্টের একটা বিশেষ রূপ অবস্থা নির্বিশেষে স্থায়ী হতে পারে না। অবস্থার পরিবর্তনে তার চরিত্রও পরিবর্তিত হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল সংগ্রামের হাতিয়ার। তাই সঠিকভাবেই গণ-সংগ্রামের কোন ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি হয় না, তা নয়। কোটি কোটি মানুষ সংগ্রামে নামলে এরকম হতে বাধ্য।

কিন্তু তা কোন বড় ঘটনা ছিল না এবং তার জন্যে যুক্তফ্রন্ট ভাঙে নাই। শ্রেণী সংগ্রাম বাড়ার ফলে জোতদার-পুঁজিপতিরা আতংকিত হয়েছে, তাদের চীৎকার বেড়েছে। কমরেড লেনিনের ভাষায়, লুণ্ঠনকারীরা জনগণকে চোর, ডাকাত ও আইনভংগকারী বলে চীৎকার করতে থাকে। সেইক্ষণে স্বাভাবিকভাবে যুক্তফ্রন্টের কোন কোন শরিকের কাছে শ্রমিকশ্রেণীর আক্রমণের বিপদকে ছোট করে দেখার-প্রবণতা বাড়ে। এমনি অবস্থায় শ্রেণী সংগ্রামের চাপে জোতদার-ঘেষা বাংলা কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরোধিতা, শাসক কংগ্রেসের নূতন কৌশলের প্রভাব ও তার কাছে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট নেতৃত্বের আত্মসমর্পণ যুক্তফ্রন্টের ভাঙনকে অনিবার্য করে তোলে। এদের শর্ত মতো যুক্তফ্রন্টকে একইভাবে রাখতে গেলে গণ-সংগ্রাম বন্ধ করে দিতে হত, জনগণের বিরুদ্ধে পুলিসের ব্যবহার চালু করতে হত এবং যুক্তফ্রন্টের উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে হত।

সঠিকভাবে গণশক্তিকে বিকশিত করা হয়েছিল বলেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভাংগার পর কেন্দ্রীয় সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে বেপরোয়া আক্রমণ শুরু করে। মিথ্যা মামলা ও অত্যাচার চালাবার জন্য রাজ্য-পুলিস ছাড়াও কার্যতঃ স্থায়ীভাবে কেন্দ্রীয় পুলিস আনা হয়। তাতে গণতান্ত্রিক শক্তিকে দাবাতে না পেয়ে নেতা ও কর্মীদের হত্যা শুরু করে ও তার জন্য খুনী বাহিনীও প্রস্তুত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মিলিটারীর সাহায্যও নেওয়া হয়। এইভাবে দমননীতি আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের স্তরে উন্নীত হয়।

এই অবস্থায় একদিকে যেমন শ্রমিক-কৃষকের ও জনগণের চেতনা এবং সংগ্রামী শক্তিকে বাড়ানো হয়েছে, তেমনি যুক্ত আন্দোলন ও যুক্তফ্রন্টের চেষ্টা ধারাবাহিকভাবে চালানো হয়েছে। তারই জন্য ১৯৭১ সালে একদিকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আংশিক হলেও বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট করা গিয়েছিল, অন্য দিকে কংগ্রেস তার বিরুদ্ধে কোন মোর্চা করতে পারে নাই। ফলে এই

নির্বাচনে গণতান্ত্রিক শক্তি এগিয়ে গিয়েছিল। এতে কংগ্রেসী শাসকেরা আরো ক্ষিপ্ত হয় ও তাদের সন্ত্রাসকে আরো বাড়িয়ে দেয়। এই অবস্থায় পার্টি সঠিকভাবে আন্দোলন ও যুক্তফ্রন্টের নীতি চালিয়ে যাওয়ার ফলে ব্যাপক ভিত্তিক বামপন্থী ফ্রন্টের সম্ভাবনা বাড়ে এবং ১৯৭২ সালে নির্বাচনের পূর্বে তা বাস্তব রূপ নেয়। একমাত্র দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব আরো অধঃপতিত হয়ে কংগ্রেসের সংগে যোগ দেয়। কংগ্রেসী শাসকেরা এই বামপন্থী ফ্রন্টের সম্ভাবনাকে হিসাবের মধ্যে নেয় নি বলেই অনেকে টালবাহানা করে নির্বচনে যেতে রাজী হয় এবং ফ্রন্টের কাছে পরাজয় আশংকা করে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনকেই খতম করে।

সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবংগ একটা ছোট রাজ্য, মাত্র সাড়ে ৪ কোটি জন সংখ্যা। কিন্তু এখানে নির্বাচনে বামপন্থী ফ্রন্টের জয় বা এমন কি শক্তিশালী বিরোধী দল হিসাবে জয়লাভ ছিল সম্ভাবনাপূর্ণ। কারণ, এখানে গণতান্ত্রিক শক্তির এই জয়লাভ সারা ভারতে জনগণের দ্রুত মোহমুক্তি ঘটাতে সাহায্য করত এবং তাদের সামনে বিকল্প পথের নিশানা হিসাবে কাজ করত। সেই জন্যই শাসকশ্রেণী কয়েকটি আসনে গুণ্ডামীর আশ্রয় নিয়ে বামপন্থী ফ্রন্টকে হারানোর মধ্যেই তার চক্রান্তকে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং ব্যাপকভাবে গুণ্ডামী ও জালিয়াতীর আশ্রয় নিয়ে সমগ্র নির্বাচনকেই প্রহসনে পরিণত করেছে। এই অবস্থা আমরা আগে হতে পুরা বুঝতে পারি নাই, তা পার্টি কংগ্রেসেই বলা হয়েছে।

পশ্চিমবংগের গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে অত্যন্ত কঠিন সংগ্রামের অবস্থা উপস্থিত হলেও বুঝতে হবে যে, এটা শাসকশ্রেণীর শক্তির পরিচয় নয়, এ তার আতংক ও দুর্বলতার পরিচয়। সংগে সংগে বুঝতে হবে, যে এটা শুধু পশ্চিমবংগের সমস্যা নয়। পশ্চিমবংগের ঘটনাবলী দেখিয়ে দিচ্ছে, যে অন্যান্য রাজ্যে জনগণ মোহমুক্ত হয়ে শাসকশ্রেণীর সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ালে সেখানে একই ভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হবে ও সন্ত্রাস চালানো হবে। শুধু তাই নয়, অন্যান্য রাজ্যে শাসকশ্রেণী জনগণকে তার চ্যালেঞ্জের স্তরেই আসতে দিতে চাইবে না। সামান্য আন্দোলনেই আগের চেয়ে প্রচণ্ড দমননীতি চলবে। বোম্বে, দিল্লি, পাটনা প্রভৃতিতে তারই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সংগে সংগে পশ্চিমবংগের গণতান্ত্রিক শক্তিকে পংগু ও খতম করে দেবার চেষ্টা হচ্ছে ও হবে। বেশীর ভাগ রাজ্যে কংগ্রেসের বিপুল জয়লাভ, সংসদীয় বিরোধীদলের দুর্বলতা, কংগ্রেসের মধ্যে গণতন্ত্রের অভাব ও ব্যক্তি বিশেষের আধিপত্য, ক্রমবর্ধমান দমননীতি ও পশ্চিমবংগে আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস—এই সব কিছু নিঃসন্দেহে সারা ভারতে প্রতিক্রিয়াশীল স্বেচ্ছাচারী

একনায়কত্বের বিপদ সৃষ্টি করেছে। আজকের পরিস্থিতির এটাই হল বড় বিপদ।

আশু বিপদ, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

আজকের পরিস্থিতির একটা বিশেষ দিক হল—সারা ভারতে গণতান্ত্রিক শক্তির অসম বিকাশ। এই অসম বিকাশ আগেও ছিল। গত দু-বছরে তা আরো বেড়েছে। ভারতের বেশীর ভাগ রাজ্যে কংগ্রেস জনগণের মধ্যে নূতন মোহ সৃষ্টি করে গণতান্ত্রিক শক্তিকে দুর্বল করেছে। অন্য দিকেপশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরা হল গণতান্ত্রিক শক্তির ঘাঁটি, এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সবচেয়ে তীব্র ও সবচেয়ে কঠিন আক্রমণের সম্মুখীন। এই অসম বিকাশই হল আজকের বড় বিপদ। শাসকশ্রেণী জানে যে, সময় তার বিপক্ষে। তাই তারা চেষ্টা করছে নূতন নূতন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও কৌশল নিয়ে জনগণকে মোহগ্রস্ত করে রাখতে এবং ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় গণতান্ত্রিক শক্তির ঘাটিগুলিকে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের শক্ত ঘাঁটিকে গুঁড়িয়ে দিতে। পশ্চিমবঙ্গে বেপরোয়া আক্রমণকে তীব্রতর করার জন্য তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এমন প্ররোচনামূলক কুৎসাও চালিয়ে যাচ্ছে, যে মার্কসবাদীরা নাকি সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি করছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বেপরোয় হঠকারিতা ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর চক্রান্তে বিশ্বাস করে না। তারা জানে যে সারা ভারতে জনগণের আন্দোলন দুর্বল এবং পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বেশ কিছু প্রভাব এখনও আছে। তাই, শাসকশ্রেণীর আধা-ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করাই তাদের প্রধান কাজ। বিপ্লবের কোন সোজা রাস্তা নাই।

পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক শক্তিকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হলেও সারা দেশে আগামী দিনের সম্ভাবনা বিরাট। একথা সত্য যে সারা দেশে কংগ্রেস জনমনে বেশ কিছু মোহ সৃষ্টি করতে পেরেছে। নূতন নূতন কথা বলে এবং ছিটেফোঁটা ব্যবস্থা নিয়ে তারা এই মোহ বজায় রাখতেও চেষ্টা করবে। কিন্তু এটাও বাস্তব সত্য যে, জনগণকে রিলিফ দেবার মত ক্ষমতা শাসকশ্রেণীর সীমাবদ্ধ। অন্য দিকে তাদের নীতির ফলে জনজীবনে সংকট দ্রুত বাড়ছে ও আরো বাড়বে। তাই যে অনুপাতে শাসকশ্রেণী জনমনে প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছে, আগামী দিনে সেই অনুপাতে তাদের মোহভঙ্গ হবেই এবং ফলে তারা গণ-সংগ্রামে নেমে পড়বে। এমনও হতে পারে যে অনেক ক্ষেত্রে জনগণের বিক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফেটে পড়বে। ইতিমধ্যে

তার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। কেরালার দুর্বার কৃষক সংগ্রাম, বোম্বাইয়ে শ্রমিক ধর্মঘট, দিল্লীতে পুলিসের হামলার বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ, পাটনায় ছাত্র বিক্ষোভ, দক্ষিণ রেলে ধর্মঘট নূতন আন্দোলনের সূচনা। এই সম্ভাবনা বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তির সামনে গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

এমনি অবস্থায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কর্মীদের ও সাধারণ বামপন্থীদের সামনে প্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য হল স্বৈরাচারী একনায়কত্বের বিপদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা; জনগণের দৈনন্দিন দাবীর সংগ্রামের সংগে গণতন্ত্রের সংগ্রাম ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়েছে। নিয়মিত প্রচারের দ্বারা শাসকশ্রেণীর মুখোস খুলে দিতে হবে। জনগণের দৈনন্দিন দাবী নিয়ে, তা সে যতই ছোট হোক না কেন, ব্যাপক ভিত্তিতে গণ-আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা, রক্ষা করা ও শক্তিশালী করার চেষ্টা করতে হবে। যুক্ত আন্দোলনের মধ্যে যত বেশী সম্ভব জনগণকে টেনে আনতে হবে। সংকটের আঘাতে বিপর্যস্ত জনগণের বিভিন্ন অংশকে নিয়ে এমনি যুক্ত আন্দোলনের সম্ভাবনা দিন দিন বাড়বে। এমন কি শাসক পার্টির প্রভাবাধীন জনগণকেও যুক্ত আন্দোলনে আনার চেষ্টা করতে হবে। সংগে সংগে পশ্চিমবংগের গণতান্ত্রিক শক্তির সমর্থনে সারা দেশের মানুষকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। এরই মধ্য দিয়ে শ্রেণী-সমাবেশ বদলাবে এবং গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতির নূতন পথ উন্মুক্ত হবে। তাই, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের বৈপ্লবিক তাৎপর্য তার মধ্য দিয়েই পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

এই সামগ্রিক কর্তব্যের পটভূমিকায় পশ্চিমবংগে বামপন্থী গণতান্ত্রিক কর্মীদের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ আপাততঃ রুদ্ধ, আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস তীব্র, হাজার হাজার কর্মী জেলে, অগণিত কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা, কর্মীরা খুন হচ্ছে, হাজার হাজার কৃষক-শ্রমিক এলাকা চ্যুত। পুলিস এখানে বেপরোয়া, সরকার-পুষ্ট মস্তানেরা সক্রিয়। এ এক শ্বাসরোধকারী অবস্থা। এটা শাসকশ্রেণীর শক্তির পরিচয় নয়, এটা তার দুর্বলতা। কিন্তু গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে এটা সহজ অবস্থা নয়। রক্ত ঝরছে, অসহনীয় নির্যাতন চলছে, হয়ত আরও বাড়বে। এই কঠিন পরিস্থিতিতেই আমাদের পথ কেটে চলতে হবে।

পশ্চিমবংগে গণতান্ত্রিক শক্তির সংগ্রাম যেমন জোরদার, তেমনি দায়িত্বও সবচেয়ে বেশী। সারা ভারতে গণতান্ত্রিক শক্তির প্রথম সারির মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব পড়েছে পশ্চিমবংগের গণতান্ত্রিক জনগণের উপর। হতাশার কারণ নাই, হঠকারিতার স্থান নাই। সন্ত্রাসের মধ্যে জনগণকে আগে

ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, তাদের সংকট জর্জরিত যন্ত্রণাকাতর জনগণের মুখে প্রতিবাদের ভাষাকে ধাপে ধাপে জোরদার করতে হবে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও জনগণের দাবীর জন্য সংগ্রাম এখানে একাকার হয়ে গেছে। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি হতে পারে না। শাসকশ্রেণী নিত্য নূতন সংকটের বোঝা চাপিয়ে ও আক্রমণ চালিয়ে আন্দোলনের এবং প্রতি-বাদের ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করে দিচ্ছে। তাকে কাজে লাগাতে হবে। নূতন অবস্থার উপযোগী জনগণের সংগঠন ও দক্ষতা গড়ে তুলতে হবে। আন্দোলন ও সংগঠন সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে আলোচনা করা আমার এই প্রবন্ধের আওতার মধ্যে পড়ে না। শুধু এইটুকু জানি, কমরেড কার্ল মার্কস বলেছিলেন, যে নূতন সমস্যা যখন আসে তখন তার মধ্য থেকেই সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থী গণতান্ত্রিক কর্মীদের নিষ্ঠা, সততা, দৃঢ়তা, আত্মত্যাগ ও যোগ্যতা সম্বন্ধে আমরা সবাই গর্বিত। কোন সন্দেহ নাই যে রক্তাক্ত শরীর নিয়েও তারা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মহান কর্তব্যকে সামনে রেখে আগামী দিনের গুরু দায়িত্ব যোগ্যতার সংগে পালন করতে পারবে।

১৪ নভেম্বর বিপ্লব ও কৃষকের সংগ্রাম

মহান নভেম্বর বিপ্লব শুধু রুশ দেশের শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী জনগণকে যুগ-যুগান্তের শোষণ ও অত্যাচার হতে মুক্তি দিয়েছেন এই নয়, সারা পৃথিবীর জনগণের মুক্তির পথকে উদ্ভাসিত করেছে। নভেম্বর বিপ্লবই হোল প্রথম, যা মুক্তির কামনাকে কল্পনা বিলাসের স্তর হতে নামিয়ে বাস্তবে পরিণত করেছে। এই বিপ্লব শুধু জনগণকে মুক্তিই দেয় নি, মুক্তি অর্জনের সঠিক বৈপ্লবিক পথেরও নির্দেশ দিয়েছে। তাই, নভেম্বর বিপ্লব শুধু রুশ শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের বিপ্লব নয়, এর তাৎপর্য ও শিক্ষা বিশ্বব্যাপী এবং সর্বজনীন। পৃথিবীর জনগণের বেশির ভাগ লোক হোল কৃষক ও ক্ষেতমজুর। আমাদের দেশেও তাই। নভেম্বর বিপ্লবই এই অগণিত কৃষক সমাজকে তাদের ভারবাহী বেদনাময় দুঃসহ অন্ধকার জীবন হতে মুক্তির পথের নিশানা দিয়েছে এবং রুশ দেশে তা প্রয়োগ করে তার নির্ভুলতা প্রমাণ করেছে। এই পথ ও শিক্ষা অনুসরণ করেই (দেশে দেশে তার বাস্তব প্রয়োগের পার্থক্য আছে) কৃষকেরা শ্রমিকশ্রেণীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গণ-মুক্তির এলাকা প্রসারিত করে চলেছে।

নভেম্বর বিপ্লবের নেতা, সংগঠক ও স্থপতি কমরেড লেনিন প্রতিটি স্তরে তাঁর মহান বিপ্লবী ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা প্রয়োগ করে অগ্রগতির পথ নির্দেশ করেছেন এবং বিপ্লবকে সার্থক করে তুলেছেন। তাই, নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা ও কমরেড লেনিনের শিক্ষা এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শিক্ষা অনেক ব্যাপক ও গভীর। এই শিক্ষার মাত্র ২।১টি দিকই আমি এই লেখার মধ্যে তুলে ধরতে চাই, যা কৃষক আন্দোলনের বর্তমান অবস্থায় আমাদের স্মরণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

কমরেড মার্কস-এংগেলসের শিক্ষার উপর দাঁড়িয়ে কমরেড লেনিন প্রথম হতে যে বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন, তা হোল শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক মৈত্রী। তিনি বারে বারে বলেছেন, যে শ্রমিকশ্রেণী কখনই তার নিজের মুক্তি অর্জন করতে পারবে না, যদি না তারা কৃষকদের বুর্জোয়া প্রভাব হতে মুক্ত করে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে যুক্ত করতে পারে, যদি না শ্রমিক সংগ্রাম কৃষক বিদ্রোহের দ্বারা পুষ্ট হয়। সংগে সংগে তিনি শিখিয়েছেন, যে কৃষকেরা কোন দিনই মুক্তি অর্জন করতে পারবে না, যদি না তারা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে

সংগঠিত হয়ে তাদের বিপ্লবী উদ্যোগকে পূর্ণভাবে বিকশিত করে তোলে। তিনি বারে বারে জোর দিয়েছেন, যে কৃষকের সংগ্রাম ও তাদের ভূমিকার উপর সর্বতোভাবে বিপ্লবের ভাগ্য নির্ভর করছে।

তিনি রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন এবং কৃষকদের সচেতন ও সংগঠিত করার ব্যাপারে তাদের উদ্যোগ সংরক্ষিত করেছেন। বাস্তব অবস্থা ও আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে তিনি নির্দিষ্টভাবে কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন ও সেই মতো শ্লোগান দিয়েছেন। কৃষকদের প্রতিটি সংগ্রামকে—যা স্বৈরতন্ত্র ও সামন্তবাদকে আঘাত করেছে—তিনি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন ও শ্রমিকশ্রেণীকে তার সমর্থনে দাঁড় করিয়েছেন। সংগে সংগে তিনি কৃষকদের কাছে তাঁর স্বচ্ছ বক্তব্য উপস্থিত করেছেন ও তাদের সংগঠিত হতে সাহায্য করেছেন। তিনি তাদের চেতনার স্তর অনুযায়ী আশু সংগ্রামের জন্য আশু দাবির উপর যেমন জোর দিয়েছেন, তেমনি আশু কাজের অজুহাতে বা কৃষকদের নিম্ন চেতনার অজুহাতে মূল শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করতে কখনই ভোলেন নাই। তিনি তাদের কাছে কোনো দিন সস্তায় "দুধ মধুর" কথা বা অধিক প্ল্যানের কথা বলেন নাই। যারা এমন কথা বলেছে, তাদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি কৃষকদের কাছে সত্যকার মুক্তির জন্য কঠিন কঠোর সংগ্রামের কথা বলেছেন। কমরেড লেনিনের "গ্রামের গরীবদের প্রতি" বই খানা এই অমূল্য শিক্ষার রত্ন ভাণ্ডার। এটা বারে বারে আমাদের পড়া উচিত। এমনি ভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ও শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা না হলে নভেম্বর বিপ্লব সার্থক হতে পারতো না।

নভেম্বর বিপ্লবের একটা বড় শিক্ষা হলো এই যে, প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের উপর হতে কৃষকদের অবস্থার কোন উন্নতি হতে পারে না। বিপ্লবই তাদের একমাত্র মুক্তির পথ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কৃষকদের সংগ্রামকে ও উদ্যোগকে বিকশিত করে তুলতে হবে। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কৃষকরা আরো সংগঠিত ও সচেতন হবে, শাসক-গোষ্ঠীর চুরি বুঝবে এবং তারই উপর দাঁড়িয়ে লড়ে যাবে। সাময়িক আঘাত বা পশ্চাদপসরণ তাদের থামিয়ে রাখবে না। তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে নভেম্বর বিপ্লব। কমরেড লেনিন কৃষকদের সংগ্রামকে সব সময় সর্বতোভাবে সমর্থন করেছেন এবং তা গড়ে তুলতে তার পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে কমিউনিস্ট ও শ্রেণী সচেতন শ্রমিকদের সব সময় নির্দেশ দিয়েছেন। কৃষকরা যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখনও কমরেড লেনিন উৎসাহিত হয়ে তাদের সমর্থন করেছেন এবং তা হতে বিপ্লবীদের বুঝতে বা শিক্ষা নিতে বলেছেন। ১৯০২ সালে পোলতাভা, খারকভ ও অন্যান্য

এলাকার কৃষকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, তাদের গোলা ভেঙেছিল, কৃষকদের যে ফসল আত্মসাৎ করে জমিদাররা গোলায় মজুত করেছিল, তা সংগ্রামী কৃষকেরা বিলি করে দিয়েছিল এবং জমির বন্টনের দাবি করেছিল। এই সংগ্রামের কথা উল্লেখ করে কমরেড লেনিন বলেছেন, "কৃষকরা সীমাহীন অত্যাচার আর সহ্য করতে পারেনি এবং তাই তারা অবস্থা বন্টনের বদলাবার পথ খুঁজতে লাগলো। তারা সিদ্ধান্ত করেছিল এবং সঠিকভাবেই সিদ্ধান্ত করেছিল যে, বিনা সংগ্রামে না খেয়ে মরার চেয়ে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মরা ভাল। কিন্তু কৃষকরা নিজেদের জন্য ভাল অবস্থা জয় করতে পারেনি। রুশের জারের সরকার তাদের সাধারণ দাঙ্গাকারী ডাকাত বলে ঘোষণা করলো......জারের সরকার তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠালো, যেমন শত্রুর বিরুদ্ধে করা হয়, এবং কৃষকরা পরাজিত হয়েছিল।" তারপর কমরেড লেনিন বর্ণনা করেছেন কি হিংস্র আক্রমণ চালানো হয়েছে—নির্বিচারে জেল, খুন, এমনকি মেয়েদের উপর বলাৎকার পর্যন্ত করা হয়েছে।

কমরেড লেনিন এই সংগ্রামের পরাজয় হতে হতাশ না হয়ে শিক্ষা নিতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, যে কৃষকরা ন্যায় সংগত আদর্শের জন্য লড়েছিল। রুশের শ্রমিকশ্রেণী তাদের শহীদের স্মৃতির প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধা জানাবে। "কৃষকরা পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তারা বারে বারে উঠে দাঁড়াবে এবং এই প্রথম পরাজয়ের জন্য হতোদ্যম হবে না।" এই পরাজয়ের কারণ তিনি বের করেছেন এবং তার ভিত্তিতে কৃষকদের সচেতন করেছেন। তিনি বলেছেন, "বিদ্রোহে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সচেতন রাজনৈতিক লক্ষ্য ; আগে হতে বিদ্রোহের প্রস্তুতি করতে হবে ; সারা রাশিয়ায় তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং শহরের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে তাকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সাফল্যের এই তিনটি চাবিকাঠি তিনি কৃষকদের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং তাকে ঠিকমত ব্যবহার করেই নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে কৃষকরা মুক্তি অর্জন করেছে।

কৃষকদের সংগ্রামী শক্তি সম্বন্ধে তাঁর আস্থা ছিল গভীর ও বাস্তব-ভিত্তিক। কৃষকদের মধ্যে স্তরভাগ আছে ; তাদের মধ্যে যেমন বহু সংখ্যক আধা-সর্বহারা আছে, তেমনি পেটি-বুর্জোয়া (মধ্যবিত্ত) উপাদানও আছে। তাই, এদের মধ্যে অস্থিরতা আছে এবং থাকবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট বিপ্লবী শক্তি এদের মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেছেন, "কৃষকদের অস্থিরতা শ্রমিকশ্রেনীর অস্থিরতা হতে মৌলিকভাবে পৃথক। কারণ, বর্তমানে কৃষকেরা সব ব্যক্তিগত সম্পত্তি অনা-নিরপেক্ষভাবে রক্ষায় তত আগ্রহী

নয়, যতটা জমিদারী সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণে তারা আগ্রহী, এবং এই জমিদারী সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্যতম প্রধান রূপ।......সেই জন্য কৃষকরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অত্যন্ত উৎসাহী ও সবচেয়ে সংগ্রামী শরিক হতে পারে।" তিনি বলেছেন, যে কৃষকরা নিশ্চয় বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্রের দুর্গ হতে পারে, কারণ একমাত্র পুরাপুরি ফসল বিপ্লবই কৃষি সংস্কারের ক্ষেত্রে কৃষকদের সব কিছু, কৃষকেরা যা চায় বা স্বপ্ন দেখে তার সব কিছু দিতে পারে। কী অদ্ভুত বিশ্লেষণ, কী চমৎকার দূরদৃষ্টি এবং কী দৃঢ় বিশ্বাস।

রুশ বিপ্লবের এই শিক্ষা আমাদের নিকট খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৬৭-৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ভিন্ন হলেও আমরা দেখেছি কৃষকদের সংগ্রামের জোয়ার, জোতদার-মজুতদারদের উপর প্রচণ্ড আঘাত, দেখেছি শাসক-গোষ্ঠীর চীৎকার "কৃষকরা ডাকাত ও দাঙ্গাবাজ", দেখেছি ১৯৭০ সাল হতে শাসক-গোষ্ঠীর হিংস্র আক্রমণ, পুলিস, সি. আর. পি, মিলিটারী, জহ্লাদবাহিনী, দেখেছি সংসদীয় গণতন্ত্র হত্যা ও তীব্রতর সন্ত্রাস। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কৃষক সংগ্রামের মধ্যে সংগঠন চেতনা, ব্যাপকতা ও শ্রমিক সমর্থনের উপাদান অপ্রেক্ষাকৃত উন্নত ছিল বলে এখানে শাসক-গোষ্ঠী কৃষকদের দাবিয়ে দিতে (সাময়িকভাবেও) পারে নি। আমরা দেখেছি কৃষকদের মধ্যে কী অদ্ভুত সাহস, দৃঢ়তা ও দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়বার মনোভাব। এমনি অবস্থায় আগামী দিনের অগ্রগতিতে নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা আমাদের আত্মবিশ্বাস আরো সদৃঢ় করবে।

ভারতের শাসক-গোষ্ঠী ভূমিসংস্কারের বাগাড়ম্বর করছে। এ সম্বন্ধেও কমরেড লেনিনের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অবস্থার পার্থক্য নিশ্চয়ই আমরা ভুলে যাব না। তবু মূল বক্তব্য একই। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের আগে, বিশেষ করে পরে রুশ দেশের শাসকশ্রেণীও ভূমিসংস্কারের কথা বলেছে। তাই, প্রকৃত ভূমিসংস্কার সম্বন্ধে প্রথম হতে কমরেড লেনিন তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। সরকারের ভূমিসংস্কারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, যে স্টলিপিন (জারের মন্ত্রী) শাসন চাইছে সামন্তবাদী জমিদারী অর্থনীতিকে পুঁজিপতি জমিদারী অর্থনীতিতে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত করতে এবং ব্যাপক কৃষকদের ভূমিহীনে পরিণত করে জনগণকে দুঃস্থতার পর্যায়ে নামিয়ে এনে এবং কিছু ধনী বুর্জোয়া কৃষক সৃষ্টি করে, যে ধনী কৃষক পুঁজিবাদের অধীনে কৃষকদের মধ্য হতেই গড়ে ওঠে, তাদের শক্তিশালী করে তারা এই রূপান্তর ঘটাতে চায়। শাসক-গোষ্ঠী বুঝেছে যে, তাদের অনুসৃত নীতিতে দেশের বিকাশের পথ পরিষ্কার হবে না, যদি না মরচে-ধরা মধ্যযুগীয় জমিদারী ব্যবস্থা

ভাঙা যায়। এই কাজ তারা সাহসের সাথে করতে চাইছে "জমিদারদের স্বার্থে"।

বুর্জোয়া ক্যাডেটদের ভূমিসংস্কার দাবি সম্বন্ধে তিনি আরো বলেছেন, যে তারা কিছু পরিমাণে বৃহৎ ব্যক্তিগত জমির মালিকানা বজায় রাখতে চায়, সাথে সাথে কৃষকদের কিছু আংশিক সুবিধা দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনকে দুর্বল করতে চায়। একথা মনে রাখতে হবে যে, রুশ দেশের জার শাসন ও সামন্তবাদী কাঠামোর মধ্যে পুঁজিবাদী বিকাশকে বাড়িয়ে তুলছিল। জার শাসনের নীতি ও তদানীন্তন বুর্জোয়াদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কমরেড লেনিন যা বলেছেন তা মেলালে দেখা যাবে যে, ভারতের জমিদার-পুঁজিপতি শাসনের প্রতিনিধি-দের ভূমিসংস্কারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে তা হুবহু মিলে যায়। বহুদিন আগে কমরেড লেনিন যা বলেছেন, ভারতের অভিজ্ঞতায় আমরা তারই যথার্থতা দেখতে পাচ্ছি। সামন্তবাদী শোষণের উপরে পুঁজিবাদী বিকাশের চেষ্টা এবং সেই সঙ্গে কৃষকদের প্রতারিত করার ও বিভক্ত করার অপচেষ্টা।

কমরেড লেনিন সেই জন্যই বারে বারে স্বার্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, "কৃষকরা জেনে রাখুক যে কোন রকমের কৃষি সংস্কার কাজে আসবে না, যদি তা পুরানো কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়"। তিনি বলেছেন, যে শ্রমিকের পার্টি দ্বিধাহীনভাবে কৃষকদের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। এমনি সংগ্রামের সাফল্যের ভিত্তিতে··"একমাত্র পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে, একমাত্র জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, তাদের কাছে বাধ্য এবং তাদের দ্বারা প্রত্যাহৃত সরকারী অফিসারদের উপর ভূমিসংস্কার ন্যস্ত হতে পারে।"

নভেম্বর বিপ্লবের অন্যতম বড় শিক্ষা হোল এই যে, কৃষকদের সংগ্রামের পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া কোন প্রকৃত ভূমিসংস্কার করা সম্ভব নয়। এই ভূমি-সংস্কারের দাবিকে সামনে রেখেই কৃষক সংগ্রাম করবে, এগিয়ে যাবে, কিছু আংশিক দাবিও আদায় করতে পারে, কিন্তু তাকেও রক্ষা করতে হবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। একমাত্র গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের মধ্য দিয়েই কৃষকের স্বার্থে ভূমিসংস্কার কার্যকরী ও স্থায়ী হতে পারে। কমরেড লেনিন এ বিষয়ে কোন মোহ সৃষ্টির অবকাশ রাখেন নাই। তিনি বলেছেন, "কৃষকদের কাছে আমাদের স্পষ্টভাবে ও দৃঢ়ভাবে বলতে হবে; যদি তোমরা কৃষি বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাও, তাহলে তোমাদের রাজনৈতিক বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে; কারণ রাজনৈতিক বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে না গেলে কোন স্থায়ী কৃষি বিপ্লব হবে না অথবা আদৌ হতে পারে না। পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া, জনগণের দ্বারা সরকারী অফিসার নির্বাচিত না হওয়া ছাড়া—আমরা পারি হয় কৃষক বিদ্রোহ অথবা

বুর্জোয়া কৃষি সংস্কার।” কৃষকদের সংগ্রাম, কৃষকদের উদ্যোগ ও কৃষকদের নির্বাচিত কমিটির উপর সব সময়ে তিনি জোর দিয়েছেন। কমরেড লেনিনের শিক্ষায় রুশ দেশের শ্রমিক-কৃষক শিক্ষিত ও সংগঠিত হয়েছিল বলেই তারা নভেম্বর বিপ্লব সফল করতে পেরেছে। এ শিক্ষা সর্বদেশে প্রয়োজ্য।

ভারতের শাসকশ্রেণী আজ কৃষকদের ধোঁকা দেবার জন্য ও সংগ্রামের পথ হতে সরিয়ে নেবার জন্য কৃষির উন্নয়নের বড় বড় বুলি ও প্ল্যানের কথা বলছে। এটা ভারতের শাসকশ্রেণীর নূতন আবিষ্কার নয়। রুশ বিপ্লবকেও সেখানের শাসকশ্রেণীর এমনিভাবে বক্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ সম্বন্ধে বেশী বলার দরকার নাই। শুধু কমরেড লেনিনের কথা কয়েকটি উদ্ধৃত করে দিলেই হবে।

তিনি বলেছেন, “কৃষকদের সাহায্য করার এই সব কথা ধনীদের সাহায্য করা ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ ব্যাপক গরীব জনগণের জমি নাই, চাষের বলদ নাই, কিন্তু সংগতি নাই। ...সব রকমের অফিসার ও যারা তাদের মত ভাবে তারা বলতে ভালবাসে যে, কৃষকের ‘প্রয়োজন’ দুটি জিনিস, জমি (তা বেশী নয়, তা ছাড়া তারা বেশি নিতে পারেও না, কারণ ধনীরা মেরে রেখেছে) এবং উপার্জন। অতএব, তারা বলায়, কৃষকদের সাহায্যের জন্য গ্রামে কিছু ‘ব্যবসা’ চালু করা প্রয়োজন, যাতে কৃষকদের ‘উপার্জনের ব্যবস্থা’ করা যায়। এমনি কথা নেহাৎ ধাপ্পাবাজী।” ভারতের শাসক-গোষ্ঠী ঠিক এই পুরানো বস্তা-পচা ধাপ্পাই দিচ্ছে।

কমরেড লেনিন মাঝারি চাষীদের উন্নয়ন সম্বন্ধে বলেছেন, “সমস্ত বুর্জোয়াশ্রেণী মাঝারি চাষীকে তার চাষের উন্নতির জন্য সব রকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে (সস্তা লাঙল, কৃষি ব্যাঙ্ক, ঘাসের চাষ, সস্তা বলদ, সার ইত্যাদি) এবং নানা রকমের কৃষি সমিতিতে তাদের যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করে (যাকে তারা বলে সমবায়)—যে সমিতিগুলি চাষের পদ্ধতি ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নানা রকমের কৃষকদের জড়ো করে, এমনি সমিতিতে যোগ দিতে বলে মাঝারি চাষীদের নিজেদের দলে টানতে সচেষ্ট।” কমরেড লেনিন বলেছেন, যে আমরা তাদের বলব: উন্নত চাষ ভাল জিনিস। সস্তা লাঙল পেলে তা কিনলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যখন কেউ গরীব বা মাঝারি চাষীকে বলে যে, ধনীদের গায়ে হাত না দিয়ে শুধু উন্নত চাষের মাধ্যমে তারা দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবে ও নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, তাহলে তা হোল প্রবঞ্চনা মাত্র। তিনি বলেছেন: “এই সব উন্নয়ন ব্যবস্থা, কম দাম এবং সমবায় অন্য যে কোন লোকের চেয়ে ধনীদের অনেক বেশি পুষ্ট করে। ...একজন কি দু-জন মাঝারি চাষী এই সব উন্নয়ন ব্যবস্থা ও সমবায়ের সাহায্যে

ধনীর স্তরে উঠতে সমর্থ হতে পারে, কিন্তু সমস্ত মাঝারি চাষী বেশি বেশি করে দারিদ্রের গহ্বরে ডুবে যাবে।" সমস্তটা পড়লে মনে হয় যেন কমরেড লেনিন কংগ্রেসী শাসকদের ধাপ্পাবাজীর জবাব দীর্ঘদিন আগে লিখে রেখেছিলেন। রুশের শাসকশ্রেণী তবু সস্তা সার ও সস্তা লাঙলের কথা বলেছিল।

কমরেড লেনিন তথাপি দেখিয়েছেন, যে সামন্তবাদী পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মাঝারি চাষী দরিদ্র হয়ে যাবে। ভারতের শাসকশ্রেণী সস্তায় সার, সস্তায় লাঙল বা সস্তায় জলের কথা বলতে পারছে না। এখানে সারেরই দর বাড়ানো হচ্ছে। তবু উন্নয়ন, সমবায় ও ব্যাংকের কথা বলে তারা কৃষকের উন্নতির কথা বলে ধাপ্পা দিতে চাইছে। লটারির টিকিট কেনার মত মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে শাসকশ্রেণী কৃষকদের বিপ্লবী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম হতে সরিয়ে নিতে চাইছে। নভেম্বর বিপ্লব দেখিয়েছে যে ইতিহাস এই অপচেষ্টাকে সফল হতে দেবে না।

কমরেড লেনিন শাসকশ্রেণীর জবাবে বলেছিলেন যে, আমরা কৃষকদের বলব: "সুবিধা কিছু পেলে নাও; কিন্তু ভুলো না, নিজেদের কখনও বিক্রী করো না।" "বড় কম মূল্যে" ধনিকশ্রেণী কৃষককে শ্রমিকশ্রেণীর কাছ হতে "কিনে নিতে" চায়। নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষার আলোকে আমরা এইটুকুই বলব যে, ইতিহাস অনেক এগিয়ে গেছে। "এতো অল্প মূল্যে" ধনিকশ্রেণী আমাদের দেশে কৃষকদের কিনতে পারবে না।

নভেম্বর বিপ্লব ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের কৃষককে অনেক কিছু শিখিয়েছে। এখানে কৃষক আজও শোষিত, অত্যাচারিত। ধনতন্ত্রের অবক্ষয়ের যুগে তারা আজ দুঃস্থতার চরমে নেমেছে। কিন্তু তারাও চলেছে সংগ্রামের পথ বেয়ে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষক ও খেতমজুর আজ অনেক বেশি সংগঠিত, সচেতন, দৃঢ়; তাদের পাশে রয়েছে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি। তাই তারা শাসকশ্রেণীর এত হিংস্র আক্রমণেও মাথা নোয়ায় নাই। কোন ধাপ্পাবাজী তাদের সংগ্রামের পথ হতে সরাতে পারবে না। নভেম্বর বিপ্লব সহজ পথের কথা বলে নাই, বলেছে কঠিন সংগ্রামের, কিন্তু নিশ্চিত জয়ের পথের কথা।

১৫ নতুন পরিস্থিতিতে কৃষক আন্দোলন

একদিকে মাত্রাহীন ধাপ্পাবাজী, আকাশ-ছোঁয়া মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও বেপরোয়া কুৎসা, অন্য দিকে ক্রমবর্ধমান আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস, গুণ্ডামী ও পুলিসী হামলা। জনসাধারণের ওপর আগের চেয়ে অনেক দ্রুত ও ভারী শোষণের এবং লুন্ঠনের বোঝা চাপানো হচ্ছে। যত জোরে গরিবী হঠানোর চীৎকার করা হচ্ছে, তত দ্রুত জিনিসপত্রের দাম ও বেকারী বাড়ানো হচ্ছে। মানুষের প্রতি যত দরদের ভান করা হচ্ছে, তত বেশী রিলিফের ব্যাপারে খরাপীড়িত দুঃস্থ জনগণকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে এবং স্বল্প রিলিফ নিয়ে দলবাজী ও দুর্নীতি চালানো হচ্ছে। কৃষির উন্নতি ও গ্রামে বিদ্যুতের ঝলকানির কথা বলে সারের দর বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং গরিবের কেরোসিনের আলোকে নিভিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। যত নাটকীয় ভঙ্গীতে ভূমিসংস্কারের বাগাড়ম্বর করা হচ্ছে, তত জোরে খাস জমি, উদ্ধার করা বেনামী জমি ও ভাগের জমি থেকে প্রকৃত দখলদার কৃষকদের উচ্ছেদ, ফসল লুট করার চেষ্টা হচ্ছে এবং গরিব ও মাঝারি চাষীদের খাজনা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ যাতে এই সব আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বা না পারে আন্দোলন করতে তার জন্য পুলিসের হাতকড়া, ডাণ্ডা ও রাইফেল এবং গুণ্ডা-মস্তানদের ছুরি, পাইপগান ও পিস্তল দিয়ে তাদের কন্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেবার অপচেষ্টা চলছে। তাই, এক কথায় "জন-কল্যাণের" চীৎকারের আড়ালে দেশের জনগণকে হাত পা বেঁধে গলা টিপে জোতদার, মহাজন ও বৃহৎ পুঁজির যূপকাষ্ঠে বলি দেবার অপচেষ্টা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ অপেক্ষাকৃত সচেতন, সংগঠিত ও সংগ্রামী শক্তির ধারক। তাই, ব্যাপক সন্ত্রাস ও গুন্ডামীর দ্বারা তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার চক্রান্ত হচ্ছে। নির্বাচনে জালিয়াতি ও গুণ্ডামী করে ক্ষমতা দখলের পর, জনগণ সম্বন্ধে ভীত সন্ত্রস্ত কংগ্রেসী শাসকদের পশ্চিমবঙ্গে এটাই হলো প্রধান চরিত্র।

১৯৭০ সালে মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেবার পর হতে এই আক্রমণ বাড়তে থাকে এবং জনগণের প্রতিরোধের মুখে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসী শাসকেরা হিংসায় উন্মত্ত হয়ে ১৯৭২ সালের নির্বাচনের সময় তাকে আরো এক নূতন স্তরে তোলে। অতীতে দমননীতি ও অত্যাচার সব সময় থেকেছে

এবং সময়ে সময়ে তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, তথাপি তা সংসদীয় ব্যবস্থার পরিধির মধ্যে থাকত। তখন দুর্নীতি থাকলেও নির্বাচন হ'ত, বিধান সভাকে জনগণের স্বার্থে সীমাবদ্ধভাবে হলেও ব্যবহার করা যেত। এখন সন্ত্রাস ও গুণ্ডামীকে সেই পরিধির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভারতের বেশীর ভাগ রাজ্যে সেখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আপেক্ষিক দুর্বলতার জন্য কংগ্রেসী শাসকেরা নূতন ধাপ্পাবাজী দিয়ে জনগণকে সাময়িকভাবে ভোলাতে পেরেছে। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক শক্তি দ্রুত বিকাশ লাভ করেছিল বলে এখানে তাদের সে অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে তারা তা দেখেছে ; ১৯৭২ সালের নির্বাচনের আবহাওয়ায় তারা নিশ্চিত পরাজয়ের গন্ধ পেয়েছিল। তারা বুঝেছিল যে, ভারতের অন্যান্য বহু স্থানের জনগণ সাময়িকভাবে ভুললেও বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সংকটের চাপে তারা নূতন করে মোহমুক্ত হয়ে গণ-সংগ্রামের মধ্যে নেমে পড়বে। তখন পশ্চিমবঙ্গের শক্তিশালী গণশক্তি বেঁচে থাকলে তা তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকবে ও বিকল্প পথের সন্ধান দেবে। তাই, কংগ্রেসী শাসকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রকেই হত্যা করেছে, এবং আরো বেশী সন্ত্রাস ও গুণ্ডামীর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক শক্তিকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ধ্বংস করতে চায়। এই ভাবে না দেখলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী শাসকদের হিংস্রতাকে বোঝা যাবে না।

এমনি পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব ও কঠিন কর্তব্য উপস্থিত হয়েছে। এই গণতান্ত্রিক শক্তির অন্যতম প্রধান অংশ এবং সংখ্যা ও ব্যাপকতার দিক দিয়ে দেখলে সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ হলো সংগঠিত কৃষক আন্দোলন। গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতঃ কৃষক আন্দোলনের দ্রুত বিকাশই এখানে শ্রেণী সম্পর্কের ভারসাম্যকে শাসকশ্রেণীর বিপক্ষে বিশেষভাবে পরিবর্তিত করেছে। গ্রামাঞ্চলে শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভাবের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গেছে। ১৯৬৭ সালের আগে পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সাধারণভাবে দেখতে গেলে কংগ্রেসের প্রভাব বেশী ছিল। পরবর্তি সময়ে সেটা ভেংগে গেছে। লক্ষ লক্ষ গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুর—যাদের বিপ্লবী শক্তির বিকাশের গুরুত্বের ওপর কমরেড লেনিন অত্যন্ত জোর দিয়েছিলেন। আমাদের দেশে যাদের সংগঠিত শক্তির দুর্বলতা ছিল গণতান্ত্রিক শক্তির বড় দুর্বলতা —সেই অগণিত গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুররা অতীতের জড়তা কাটিয়ে নতুন চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে ইতিহাসের স্রষ্টা রূপে এবং সংগঠিত শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এটাই হয়ে উঠেছে জমিদার-পুঁজিপতি শোষকদের

প্রতিনিধি কংগ্রেসী-শাসকদের কাছে সব চেয়ে ভয়ের বস্তু। এদের যখন আর ভুলিয়ে স্বেচ্ছায় গোলামে পরিণত করা যাচ্ছে না। তাই এদের পিটিয়ে, খুন করে ও ভয় দেখিয়ে গোলাম বানাতে হবে—এটাই হলো কংগ্রেসী শাসকদের নীতি। ফলে সমগ্র পরিস্থিতিতে নূতনত্ব দেখা দিয়েছে।

আজকের দায়িত্ব ঠিকমত বুঝতে হলে সংক্ষেপে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনের বিকাশের ধারাকে স্মরণ করা প্রয়োজন। ১৯৩০-৩২ সাল হতে ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন প্রধানতঃ ছিল রায়ত কৃষক ও প্রজাদের আন্দোলন। ১৯৪৬-৪৭ সালে বিখ্যাত তে-ভাগা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা এক নূতন স্তরে উঠল। তখনও এটা আক্ষরিক অর্থে জমির সংগ্রাম ছিল না বটে, কিন্তু তা ছিল জমির সঙ্গে সম্পর্কিত ভাগের দাবীর আন্দোলন। এর থেকেই ধাপে ধাপে জমির অধিকারের প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রথম বর্গাচাষীরা ব্যাপকভাবে সংগ্রামের পুরোভাগে এলো। ক্ষেতমজুররাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের পটভূমিকায় এই সংগ্রাম এক জাতীয় সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় তখন এই সংগ্রাম তেমন ব্যাপকতা লাভ করতে পারে নি, বড় বড় জোতদার-প্রধান পশ্চিম দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায় এবং বিশেষভাবে ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুরে তা কিছুটা বিস্তার লাভ করেছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর পশ্চিমবঙ্গে উপরোক্ত সংগ্রামের ঐতিহ্য বহন করে ১৯৪৮-৫০ সালে বড়-জোরদার প্রধান জেলাগুলিতে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ভাগের জন্য আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু, তখনও এই সংগ্রাম ছিল প্রধানতঃ অল্প এলাকায় বর্গাদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

১৯৫৪-৫৫ সাল হতে অর্থাৎ জমিদারী ক্রয় আইন পাশের পর হতে সর্বত্র ব্যাপক কৃষক উচ্ছেদ, কৃষক আন্দোলনের সামনে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে উচ্ছেদ বিরোধী সংগ্রাম সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। বর্গাদার রেকর্ডের এবং ভাগের দাবীতেও আন্দোলন হয়। পরবর্ত্তিকালে কিন্তু এই শেষোক্ত দাবীর আন্দোলন সর্বত্র ব্যাপকতা লাভ করে না। ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুরের কিছু শক্ত বর্গাদার প্রধান এলাকা ছাড়া অন্যত্র রেকর্ড-এর আন্দোলন তেমন দানা বাঁধতে পারে নাই। কারণ, রেকর্ড করতে গেলে উচ্ছেদ বেড়েছে, অথচ তা প্রতিরোধের মত সংগ্রামের শক্তি গড়ে ওঠে নাই। প্রতি বছরে চাষ ও ফসল কাটার সময় উচ্ছেদ প্রতিরোধ সমস্যা ও ফসল রক্ষা করা সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই প্রশ্নে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস সরকারের আইনের আসল শ্রেণী চরিত্র কৃষকদের সামনে ফুটে উঠতে লাগল। এমনই ভূমি সংস্কারের আইন

হলো, জমির সিলিং ও বর্গাদারের অধিকার সম্বন্ধে এমনই বিধান হলো যে, উদ্বৃত্ত জমি ও ফসলের বেশী ভাগ পাবার বদলে কৃষকদের মাথায় নেমে এলো উচ্ছেদের খড়্গ। কৃষকরা যখন আইনের প্রদত্ত অধিকারগুলি আংশিকভাবে কার্যকর করার চেষ্টা করেছে, তখন সরকার তাদের বিরুদ্ধে চালিয়েছে উৎকট দমননীতি। ফলে "দখল রেখে চাষ কর ও ফসল রক্ষা কর" এই আওয়াজ হয়ে দাঁড়াল সাধারণ রণধ্বনি। ভাগের সংগ্রাম, জমি রক্ষার সংগ্রামে পরিণত হলো। এই সংগ্রাম শুধু মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা প্রভৃতির কিছু অংশে সীমাবদ্ধ না থেকে, প্রায় সব জেলাতেই ছড়িয়ে পড়ল। যদিও তখন পর্যন্ত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। জমি সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে এই ভাবে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে কৃষক আন্দোলন এক ধাপ এগিয়ে গেল।

উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জমির আন্দোলনে এক নূতন দাবীর আওয়াজও দেখা দিতে লাগল, যা ১৯৬৭ সালের পরবর্তী যুগে অত্যন্ত গুরুত্ব অর্জন করেছে ; তা হলো খাস জমি বিলি ও বেনামী জমি উদ্ধারের আন্দোলন। ১৯৫৮ সাল হতে এই আন্দোলন এগুতে লাগল। যে জেলা-গুলিতে অনেক দিন হতে বর্গাদার আন্দোলন হয়েছে, স্বভাবতঃ সেই ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর প্রভৃতিতেই এই আন্দোলন প্রথম দানা বেঁধেছে। ভূমিসংস্কার আন্দোলনে এটা একটা নূতন পদক্ষেপ ও তা বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ। এতদিন পর্যন্ত বর্গাদারদের দখলে থাকা জমিগুলিতে ভাগ দখল রক্ষা করাই ছিল প্রধান সংগ্রাম। এই প্রথম শুরু হলো জোতদার-জমিদারদের বাড়তি জমি বণ্টনের জন্য সংগ্রাম। আইনতঃ, যে সামান্য পরিমাণ জমি খাস হয়েছিল, অথচ যেগুলি কংগ্রেস সরকার জোতদারদেরই দখলে রেখে দিয়েছিল সেগুলিও জমিহীন বা ভাগ দখলকার কৃষকদের মধ্যে বিলি করা এবং বেনামী জমি উদ্ধার করার জন্য সংগ্রাম শুরু হলো। বড় জোতদারদের যে জমি বেনামী বলে সন্দেহ হয়েছে সেগুলি দখলে রাখা, তার ভাগ না দেওয়া এবং সরকারকে আইন অনুযায়ী তদন্ত করতে বাধ্য করা ছিল আন্দোলনের কৌশল। তার জন্য প্রতি বৎসর হাজার হাজার কৃষককে গ্রেপ্তার হতে হয়েছে, অনেককে মার খেতে হয়েছে, ২।১ জন করে খুনও হয়েছে। এর ফলে কিছু পরিমাণ জমি প্রকৃতই উদ্ধার করা গিয়েছিল। যদিও এমনি আন্দোলনে একটা নূতন পদক্ষেপের সূচনা করল। এইভাবে অতীত হতে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কৃষক আন্দোলন ধাপে ধাপে নূতন স্তরে উঠেছে। কংগ্রেস সরকারের আইন ও তার প্রয়োগের শ্রেণী চরিত্র সম্বন্ধে কৃষকদের সংগ্রামলব্ধ তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংগ্রামের মনোভাবও বেড়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি ঘটনায় দেখা গেল কীভাবে কৃষকদের অভিজ্ঞতা ও চেতনা বাড়ে। এখানে বর্গাদারেরা আধা ভাগও পেতো না। ১৯৬৫ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আইনে বর্গাদারের অধিকার সম্বন্ধে এক ইস্তাহার প্রচার করে। এতে বিশ্বাস স্থাপন করে নবগ্রাম পার্শ্ববর্তী থানার গরীব বর্গাদারেরা রসিদ ও মাত্র আধাআধি (৬০।৪০ নয়) ভাগ দাবী করে। জোতদারেরা ক্ষিপ্ত হয়ে শুধু কৃষকের ধানই লুট করল না, সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা শুরু করে দেয়। যে শাসনযন্ত্র ইস্তাহার দিয়েছিল, সেই শাসনযন্ত্রেরই অংশ পুলিস সর্বতোভাবে জোতদারদের সাহায্য করল। এমনি বহু অভিজ্ঞতা কৃষকদের চেতনা ও সংগ্রামী শক্তির বিকাশে সাহায্য করল।

কৃষকদের এই শক্তি ও চেতনাই ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করতে সাহায্য করল। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন এবং ১৯৬৯ সালে আরো উন্নত পর্যায়ের ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা কৃষক আন্দোলনের দুর্বার অগ্রগতির অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করল। পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন কংগ্রেসকে পরাজিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলেই এখানে যুক্তফ্রন্ট সরকারের চরিত্র ছিল সংগ্রামী। এই সব আন্দোলনের নেতা ও সংগঠক মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ছিল যুক্তফ্রন্টের প্রধান শক্তি। এই সরকার জনগণের মনে অলীক আশা সৃষ্টি করে নাই, জনগণের সংগ্রামের উৎস মুখ খুলে দিতে সাহায্য করেছিল। গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিসের ব্যবহার বন্ধ করে এই সরকার এক তাৎপর্যপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।

ওই প্রসঙ্গে একটা কথা পরিষ্কার বোঝা দরকার। এই যুক্তফ্রন্ট সরকার গণ-আন্দোলনের বিস্তৃতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু আন্দোলন করেছে সংগঠিত গণশক্তি। অতীতে নানা বাধা ও পুলিসী আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে কৃষক আন্দোলন ধাপে ধাপে যে স্তরে উঠেছিল। তাই পরবর্তী অনুকূল পরিস্থিতিতে ব্যাপক অভিযানের ভিত্তি তৈরী করেছিল। বাঁধ ভাঙা বন্যার মত কৃষক আন্দোলন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। শুধু মাত্র স্বল্প সংখ্যক অগ্রণী কৃষকই নয়, প্রতি জেলায় ও এলাকায় অগণিত গরীব কৃষক এবং ক্ষেতমজুর সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে জেগে ওঠার মত গোলামীর মনোভাব ছেড়ে মাথা তুলে দাঁড়াল। এরা নিজেদের মধ্যে নূতন শক্তির সন্ধান পেলো। এরা শুধু সংগ্রামী শক্তিরই পরিচয় দিল না, গোলাম সমাজের ক্লেদ ও ক্লীবত্ব দূর করে নূতন মনুষ্যত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করল। আন্দোলনের জোয়ারে কিছু কিছু ভুল হয় নি তা নয়, কিন্তু তা

বড় ছিল না। আমি নিজে গরীব কৃষকদের বুদ্ধি, চেতনা ও নেতা হবার যোগ্যতা দেখে অভিভূত হয়েছি। জমিদার-জোতদারদের বিচ্ছিন্ন করে সাধারণ মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ আমি দেখেছি। ছোটখাটো ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিলেই তারা দ্রুত শুধরে নিতে চেষ্ট করেছে।

১৯৬৬ সাল পর্যন্ত আন্দোলন যে স্তরে উঠেছিল তারই ওপর দাঁড়িয়ে এই সময়ে সংগ্রাম এগিয়ে গেল। একটা একটা করে ফুলের পাপড়ি খোলার মত কৃষকদের সংগ্রামী শক্তি ও চেতনা ধাপে ধাপে অথচ দ্রুতগতিতে বেড়েছে। এক বছরের অভিজ্ঞতা এক মাসে এক দিনে হয়েছে। প্রথম স্তরে সর্বত্র উচ্ছেদ বন্ধ করা হয়েছে, তারপর সংগ্রাম উঠেছে খাস জমি বিলির স্তরে। লক্ষ্য করতে হবে যে, সরকার এই সব কাজে সাহায্য করেছে মাত্র। কিন্তু কাজগুলি শুষ্ঠুভাবে দ্রুতগতিতে করেছে সংগঠিত কৃষকরা। ১৯৬৯ সালে পরবর্তী ধাপে সংগ্রাম আরো ব্যাপক হয়েছে ও উচ্চ স্তরে উঠেছে। যে সব জেলায় খাস জমি বিলির কাজ শেষ হয় নাই তা শেষ করে দ্রুত আন্দোলন বেনামী জমি উদ্ধারের স্তরে সর্বত্র উঠে গেল। সত্যিকারের ভূমিসংস্কারের পথে এ এক বিরাট পদক্ষেপ।

আইন ও প্রশাসন যা করতে পারে নাই, জাগ্রত কৃষক তাই করতে লাগল। কৃষকদের শ্রেণী চেতনা বেড়ে চলল, তাদের আত্মবিশ্বাস আরো বাড়ল। বুর্জোয়া আইন-কানুন, বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কৃষকদের একটা মোহ থাকে ও ছিল। বিশেষ করে বিচার ব্যবস্থার উপর শ্রেণী চরিত্র সম্বন্ধে তাদের সঠিক চেতনা ছিল না। জোতদাররা বেনামী জমি বাঁচাবার জন্য যখন বিচার ব্যবস্থার অপ-ব্যবহার করতে লাগল (এলোপাথাড়ি ইনজাংশন দ্বারা), তখন কৃষকরা প্রথম একটু থমকে দাঁড়ালেও শীঘ্রই এই বাধা অপসারিত করে ন্যায় নীতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে গেল। কমরেড কার্ল মার্কস বলেছেন যে, মানুষ নিজের দ্বারা পারিপার্শ্বিককে বদলায়, তেমনি তার মধ্য দিয়ে সে নিজেকেও বদলায়। তারই অদ্ভুত প্রমাণ দেখা গেল—জমির সংগ্রামের বাধা অপসারিত করতে গিয়ে কৃষক তার নিজের চেতনাকেই বদলাতে লাগল। বিচার ব্যবস্থারও শ্রেণী চরিত্র সে বুঝতে শুরু করল।

এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জনগণ আরো এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগল। তা হলো, কৃষকের সংগ্রামের সাহায্য ছাড়া উপর হতে আমলাতন্ত্রের দ্বারা কোন ভূমিসংস্কার কার্যকর করা যায় না, এই অভিজ্ঞতা সারা ভারতে গণতান্ত্রিক শক্তির প্রসারে সাহায্য করেছে।

আমি এই প্রবন্ধে ১৯৬৭-৭০ সালের সময়ের কৃষক আন্দোলনের বিরাট সাফল্য—উচ্ছেদ বন্ধ, খাস জমি বিলি, বেনামী জমি উদ্ধার, চোরাবাজারী

সংকুচিত করা, মজুরী বৃদ্ধি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করছি না। তা বহুবার আলোচিত হয়েছে। আমি কৃষক আন্দোলনের ব্যাপকতা, তীব্রতা, উচ্চস্তরে উন্নয়ন এবং পুরানো যুগের অন্ধ ভীরু গরীব কৃষকদের আত্মবিশ্বাসে ভরপুর জাগ্রত নূতন কৃষকে রূপান্তর—এই সবের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। জমির সংগ্রাম কৃষক সমাজের সবচেয়ে বেশীর ভাগ অংশ নীচের তলাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে এলো। জমিহীন মজুর শুধু জমির সংগ্রামে এগিয়ে এলো না, গ্রামের গরীবের ঐক্যের পট-ভূমিকায় সে মজুরীর ও কাজের সংগ্রামে এবং মজুতদার-বিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে গেল। কংগ্রেস শাসনে যে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, তাদের সক্রিয় ভূমিকা আরো ফুটে উঠতে লাগলো। এটা এখনও দুর্বল, তবু তা এগিয়েছে।

আমাদের গ্রামগুলির দারিদ্র পীড়িত বিষাদময় বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু, এই মানুষগুলির চিন্তায়, চেতনায় ও সংগ্রামী শক্তির বিকাশে বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে। স্বেচ্ছায় গোলামীকে মেনে নেবার মত পুরানো কৃষক আর নাই, তা আর কোন দিন ফিরে আসবে না। গরীব কৃষকদের মেরে পিটিয়ে সাময়িকভাবে দাবিয়ে রাখা যেতে পারে, কিছু দিন তার মুখ বন্ধ রাখা যেতে পারে, কিন্তু তাকে দিয়ে স্বেচ্ছায় গোলামী মানিয়ে নেওয়া যাবে না। এইখানেই শাসকদের ভয়, আর এইখানেই গণতান্ত্রিক শক্তির ভবিষ্যৎ। সমাজের প্রগতিশীল পরিবর্তনে আগ্রহী যে কোন গণতান্ত্রিক মানুষ গ্রামের কৃষকদের এই পরিবর্তনে খুশী না হয়ে পারে না। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের এই তীব্রতায় জোতদার-জমিদারেরা এবং সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের দল আতঙ্কিত হয়ে উঠল। এর মধ্যে তারা তাদের মৃত্যুর পরোয়ানা দেখতে পেলো। তাই যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে গেল।

এই জন্যই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙেও শাসক-গোষ্ঠী নিশ্চিন্ত হতে পারল না। জাগ্রত কৃষকদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার জন্য, জোতদার-মজুতদারদের পুরোনো প্রভুত্ব ফিরিয়ে আনার জন্য উত্তরোত্তর তীব্র আক্রমণ চলল। এলো সি. আর. পি, মিলিটারী, তৈরী হলো খুনী গুণ্ডা-মস্তানের দল, শুরু হলো খুন ও জেল ভর্তির পালা। দমননীতি আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের স্তরে উঠল। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকাররূপী কৃষকদের রক্ষাকবচ কেড়ে নিলেও ঐ সময়ে ব্যাপক কৃষকদের মধ্যে যে চেতনা ও সংগ্রামী শক্তি গড়ে উঠেছে, তাকে কেড়ে নেওয়া সম্ভব হয় নাই। এরই ওপর দাঁড়িয়ে কৃষকরা তাদের অর্জিত অধিকার রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ শক্তির পরিচয় দিয়েছে। ১৯৬৭-৭০ সালের সংগ্রামের শিক্ষা না থাকলে এমনি একটানা

হিংস্র আক্রমণের সামনে জাগ্রত কৃষকেরা এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে। জমির সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেভাবে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের কৃষক ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তাতে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিগত বাধা প্রচণ্ড আঘাত খেয়েছে। আজ আর জাতি বা সম্প্রদায়ের নামে কৃষকদের বিভক্ত করা আগের মত সহজ নয়।

১৯৭০-৭১ সালে রাজ্যপালের শাসনে কেন্দ্রের নির্দেশে যখন জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে, তখন কৃষক আন্দোলনের সামনে এক নূতন কর্তব্য দেখা দিল। সেই সংগঠিত ও জাগ্রত কৃষকরা যোগ্যতার সংগেই সে কর্তব্য পালন করেছে। এই প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে কৃষকরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে তাদের জমি ও অন্যান্য অর্জিত অধিকার রক্ষা করেছে। মাত্র ২।১টা ছোট এলাকা ছাড়া কার্যতঃ পশ্চিমবংগেই সর্বত্র তা দেখা গেছে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কৃষকদের সাহস, আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা, প্রতিরোধ ক্ষমতা ও ঐক্য এবং শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ঘৃণা আরো বেড়েছে। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে এটাই প্রতিফলিত হয়েছে। পরবর্তী কালে শাসকশ্রেণীর আক্রমণ আরো নগ্ন রূপ নিয়েছে, কিন্তু কৃষকরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে। রক্তাক্ত শরীর নিয়ে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনেও এগিয়ে গেছে। ফলে কোনভাবেই পশ্চিমবংগের জনগণের মধ্যে মোহ সৃষ্টি করা বা তাদের দাবিয়ে দেওয়া শাসকশ্রেণীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই, বরং জনগণের কংগ্রেস-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মনোভাব বাড়ে। এটাই বামপন্থী ফ্রন্ট গঠনের বাস্তব অবস্থা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

১৯৭১ সালের শেষের দিকে কংগ্রেসী শাসকেরা তাদের আক্রমণকে আরো নগ্ন ও হিংস্র করে তোলে। আর শুধু গ্রেপ্তার বা গুপ্ত হত্যা নয়, কৃষক আন্দোলনের শক্ত এলাকাগুলিতে সি. আর. পি. ও সশস্ত্র গুণ্ডাদের মিলিত আক্রমণ শুরু হলো। বর্ধমান জেলায় তা সবচেয়ে জঘন্য রূপ নিল। কৃষকদের ঐক্য ও দৃঢ়তা যতই থাক না কেন, এমনি নগ্ন হিংস্র এবং সশস্ত্র আক্রমণের সামনে দাঁড়ানো দুরুহ হয়ে উঠতে লাগল। কৃষক আন্দোলনের সামনে নূতন প্রশ্ন দেখা দিতে লাগল। তবু কৃষকরা দমে নাই। তারা মার খেয়েছে, খুন হয়েছে, তাদের ঘর জ্বলেছে, তবু তারা মাথা নোয়ায় নাই। কৃষক ও অন্যান্য জনগণের এমনি মনোভাব এবং সেই অবস্থায় বামপন্থী ফ্রন্ট গঠন ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় বাস্তব সম্ভাবনায় পরিণত করল। সারা ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবংগে কংগ্রেসের পরাজয়ের আশংকা ও তার বৈপ্লবিক তাৎপর্য শাসকশ্রেণীকে পাগল করে তুলল। তাই, তারা

সংসদীয় গণতন্ত্রকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল এবং গুণ্ডামী, জালিয়াতী ও মিথ্যাচারের দ্বারা তাকে কার্যকর করলো। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিতে এক নূতন পর্যায় উপস্থিত হলো।

এমনিভাবে নির্বাচনের পথ বাতিল করে শাসক-গোষ্ঠী তাদের সন্ত্রাসকে অনেক বাড়িয়ে দিল—পুলিসী অভিযানের সংগে সংগে কংগ্রেসী মস্তান বাহিনীর নগ্ন আস্ফালন ও হামলাবাজী তীব্রতর হলো। এমনি অবস্থায় কৃষক সংগ্রামের সামনে সম্পূর্ণ নূতন ও জটিল প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সর্বত্র কৃষকদের মধ্যে একটা থমথমে ভাব দেখা দিল। কেন এই থমথমে ভাব দেখা দিল, তা না বুঝতে পারলে আজকের দিনে কর্তব্য নির্ধারণ করা সহজ হবে না। এর প্রধান কারণ, নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এর আগে শাসকশ্রেণীর আক্রমণ তীব্রতর হলেও, জনগণের সামনে নির্বাচনের বাস্তব সম্ভাবনা ছিল। জনগণের অন্যান্য অংশের মত সংগ্রামী কৃষকরাও ভাবতো যে, আজ না হয় কাল নির্বাচন হবেই এবং তাতে কংগ্রেসকে পরাজিত করার সম্ভাবনা থাকবে। তখন বাইরের আন্দোলনের সংগে বিধানসভার সুযোগকেও কাজে লাগানো যাবে। এই চেতনা তাদের প্রতিরোধ শক্তিকে বিশেষভাবে গতিবেগ দিয়েছে।

কিন্তু যেভাবে ১৯৭২ সালের নির্বাচনকে শেষ করা হয়েছে, তাতে জনগণের সামনে নির্বাচনের পথ রুদ্ধ হয়েছে। সকলে এ বিষয়ে পুরা সচেতন হোক বা না হোক, তাদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে যে, নির্বাচনের পথ শাসক-গোষ্ঠী অস্ত্রের জোরে বন্ধ করে দিয়েছে। শাসকশ্রেণী সমগ্র রাষ্ট্র যন্ত্র নিয়ে তাদের সামনে নির্মমভাবে উপস্থিত। আজ আর তাদের সামনে লক্ষ্য হিসাবে কোন নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নাই, যে আগের কায়দায় রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তন করা যাবে। এখন অবস্থা অনেকটা "অনির্দিষ্ট কালের জন্য" যাত্রা। একমাত্র নিজেদের সংঘ শক্তি, চেতনা ও দৃঢ়তার ওপর নির্ভর করে তাদের এখন এগুতে হবে। এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য জনগণের সংগঠন ও চেতনার আগের স্তর আর যথেষ্ট নয়। এই অবস্থায় সংগ্রামী কৃষকদের মধ্যে একটু থমথমে ভাব আসা খুবই স্বাভাবিক। এ থেকে মনে করা খুবই ভুল হবে যে, তাদের সংগ্রামী শক্তি ও চেতনা দুর্বল হয়েছে। জনগণ মেশিন নয়, নূতন অবস্থার তাৎপর্য তাদের বুঝতে হবে এবং নূতন অবস্থার উপযোগী পথ ঠিক করতে হবে ও প্রস্তুতি করতে হবে। জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সব সময় সোজা পথে চলে না। তার আঁকাবাঁকা মোড় আছে। অবস্থার পরিবর্তনে একটু থমকে দাঁড়ানো স্বাভাবিক। অচেনা পথে রাস্তার মোড়ে এসে থমকে দাঁড়ানোর মত অবস্থা জনগণের। এই অবস্থা বোঝানো ও তার জন্য

প্রস্তুত হতে জনগণকে সাহায্য করাই হলো কৃষক কর্মীদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করতে হবে যে, এত প্রচণ্ড আক্রমণ সত্ত্বেও শুধু কৃষক কর্মীরাই নয়, সাধারণ সংগ্রামী কৃষকরা পর্যন্ত কংগ্রেসীদের কাছে মাথা নোয়ায় নাই। তাদের বেশ কিছুকে জমি হারাতে হয়েছে, অনেকে উচ্ছেদ হয়েছে; অর্জিত অধিকারের সবটা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। অনেকে খুন হয়েছে, এখনও হচ্ছে। অসংখ্য কৃষক কর্মী এলাকা-ছাড়া, অনেকে জেলে, হাজার হাজার কৃষক কর্মী ও কৃষক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা মাথায় নিয়ে চলেছে। নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে অনেকে হয়ত একটু দম বন্ধ করে আছে, কিন্তু কেউ আত্ম-সমর্পন করে নাই। সংগঠনের প্রতি তাদের নিষ্ঠা অবিচল রয়েছে। একটানা দীর্ঘস্থায়ী প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে এমনিভাবে দৃঢ় থাকার ঘটনা আমি আমার জীবনে অতীতে দেখিনি। এই দাঁতে দাঁত দিয়ে টিকে থাকার মনোভাব কৃষকদের জাগ্রত চেতনার পরিচয় দিচ্ছে এবং এরই মধ্যে রয়েছে আগামী দিনের অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনা। উপমা অনেক সময় ঠিক হয় না, তবু ইতিহাসের একটা শিক্ষা স্মরণ করা প্রয়োজন। একটা লড়াইয়ে অধিকতর শক্তির সামনে একটা সৈন্যবাহিনীকে সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণ করতে হলেও, যদি তার মনোবল দৃঢ় থাকে এবং যদি তার শক্তি সংগ্রহের সুযোগ থাকে, তাহলে শত্রুকে পর্যুদস্ত করেই সে জয় অর্জন করে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনের এমন মনোবল রয়েছে এবং তার শক্তি সংগ্রহের চমৎকার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, শাসক-গোষ্ঠী এত মরিয়া। তারা দেখছে যে, ভারতের অন্যান্য রাজ্যে জনগণের মধ্যে ক্রমাগত মোহমুক্তি শুরু হয়েছে, তারা সংগ্রামে নামছে। যেমন বোম্বাই-এ শ্রমিক ধর্মঘট, দিল্লীতে গণ-বিক্ষোভ, বিহারে ছাত্র শিক্ষকদের ও লক্ষ কৃষকের অভিযান, দক্ষিণ ভারত রেল শ্রমিকদের সংগ্রাম তারই লক্ষণ। এই ভাবে মোহমুক্তি ও গণ-সংগ্রাম নানা বাধা কেটে আরো বাড়বে। এর সংগে পশ্চিমবংগের সংগঠিত গণতান্ত্রিক শক্তির সংযোগের সম্ভাবনা শাসকশ্রেণীর সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কারণ। তাই, তারা পাগলের মত প্রলাপ বকছে, অন্য দিকে আরো বেশী হিংস্র হয়ে উঠছে। তারা চাইছে, ভারতের অন্যত্র গণশক্তি বিপুল বেগ সঞ্চয় করার আগেই পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক শক্তিকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ধ্বংস করতে। তাই, আমাদের একে পরাস্ত করতে হবে। কৃষক আন্দোলনকে শাসক-গোষ্ঠীর চক্রান্ত সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে; হঠাৎ কিছু করে ফেলার অবাস্তব ধারণা না রেখে ধাপে ধাপে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, আরো বেশী বেশী কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। তাই, বুঝতে হবে যে, জনগণের

কিছু অংশ এখনও শাসক-গোষ্ঠীর দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে আছে ; তাদের যুক্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মোহমুক্ত ও গরীব কৃষকও খেত মজুরদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে সাহায্য করতে হবে , কংগ্রেসকে আরো বেশী করে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। শাসকশ্রেণী যতই বিচ্ছিন্ন হবে, ততই তার আক্রমণকে পরাস্ত করার মত জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তি বাড়বে।

পশ্চিমবংগের শাসকশ্রেণীর প্রধান হাতিয়ার সন্ত্রাসমূলক আক্রমণ হলেও তারা শুধুমাত্র সন্ত্রাসের উপর নির্ভর করছে না। তারা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে জনগণের একাংশের মনে নূতন মোহ ও বিভেদ সৃষ্টি করতে। তারা দিনের পর দিন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা জনজীবনে সংকট বাড়াচ্ছে। কিন্তু, ছোটখাটো খামুলী ব্যবস্থার ঢাক পিটিয়ে তারা কিছু প্রত্যাশা ও বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে। বেকারী বাড়ানো হচ্ছে, অথচ ২।১ জন দলীয় লোককে কাজ দিয়ে একই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করা হচ্ছে। সাস্তবে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, অথচ জমির সিলিং কমানো বা বর্গাদারের ভাগ বাড়াবার কথা বলে নূতন মোহ সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আন্দোলন এমন একটা স্তরে গেছে, যে এখানে নূতন আইনের কথা বলে শাসকশ্রেণী বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারছে না, তবু তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে। কৃষকরা নূতন জমি পাচ্ছে না ও পাবেও না (বরং অনেক বেশী উচ্ছেদ হচ্ছে), তবু খাস জমি পুনর্বন্টনের নামে দলবাজী করে গরীবদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। কৃষির উন্নতি ও ব্যাংকের টাকা কর্জ প্রভৃতির নামে সাধারণ জমির মালিক কৃষকদের মধ্যে মোহ সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। যদিও সাধারণ মাঝারি কৃষক এতে বাঁচবে না এবং এ সবের সুযোগও তার বেশী পাবে না। কংগ্রেসীর ভূমি-সংস্কারের দ্বারা ভূমিহীন কৃষক জমি পাবে না, তাদের কৃষির উন্নয়ন ব্যবস্থায় সাধারণ কৃষক উন্নতি করতে পারবে না , কিন্তু এই দুই ব্যবস্থার দ্বারা শাসকশ্রেণী কৃষকদের উপরতলার ধনী অংশকে শক্তিশালী করার এবং মাঝারি কৃষকের মনে অনুরূপ উন্নতির অলীক প্রত্যাশা সৃষ্টি করছে এবং এই ভাবে কৃষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে বা করে চলেছে।

আমি আগেই বলেছি যে, পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আন্দোলন বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তাতে শাসকশ্রেণীর ঐ অপচেষ্টা ফলবতী হবে না। তবু কৃষক আন্দোলনের পক্ষে ঐ সব অপচেষ্টাকে কোনক্রমে উপেক্ষা করা উচিত হবে না। নিয়মিত প্রচারের দ্বারা জনগণের বিভিন্ন অংশের সামনে এই সবের মুখোশ খুলে দিতে হবে , কৃষকদের নিজেদের অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের রাজনৈতিক সচেতন করতে হবে. সাথে সাথে

কৃষকদের বিভিন্ন স্তরের দাবী দাওয়া নিয়ে প্রচার ও সম্ভাব্য কায়দায় আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। স্বভাবতই ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের ঐক্য গড়ে তোলার প্রতি বেশী নজর দিতে হবে, ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে। কিন্তু, সেই সংগে কৃষকদের অন্যান্য অংশের সমস্যা—চাষের সমস্যা, বীজ, সার, দরের ও ঋণের সমস্যা প্রভৃতি নিয়েও মাথা ঘামাতে হবে। এইভাবে অগ্রসর হলে শাসকশ্রেণীর কৌশল ব্যর্থ করে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের ভিত্তিতে মেহনতী কৃষকের ঐক্যকে আরো বিস্তৃত করা যাবে, এমনকি শাসকশ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের সমর্থক কৃষকদেরও এই ঐক্যের সংগে টেনে আনা যাবে।

শাসকশ্রেণী এক দিকে যেমন হিংস্র সন্ত্রাস চালিয়ে কৃষকদের কণ্ঠরোধ করে রাখার চেষ্ট করছে, তেমনি পুঁজিবাদী পথের সংকটের বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপাচ্ছে। যেমন জিনিসপত্রের দর বাড়ানো হচ্ছে, সাধারণ কৃষকের খাজনা বাড়ানো হয়েছে (জোতদারদের কমানো হয়েছে)। ক্যানেল কর বাড়াবার কথা উঠেছে. বেকারী ও দারিদ্র্যতা বাড়ানো হচ্ছে। ফলে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বাড়াছে ও আগামী দিনে আরো বাড়াবে। এই ক্রমবর্ধমান অসন্তোষই সন্ত্রাসের বাধা দূর করে কৃষকদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করাই হলো কৃষক কর্মীদের কর্তব্য। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, অত্যাচারের ভয়ে জনগণ যদি বেশী দিন চুপচাপ থাকে, তা হলে তা থেকে কিছু হতাশাও দেখা দিতে পারে। যন্ত্রণাকাতর কৃষকদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা ধ্বনিত করে তোলা হলো কৃষক কর্মীদের একটা বড় কাজ। গত ৬ মাস ধরে কঠিন অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েও কৃষক আন্দোলনের কর্মীরা এই সব কাজ করে যাচ্ছে বলেই কৃষকরা ক্রমশ বেশী বেশী করে নড়তে আরম্ভ করেছে। আগের তুলনায় কৃষকরা বৈঠক, সভা, গণ-মিছিল প্রভৃতিতে অনেক বেশী বেশী সক্রির অংশ গ্রহণ করছে। ফলে কারখানায় শ্রমিকশ্রেণী আরো সক্রিয় সংগ্রামে এগিয়েছে। অফিসে কর্মচারী, শিক্ষায়তনে ছাত্র-শিক্ষক প্রভৃতিরাও সেই একই পথ নিয়েছে। কৃষকদের দৈনন্দিন দাবীর ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়াকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সন্ত্রাস আছে তা বুঝেই অবস্থানুযায়ী কার্যক্রম নিতে হবে। শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের অন্যান্য অংশের আন্দোলনের সংগে কৃষক আন্দোলনের রাখী বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করতে হবে।

এটা বলাই বাহুল্য যে, আজকের অবস্থায় আগের কায়দায় সংগঠন চলতে পারে না, এই কঠিন অবস্থায় দৃঢ় সংগঠন ছাড়া কাজ চলতে পারে না। শাসকশ্রেণীর দয়ার ওপর নির্ভর করে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সংগঠন তার

দায়িত্ব পালনের যোগ্য হতে পারে না। তাই, সন্ত্রাসের কথা মনে রেখেই আজকের উপযোগী সংগঠন কৃষক আন্দোলনকে গড়ে তুলতে হবে।

বর্তমানে যখন প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন সর্বগ্রাসী সন্ত্রাসমূলক আক্রমণের সম্মুখীন, তখন জনগণের কোন আন্দোলন গণতন্ত্রের সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এগুতে পারে না, প্রতিক্রিয়াশীল এক দলীয় একনায়কত্বের বিপদের সামনে গণতন্ত্রের সংগ্রাম কেন্দ্রীয় সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। কৃষক আন্দোলনকে একথা সব সময় মনে রাখতে হবে। গণতন্ত্রের সংগ্রাম শুধু সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষকদের সংগ্রাম নয়, সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে এবং করবে। জনগণ কখনও গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস হারায় না। এ সংগ্রামে জয় হবেই। কোন পথে কী ভাবে এ সংগ্রাম এগুবে তা শুধু জনগণের একার ওপর নির্ভর করে না, শাসকশ্রেণীর কার্যকলাপের ওপরও নির্ভর করে।

সংগ্রাম আজ কঠিন ও জটিল। কিন্তু কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তো জনগণের শক্তি আরো সুদৃঢ় হয়। পশ্চিমবংগের কৃষক আন্দোলন গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত। কোন সন্দেহ নাই যে, এই সংগ্রামের পরীক্ষিত সৈনিকেরা আজকের কঠিন দায়িত্বও সাফল্যের সংগে পালন করবে।

—নভেম্বর ১৬, ১৯৭২

১৬ শ্রীলংকার যুব-বিদ্রোহের শিক্ষা

"সিন্ধুর দ্বীপ", "সিন্ধুর টীপ" সিংহল। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে রামেশ্বরম হতে ৩০।৪০ মাইল দূরে ভারত মহাসাগরের জলরাশি বেষ্টিত একটি দ্বীপ—লম্বায় প্রায় ২২৫ মাইল, চওড়ায় ১৫০ মাইল, দেখতে অনেকটা বেগুনের মত। বন-জংগল, চা-বাগান, রবার-বাগান, নারিকেল গাছে ভর্তি সুন্দর দ্বীপ। ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও কবিরা একে নিয়ে কত লেখাই না লিখেছেন। দ্বীপটি ছোট এবং লোক সংখ্যা কম হলেও ভারত মহাসাগরে এর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের জন্য এর রাজনৈতিক গুরুত্ব কম নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘদিন একে দখলে রেখে শুধু একে লুণ্ঠনই করে নাই, একে অন্যতম ঘাঁটি করে ভারত মহাসাগরে তার আধিপত্য বজায় রেখেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় ইংরেজ এর স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেও, তার শোষণ ও সামরিক ঘাঁটি বজায় রাখতে চেষ্টা করে আসছে। এখানে বাগিচা ও কল-কারখানায় ব্রিটিশ পুঁজির অবস্থানই প্রধান। এর ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ তার বিশ্ব-রাজনীতির অংগ হিসাবে এখানে তার নয়া-উপনিবেশিক নীতি অনুযায়ী প্রভাব বিস্তারের ও অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে চলেছে। পৃথিবীর বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এই দেশের সংগে মৈত্রীর চেষ্টা করে চলেছে। শ্রীলংকা ভারত ও পাকিস্তানের কাছে বলে এই দুটি দেশের সরকারও এই দেশের সংগে বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহী।

স্বাধীন হবার পর কিছু দিন আগে পর্যন্ত সিংহল ছিল ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ভুক্ত একটি ডোমিনিয়ন। সম্প্রতি সিংহল ডোমিনিয়ন অবস্থা বাতিল করে নিজেকে রিপাবলিক বলে ঘোষণা করেছে। অবশ্য ভারতের মতই ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সভ্য রয়ে গেছে। রিপাবলিক হয়ে সিংহলের নূতন নাম হয়েছে "শ্রীলংকা"।

সিংহলের ইতিহাসের এই সব বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেক কিছু জানবার ও আলোচনা করবার আছে। কিন্তু আমার এই প্রবন্ধে আমি এর কোন কিছু নিয়ে আলোচনা করছি না। আমি আমার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখব সিংহলে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে—যাকে বলা যেতে পারে সিংহলের যুব-বিদ্রোহ। যদিও এটা সিংহলের অভ্যন্তরীণ ঘটনা,

তথাপি এর তাৎপর্য যথেষ্ট। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গণতান্ত্রিক কর্মীদের এ সম্বন্ধে ভাববার আছে, এ হতে শিক্ষা নেবার অনেক কিছু আছে।

গত বৎসর সিংহলে (বর্তমানে শ্রীলংকায়) বিদ্যুতের ঝলকের মত যে যুব বিদ্রোহ ঘটে গেল, তা শুধু ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপে চাপ চাপ রক্তের দাগই রেখে যায় নি, সমাজ পরিবর্তনে আগ্রহী গণতান্ত্রিক কর্মীদের কাছে অনেক প্রশ্ন তুলে ধরেছে। কেউ আগে হতে বুঝতে পারে নি, হঠাৎ আগ্নেয় গিরির বিস্ফোরণের মত বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। হঠাৎ তা হলো কেন? কারা এতে যোগ দিয়েছিল? কেন এমনি দপ করে জ্বলে তা আবার দপ করে নিবে গেল? কতজন প্রাণ দিয়েছে? কত বন্দী, এবং তাদের মনের অবস্থা কী? কিসের প্রেরণায় এরা এমনি করে আগুনে ঝাঁপ দিল? এর থেকে কি শিক্ষা মেলে? এমনি কত কী প্রশ্ন।

শ্রীলংকা আমাদের দেশের অত্যন্ত নিকটে, অথচ এই যুব-বিদ্রোহ ব্যাপারে আমাদের কাছে সংবাদ এখনও খুব কম। সম্প্রতি আমি প্রাগে গিয়েছিলাম এবং সেখানে শ্রীলংকা হতে আগত প্রতিনিধিদের সংগে কিছু আলোচনা করেছিলাম। বিস্তারিত খবর বেশী পাই নি, তবু যেটুকু টুকরো টুকরো খবর সংগ্রহ করেছি, তার ভিত্তিতেই আমি কিছু লেখার চেষ্টা করছি। প্রথমেই বলে রাখি যে, এই সমগ্র বিষয়ে আমার জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ, আমার প্রাপ্ত সংবাদের যথার্থতা সম্বন্ধে আমি জোর করে কিছু বলতে পারি না। কিন্তু তাতে আমার সাধারণ বক্তব্যের বিশেষ ইতর বিশেষ হবার আশংকা কম।

প্রথমেই জানা দরকার যে, এই যুব-বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও তীব্রতা ছিল খুব বেশী। সিংহলের লোক সংখ্যা মাত্র ১ কোটি ২০ লক্ষ। পশ্চিমবংগের চার ভাগের এক ভাগের মত। হাজার হাজার যুবক এবং অনেক যুবতী এতে অংশ গ্রহণ করেছিল। এরা প্রধানত এসেছে মধ্যবিত্ত সমাজ হতে। লেখাপড়া জানা কৃষকের ছেলেও বেশ কিছু আছে। সরকারের মিলিটারীর আক্রমণে প্রায় ৮,০০০ (অন্য হিসাবে ১০,০০০) নিহত হয়েছে এবং প্রায় ১৭,০০০ জেলে বন্দী হয়েছে। এ হতেই যুব-বিদ্রোহের ব্যাপকতা বোঝা যায়।

কমিউনিস্ট বা সোস্যালিস্ট বলে পরিচিত কোন পার্টি এই যুব-বিদ্রোহের সংগে যুক্ত ছিল না। কোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বা কোন বিদেশী শক্তি এই বিদ্রোহের পিছনে ছিল, এমন কথা বলা নিছক সত্যের আলাপ। কোন সন্দেহ ভাজন বা খারাপ প্রকৃতির যুবক এর মধ্যে আদৌ ছিল না, তা বলা যায় না। তেমনি সরকার বিরোধী দক্ষিণপন্থী

পার্টি এই বিদ্রোহকে তাদের সরকার বিরোধী রাজনীতির সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করে নি, তাও বলা যায় না। কিন্তু এরা কেউ বিদ্রোহকে সংগঠিত করে নাই। ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার মধ্যবিত্ত যুবকদের একাংশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল মিলিটারী চক্রের হাতের ক্রীড়নক হয়ে নিজেদের কমিউনিস্ট-বিরোধী ঘাতক বাহিনীতে পরিণত করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র ও যুবকদের একটি অংশ (অল্প সংখ্যক হলেও) এমনি ভাবেই নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল ও শোষকদের স্বার্থে গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে ঘাতক বাহিনীর কাজ করছে। এদের চরিত্র ও ভূমিকার সঙ্গে শ্রীলংকার বিদ্রোহী যুবকদের কোন মিল নাই। দুইয়ের চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক। পশ্চিমবঙ্গে নকশালপন্থীদের কমিউনিস্ট-বিরোধিতা ও ব্যক্তি হত্যার নীতি, যাকে এ দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী কাজে লাগিয়েছে, তারও কোন লক্ষণ শ্রীলংকার বিদ্রোহী যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায় নাই।

এই যুব-বিদ্রোহ ছিল মূলত শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ভাবপ্রবণ মধ্যবিত্ত যুব সমাজের বিক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত ও তীব্র বহিঃপ্রকাশ। এটাই ছিল যুব-বিদ্রোহের ইতিবাচক দিক। কিন্তু এদের সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের কোন সংযোগ ছিল না; এদের ছিল না বিপ্লবের নীতি ও কৌশল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তব ধারণা। ধোঁয়াটে বিপ্লবী আবেগ নিয়ে এবং তরুণ যুবকেরা হঠাৎ কিছু করে ফেলার নেশায় মেতে উঠেছিল। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, এই যুব-বিদ্রোহ ছিল শ্রমিক-কৃষক হতে বিচ্ছিন্ন ভাবপ্রবণ মধ্যবিত্ত যুবকদের বিক্ষোভের উগ্রবাদী বহিঃপ্রকাশ। এই জন্যই তা দপ করে জ্বলে দপ করে নিবে গেল।

এই যুবকরা লক্ষণীয় বীরত্ব, সাহস ও মনের জোর দেখিয়েছে। যখন তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, তখন তারা করুণা চায় নাই। যারা কারাগারে বন্দী, কেউ কেউ হয়ত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে—শুনেছি যে তারাও নাকি (২।৪ জন বাদে) মনের জোর দেখাচ্ছে। আমার দুঃখ ও বেদনা লাগছে যে, কোন সত্যকার বিপ্লবী পার্টি এদের বিপ্লবী আবেগকে সঠিক খাতে নিয়ে যেতে পারল না। ইতিহাস বড় নির্মম। ভুলের মাশুল দিতেই তা হবে। মনে বড় ঘৃণা ও ক্ষোভ জেগেছে যে, এই যুবকদের দমন ও হত্যা করার জন্য এবং ধর্মযুদ্ধে যোগ দেবার মত মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, পাকিস্তান ও ভারতের সরকার এবং তাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন এক সঙ্গে সিংহল সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে। এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক চীন যাবার

আগে রেডিওতে বলেছেন যে, তিনি সাফল্যের সঙ্গে 'জোট নিরপেক্ষ' নীতি পরিচালনা করছেন। শুনে মনটা খারাপ হয়েছিল।

এইবার যুব-বিদ্রোহের ইতিহাসে একটু আসা যাক। যে ছাত্র ও যুবকেরা বিদ্রোহ করেছিল, তারা বৎসরাধিকাল পূর্বে সাধারণ নির্বাচনের সময় শ্রীমতী বন্দরনায়েকের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট-এর পক্ষে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মতই শ্রীমতী বন্দরনায়েক কথার ফুলঝুরি দিয়ে জনমনে স্বপ্নের জাল ও প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছিলেন। নির্বাচনে বিরাটভাবে জয়লাভ করে শাসক জোট ভেবেছিল যে এমনি অবস্থা দীর্ঘদিন চলবে, কিন্তু অলক্ষ্য মোহমুক্তির প্রক্রিয়া কাজ করতে লাগল। শ্রীলংকার শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যথেষ্ট। নির্বাচন পরবর্তীকালে জনজীবনে সংকট বেড়েই চলল, বেকার সংখ্যা কমার বদলে বাড়তে লাগল। ভাবপ্রবণ শিক্ষিত যুবকদের মধ্যেই দ্রুত মোহমুক্তি ঘটতে লাগল। যারা ছিল সরকারের সমর্থক, তারাই হয়ে উঠল বিক্ষুব্ধ এটাই হ'লো যুব-বিদ্রোহের ভিত্তি।

কিন্তু, এই অসন্তোষ ও বিক্ষোভকে বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলনের পথে নিয়ে যাবার কোন চেষ্টা হলো না। শ্রীলংকা কমিউনিস্ট পার্টি মস্কো সমর্থক এবং সরকারের অংশ। তাদের নেতৃত্বে সরকার-বিরোধী আন্দোলন করা গেল না। শ্রীশন্মুগাথাসনের নেতৃত্বে চীন সমর্থক পার্টি মুখে বিপ্লবের বুলি আওড়ালেও এবং ভারতে এখনই বিপ্লব করার জন্য অযাচিত উপদেশ বর্ষণ করলেও সিংহল সে পথে গেল না। চীনের সঙ্গে সিংহলের বন্ধুত্বের জন্যই তারা এখানে বিপ্লবী সংগ্রামের পথে যায় নাই। সিংহলে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন নাই বলে শুনেছি। গণ-আন্দোলন বলতে যা আছে, তা হলো বাগিচা শ্রমিকদের সংগঠন ও আন্দোলন। এটা ভালই আছে, কিন্তু এই সংগঠনগুলি প্রধানত উপরোক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপ এবং বিভিন্ন সংস্কারবাদী বা এমন কি বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীন।

এমনি অবস্থায় শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ গণ-আন্দোলনের অভাবে বিক্ষুব্ধ যুব সমাজ আপনা হতে সঠিক পথের সন্ধান পেল না। মধ্যবিত্ত যুব সমাজ সাধারণত: স্পর্শকাতর। সংকট জর্জরিত সমাজে এরা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। শ্রমিক নেতৃত্বে পরিচালিত গণশক্তির সংগে যুক্ত হলে এরা ভাল বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে—যা আমরা চীনে, ভিয়েতনামে দেখেছি, ভারতেও দেখেছি। এদের বিপথগামী করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও কাজে লাগাতে পারে, তারও উদাহরণ রয়েছে। এ দু'টোর বাস্তব অবস্থা না থাকলে, তারা হয় হতাশায় ভেঙে পড়ে অথবা

একাই একটা কিছু করার নেশায় মেতে ওঠে। নিজেদের সম্বন্ধে এদের ধারণা বড় এবং মনে করে যে তারাই সমাজকে বদলে দিতে পারবে। শ্রীলংকায় এমনই কিছু হয়েছে।

কারা এদের নেতৃত্ব দিয়েছে, এটা জানার চেষ্টা করেছি। খুব ভাল বুঝি নি। তবে এইটুকু শুনেছি যে, যে ছেলেরা নেতৃত্ব দিয়েছে, তাদের অনেকে আগে কমিউনিস্ট পার্টির হয় সভ্য বা দরদী ছিল। যে যুবকের নাম সবচেয়ে বেশী শোনা যাচ্ছে, তাঁর নাম রোহন বিজয়বীর। ইনি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। এঁকে নাকি ট্রেনিং-এর জন্য মস্কো পাঠানো হয়েছিল। সেখানে কি একটা গোলমালের জন্য মস্কো নাকি তাঁকে ফেরত নিতে বলে। তিনি পরে ইংলন্ড চলে যান এবং সেখান হতে সিংহলে ফিরে উপরোক্ত যুবকদের সংগে যোগ দেন। এরা 'জনতা বিমুক্তি পেরামুনা' বলে সংগঠন তৈরী করে এবং নিজেদের চেগুয়েভারার নীতি অনুসরণকারী বলে প্রচার করে। বিক্ষুব্ধ ব্যাপক যুব সমাজ এদের পাশে জড় হয়। শুধু ছেলেরাই নয়, বেশ কিছু মেয়েও এদের সংগে যোগ দেয়। এই মেয়েরাও নাকি যুব বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল এবং অনেকে প্রাণও দিয়েছে।

অলক্ষ্যে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলে, তারপর এরা হঠাৎ একদিন ফেটে পড়ে। হাতবোমা ছাড়া এদের হাতে তেমন কোন অস্ত্র ছিল বলে শুনিনি। এদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য বস্তু ছিল থানা ও পুলিস-ফাঁড়ি। প্রধানত হাতবোমা নিয়ে এরা যুগপৎ ব্যাপক অঞ্চলে হামলা করে। যতদূর শুনেছি এদের বিশেষ প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় নাই। অতর্কিত আক্রমণে অনেক পুলিস অস্ত্র ছেড়ে দেয়, অনেকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কেউ কেউ এদের সংগে যোগ দেয় বলেও শুনেছি। অল্প দিনের মধ্যেই যুব-বিদ্রোহীরা প্রায় পাঁচশত থানা বা পুলিস-ফাঁড়ি দখল করে নেয়। ব্যাপক এলাকায় কার্যত শাসন ব্যবস্থা এদের হাতে চলে যায়। অনেক গ্রামাঞ্চলে এরা নিজেদের বিচার ব্যবস্থাও চালু করে। এদের ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে কিছু কৃষক এদের টাকাও দেয়। বিদ্রোহী ছেলেরা অনেকেই আদর্শবাদী ছিল। এরা প্রস্তুতিপর্বে বাপ-মাকে বলে জমি বিক্রি করেও টাকা সংগ্রহ করেছে।

সরকার বিদ্রোহ শুরু হবার সামান্য আগেই খবর পেয়ে যায় এবং দ্রুত মিলিটারী নিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। শ্রীলংকা সরকারের সামরিক শক্তি বেশী ছিল না। মাত্র হাজার দশেক, এদের অস্ত্রও উচ্চ মানের ছিল না। আগেই বলেছি যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ভারত, পাকিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এদের দ্রুত আধুনিক রণসম্ভার

দিয়ে সাহায্য করে। এরা অস্ত্র বহণও করে দেয়, এমন কি বিমান ও হেলিকপ্টার চালাবার পাইলটও দেয়। চীন প্রথমে অস্ত্র দিতে পারে নাই, কিন্তু প্রচুর অর্থ সাহায্য করে। সময় মত অস্ত্র সাহায্য করতে না পারায় তারা বিদ্রোহ দমনের পরে গানবোট ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রও দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যুব-বিদ্রোহ দমনে অস্ত্র ছাড়া মিগ বোমারু বিমান পাঠায়। ভারত সরকার অনুরূপভাবে অস্ত্র ও হেলিকপ্টার পাঠায়, এমন কি নিজেদের মিলিটারী হেলিকপ্টার ধারও দেয়। এখনও নাকি এমনি অনেকগুলি হেলিকপ্টার সেখানে রয়েছে। এমনি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সরকারী বাহিনী যুব-বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নৃশংস আক্রমণ চালায়।

আগেই বলেছি যে, যুব-বিদ্রোহীদের অন্যতম বড় দুর্বলতা ছিল কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে এদের কোন যোগাযোগ ছিল না। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সামরিক বাহিনীর আক্রমণের সামনে এই দুর্বলতা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে প্রাথমিক সাফল্যের পর যুব-বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে পড়ে এবং তারা বনে-জঙ্গলে পশ্চাদপসরণ করে। সরকার অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব নিয়ে আক্রমণ চালায়। বিদ্রোহীদের আক্রমণে পুলিস বিশেষ মরেছে বলে শুনি নাই; বিদ্রোহীদের হিংস্রতার কথাও শুনি নাই। কিন্তু সরকারের মনোভাব ঠিক উল্টো। প্রায় ৮,০০০ (অন্য এক হিসেব মতে ১০,০০০)-কে নিহত করা হয়েছে এবং ১৭,০০০-কে বন্দী করা হয়েছে। সিংহলের ছোট ছোট পাহাড়ী নদীগুলিতে অসংখ্য মৃতদেহ ভেসে গেছে। যা হবার তাই হলো, রক্তের নদীতে একটি যুব-বিদ্রোহের অপমৃত্যু ঘটল।

বিদ্রোহী যুবকেরা মরেছে, বন্দী হয়েছে, কিন্তু তারা মাথা নোয়ায় নাই। বন্দী করে তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছে, কিন্তু ২/৪ জন ছাড়া বেশী কেউ ভেঙে পড়ে নাই। বন্দী অবস্থায় জেরার সময় এরা অনেকে নাকি খোলাখুলি নিজেদের আদর্শের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছে এবং পুলিস বাহিনীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতাও দিয়েছে। শোনা যায় যে, তারপর ২।১টি কেন্দ্রে ২।৪ জন পুলিস নাকি অদৃশ্য হয়ে গেছে। সরকার তারপর নির্দেশ দিয়েছে, যে বন্দীদের কোন থানায় জেরা না করে সোজা যেন বন্দী শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৭,০০০ বন্দীর মধ্যে এক বছর স্ক্রীনিং এর পর সামান্য কিছু ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকীদের বিচারের জন্য ও কঠিন শাস্তি দেবার জন্য সরকার নাকি বদ্ধ পরিকর। তার জন্য পার্লামেন্টে বিশেষ আইনও পাশ করানো হয়েছে। যুব-বিদ্রোহ দমনের পরও সরকার আতংকিত। অনেক বন্দীকে, বিশেষত নেতৃস্থানীয় যুবকদের সরকার প্রধান ভূখণ্ডের কোন জেলে রাখে নাই। সিংহলের চারিদিকে অসংখ্য ছোট

দ্বীপ আছে, সেখানে বিশেষ শিবির করে তাদের সেখানে রাখা হয়েছে। ৪৭ জনকে সরকার নেতা বলে ঠিক করেছে, এদের মধ্যে বিজয়বীরও আছেন। ইংরেজ আমলের আইনের ধারা মতে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে—"রাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ" করার। এমনি ধারা আইনের হাস্যকর প্রয়োগ আমাদের দেশেও দেখেছি। সরকার এত ভীত যে, বিচারের দিন বন্দীদের দ্বীপের বন্দীশালা হতে হেলিকপ্টারে করে আনা হয় এবং পরে সামনে পিছনে ট্যাংকের পাহারা দিয়ে মিলিটারী দিয়ে ঘিরে তাদের কোর্টে হাজির করানো হয়। রাস্তা-ঘাটে যান চলাচল তখন বন্ধ থাকে। এই নেতৃস্থানীয় বন্দীদের মধ্যে মাত্র ২/৪ জন নাকি রাজসাক্ষী হতে রাজী হয়েছে, বাকীরা মোটেই দুঃখিত নয়, তারা অভিযোগের ধারা নিয়ে কোর্টে রহস্যও করে। জানি না এই যুব-বিদ্রোহী বন্দীদের ভবিষ্যৎ কী। ইতিমধ্যেই এই যুব-বিদ্রোহ শ্রীলংকার রাজধানীতে কিছু পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

শ্রীলংকার রাষ্ট্রের ও শাসকশ্রেণীর শ্রেণী চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে মুশকিল। সত্যই আমি ভাল জানি না। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, এই রাষ্ট্র ওদেশের উচ্চ ও শোষক শ্রেণীদেরই প্রতিনিধি। আমি যতদূর জানি তাতে এদেশে দেশী ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের মধ্য হতে বৃহৎ পুঁজি বা একচেটিয়া পুঁজি বিশেষ গড়ে ওঠে নাই। এখানে বৃহৎ বা একচেটিয়া পুঁজি হলো প্রধানতঃ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি।

কিন্তু তেমন বৃহৎ না হলেও এখানে দেশী পুঁজিপতি শ্রেণী আছে, আছে ব্যবসা-বাণিজ্য, আছে বাগিচা ও শিল্পেও। বিদেশী পুঁজির ছোট অংশীদার হিসাবে কাজ করে এমন পুঁজিপতিও আছে। তাছাড়া আছে ভূস্বামী ও মহাজনেরা। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বুর্জোয়া-জমিদার সহযোগিতার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র নির্ধারিত হয়েছে। এতেও কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে দেশী বুর্জোয়া শ্রেণী বাড়ছে। এদের যেমন সাম্রাজ্যবাদের সংগে স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে, তেমনি দুর্বল পুঁজির দুর্বলতাও আছে। সামন্তবাদের সংগেও এদের দ্বন্দ্ব না থেকে পারে না। অন্য দিকে, এদের সংগে জনগণের স্বার্থের মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে। অবস্থানুযায়ী কৌশলের পার্থক্য হলেও মৌলিক শ্রেণীস্বার্থের দ্বারাই একটি রাষ্ট্রের নীতি পরিচালিত হয়।

গত নির্বাচনে চরম দক্ষিণপন্থী বলে পরিচিত পার্টি জোট পরাজিত হয় এবং শ্রীমাভো বন্দরনায়কের নেতৃত্বে পরিচালিত জোট সরকার গঠন করে। ওখানের কমিউনিস্ট পার্টি (মস্কো-সমর্থক) ও ট্রটস্কিপন্থী সামসমাজ পার্টি এই সরকারে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু সরকারের নীতিতে বা কাজ-কর্মে আগের

তুলনায় কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই, এমনকি সীমাবদ্ধ বুর্জোয়া ভূমিসংস্কার সম্বন্ধেও কোন কথা ওঠে না। সরকারের নীতি সব দিক দিয়ে জনজীবনে সংকট বাড়িয়ে তোলে। বেকারী বাড়ে, জিনিসপত্রের দামও বাড়ে। স্বভাবতই জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। বাগিচা শ্রমিকরা সংগঠিত হলেও নেতৃত্বের বিশেষ চরিত্রের জন্য সামনে আসতে পারে নাই এবং কৃষকরা অসংগঠিত। এমনি অবস্থায় ফেটে পড়ল যুব-বিদ্রোহ। এর ত্রুটি বিচ্যুতি, দুর্বলতা যাই থাকুক না কেন, এতে কোন সন্দেহ নাই যে, এটা শাসক শ্রেণীগুলির সংগে জনগণের দ্বন্দ্বের অন্যতম তীব্র বহিঃপ্রকাশ। এমনি তীব্র সংঘাত উভয় শিবিরেই কিছু পরিবর্তন আনতে বাধ্য। শাসকশ্রেণীর মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তা হলো এক দিকে রাষ্ট্রের পীড়ন যন্ত্রকে-মিলিটারী ও পুলিসকে-শক্তিশালী করা, অন্য দিকে জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সামন্ত বিরোধী মনোভাবকে মনে রেখে তাদের প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করা।

সরকার তার সামরিক বাহিনীকে পোক্ত ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেছে। এখন নাকি মিলিটারীর শক্তি ৪০,০০০ হয়েছে। কিছু বেকার যুবকের এতে কাজ মিলেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারের মনোভাব আরো কড়া হয়েছে। শ্রীলংকা কমিউনিস্ট পার্টির যে সব এম. পি. আছে, তারাও যুব-বিদ্রোহীদের বিচারের বিশেষ আইনের পক্ষে ভোট দেয় নাই। তাই তাদের যুক্তফ্রন্ট হতে বের করে দেওয়া হয়েছে। সংগে সংগে সরকার আমাদের দেশের শাসকশ্রেণীর মতই জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য ভূমিসংস্কার, বেকারদের কাজ প্রভৃতির কথা বলছে। সিংহলকে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত একটা রিপাবলিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এই পলিসির উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি আলোচনা করা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তাই সে চেষ্টা হতে বিরত থাকলাম।

শুধু এইটুকু বলতে পারি যে সিংহল সরকারের নূতন ভূমিসংস্কারের বিধান ও প্রয়োগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যা শুনেছি, তাতে তার সংগে আমাদের দেশের কংগ্রেস সরকারের ব্যবস্থায় কোন পার্থক্য দেখতে পাই নাই।

এই যুব-বিদ্রোহ, তা দমনে সরকারী নৃশংসতা এবং জনজীবনে ক্রমবর্ধমান সংকট শ্রীলংকা কমিউনিস্ট পার্টির (সোভিয়েত সমর্থক) মধ্যে নতুন প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে। প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক পিটার কয়নিম্যানের (যিনি সরকারের মন্ত্রী) নেতৃত্বে একটি ছোট অংশ সরকারকে আগের মতই সব কাজে সমর্থন করে যেতে চায়, অন্য দিকে পার্টির সাধারণ কর্মীদের মধ্যে সরকার-

বিরোধী মনোভাব বাড়তে থাকে। এই অবস্থায় প্রাক্তন সভাপতি বিক্রম সিং-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটি কিছুটা সরকার-বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করে। পার্টি ভাঙনের পথে এগুতে থাকে। সম্প্রতি এই পার্টির কংগ্রেস হয়ে গেছে এবং তাতে ভাঙন ঠেকিয়ে ঐক্য বজায় রাখা গেছে। পিটার-কয়নিম্যান পার্টি নেতৃত্ব হতে অপসারিত হয়েছেন এবং বিক্রম সিং নতুন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। পার্টি কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করেছেন, যে সরকার হতে পার্টি বেরিয়ে আসবে না বটে, তবে সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ও জনগণের দাবী নিয়ে তারা আন্দোলন গড়ে তুলবে। পার্টি এইখানেই থেমে যাবে কি না বা থামাতে পারবে কিনা, তা ভবিষ্যৎই দেখিয়ে দেবে। (পরবর্তী কালে দুই গ্রুপ মিলে গেছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।—সম্পাদক।)

শ্রীশম্মুগাথাসন ছিলেন ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টিতে অন্যতম নেতা এবং বাগিচা শ্রমিকদের নাম করা সংগঠক। ইনি উগ্র চীন সমর্থক নীতি নিয়ে আলাদা সংগঠন করেছিলেন। কিছু কিছু যুব-বিদ্রোহীদের সংগে এ'র পরিচয় ছিল, কিন্তু বিদ্রোহে এ'রা বা এ'র সংগঠনের কোন হাত ছিল না। সরকার বিদ্রোহ দমনের সময় এ'কে গ্রেপ্তার করেছিলেন। ইনি স্মারকলিপি দিয়ে সরকারকে জানিয়েছিলেন, যে যুব-বিদ্রোহের সংগে তার তাঁর বা তাঁর দলের কোন সম্পর্ক ছিল না। ইনি ও এ'র কিছু বন্ধু মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু এ'দের প্রভাব ও সংগঠন নাকি দুর্বল হয়ে পড়েছে। অন্তত অন্যেরা তাই বলছেন। এই পার্টি এখন অন্তর্দ্বন্দ্বে ভেঙে পড়েছে। এ'দের কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রীশম্মুগাথাসনকে বিতাড়িত করেছেন, অন্য দিকে ইনি দাবী করছেন, যে কেন্দ্রীয় কমিটিকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কেন ও কী নিয়ে এই পার্থক্য তা জানতে পারি নাই। তবে এটুকু বোঝা গেল যে, এককালের শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায়।

শ্রীলংকার যুব-বিদ্রোহ দমিত হয়েছে, কিন্তু এর স্মৃতি ও রক্তের দাগকে শীঘ্র বা সহজে কেউ মুছে দিতে পারবে না। এই যুবকদের ভুলত্রুটি বা দুর্বলতা যাই থাকুক না কেন, এর শোষণ, বেকারী ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং তার জন্য তারা প্রাণ দিয়েছে ও নির্যাতন সহ্য করেছে। এই যুব-বিদ্রোহের মূল কারণ যতদিন না দূরিভূত হবে, ততদিন এর স্মৃতি দেশের সাধারণ মানুষের মনকে বারে বারে নাড়া দেবে। এই যুব-বিদ্রোহ প্রমাণ করেছে, যে কথার ফুলঝুরি দিয়ে যতই জনগণকে বিভ্রান্ত করা হোক না কেন, বাস্তব অবস্থার চাপে তা অস্থায়ী হতে বাধ্য, জনজীবনের সমস্যার সমাধান না হলে নানাভাবে সেই সব বিক্ষোভ ফেটে পড়তে বাধ্য এবং

তা হয়তো অনেকের কাছে অপ্রত্যাশিত হতেও পারে; দেশে দেশে শাসকশ্রেণী যেমন এ হতে শিক্ষা নেবে, তেমনি শাসকশ্রেণী ও বিপ্লবী শক্তিও এ থেকে শিক্ষা নেবে।

সিংহলে যুব-বিদ্রোহ আরো দেখিয়ে দিয়েছে, যে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী নেতৃত্ব না থাকলে এবং শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সংগে যুক্ত না হলে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কৃষক সংগ্রামের সহযোগী না হলে ভাব প্রবণ মধ্যবিত্ত এই যুব-সমাজের পৃথক কোন সংগ্রাম, তা সে যতই বীরত্বপূর্ণ হোক না কেন, ঈপ্সিত লক্ষ্যে তা যেতে পারে না। তার অপমৃত্যু ঘটতে বাধ্য। এই যুব-বিদ্রোহ আরো দেখিয়ে দিচ্ছে যে, যদি শ্রমিকশ্রেণী মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণকে সংগঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ না করে এবং শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনগণের সংগ্রামকে একসূত্রে গ্রথিত করতে না পারেন, তাহ'লে স্বতঃস্ফূর্ততার প্রভাবে সংগ্রামী শক্তির অপচয় ঘটতে পারে এবং তাতে সমগ্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা হবে। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী তার সুযোগ গ্রহণ করে বা নেয়। এই সব হতে শাসক ও শাসিত, শোষক এবং শোষিত সকলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেবে। ভারতের গণতান্ত্রিক শক্তি নিশ্চয়ই এ থেকে উপকৃত হবে।

১৭ ভিয়েতনাম ও ভারতবর্ষ

আন্তর্জাতিক পরিধিতে মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে এবং জাতীয় পরিধিতে ভারতের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুক্তি সংগ্রামে ও ভারতের ক্ষেত্রে গণ-আন্দোলনের মধ্যে স্তরগত বিরাট এবং গুণগত পার্থক্য রয়েছে; তেমনি পার্থক্য রয়েছে শত্রুর চরিত্রের মধ্যে। এই উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য মুহূর্তের জন্য ভুলে না গিয়েও ১৯৬৭ সালের যে তাৎপর্যটি আমি তুলে ধরতে চাই, তা হল—উভয় ক্ষেত্রেই জনগণের দ্রুত চেতনা বৃদ্ধি এবং তাদের সংগ্রামের লক্ষণীয় অগ্রগতি ও সাফল্য। অবশ্য এই অগ্রগতির চরিত্র ও মাত্রা দুই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন; ভারতে তার চরিত্র নিম্নস্তরের মাত্রাও কম।

পৃথিবীর মুক্তি সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু ভিয়েতনামের সংগ্রামে প্যারিস যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে; আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ পশ্চাদপসরণ করতে ও হার মানতে বাধ্য হয়েছে; ভিয়েতনামের জনগণের সংগ্রামে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ভিয়েতনামে পিছু হঠে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কাম্বোডিয়ায় তার আক্রমণকে তীব্রতর করেছিল, কিন্তু সেখানেও পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করছে; লাওসেও তার চক্রান্ত পর্যুদস্ত হচ্ছে। ইন্দো-চীনের সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, এ থেকে আমাদের নিজেদের জন্য শিক্ষা নেয়াই বড় কথা। ভিয়েতনামের জনগণ জিতেছে, এবং বিরাটভাবে জিতেছে, কিন্তু এখনও চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে হবে নূতন অবস্থায়।

ইন্দো-চীনে এত রক্তক্ষয় কেন করতে হল এবং এখনও চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে কেন? এই 'কেন'র পিছনে যে প্রধান কারণ রয়েছে, তা হল কমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্যে অনভিপ্রেত অনৈক্য ও বিচ্যুতি এবং সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়াতে না পারা। এই দুর্বলতা না থাকলে হয়ত আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনামে আক্রমণ চালাতে সাহসই করত না, আর করলেও অনেক আগেই তার চরম নিষ্পত্তি হয়ে যেত, এবং বর্তমানের বিজয় লাভ চূড়ান্ত বিজয়ে পরিণত হত। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই নেতিবাচক অবস্থা দেখে ভিয়েতনামের জনগণ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে নি। তারা বুঝেছিল যে জয়লাভ সহজ হবে না, অনেক

দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করতে হবে। ভিয়েতনামের জনগণের এই শিক্ষা ও চেতনাই রূপ পেয়েছিল কমরেড হো চি মিন-এর বিখ্যাত বাণীতে—"প্রয়োজন হলে বিশ বছর লড়তে হবে।"

প্রশ্ন হল, এই নেতিবাচক অবস্থা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র ভিয়েতনামের জনগণ পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জিতল কী করে? এটাই হল নতুন যুগের বৈশিষ্ট্য, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তির ভারসাম্যের তাৎপর্য! নতুন যুগের তাৎপর্য এটা নয় যে সাম্রাজ্যবাদের সংগে আপসে অগ্রগতি সম্ভব, অথবা সাম্রাজ্যবাদের হিংস্রতা কমে গেছে, অথবা শান্তিপূর্ণভাবে সমাজের পরিবর্তন করা সম্ভব। এর অর্থ হল এই যে, একটা দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ যদি ঐক্যবদ্ধ এবং সচেতন হয়ে দৃঢ়তার সংগে সংগ্রাম করে, অহলে তারা দুর্ধর্ষতম শত্রুকেও পর্যুদস্ত করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অনৈক্য ও ভুল-ভ্রান্তি বা বিচ্যুতি যেমন ক্ষতি করছে, তেমনি তাদের অস্তিত্ব ও দ্রুত অগ্রগতি সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের পরিস্থিতিকে আরো অনুকূল করে তুলছে।

ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের অপূর্ব যোগ্যতার এটা পরিচয় যে, তাঁরা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই ইতিবাচক উভয় দিককেই সঠিকভাবে দেখেছিলেন। তাই, তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড শক্তি ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনৈক্য জনিত জটিলতা দেখে বিহ্বল হন নি, নতুন যুগের তাৎপর্য বুঝে চমৎকার আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়েছেন ; অন্য দিকে তাঁরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের নেতিবাচক দিক সম্বন্ধে অন্ধ থেকে সহজ জয়ের অলীক স্বপ্নজাল রচনা করেন নি।

নতুন যুগ আপসে জয় এনে দেয় না, তা জনগণের সংগ্রামের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে মাত্র। ভিয়েতনামের পার্টি ও জনগণ এই পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা জয় অর্জন করেছেন প্রধানতঃ নিজেদের সংগ্রামী শক্তিতে। তাঁদের সংগ্রামে তাঁরা সাহায্য পেয়েছেন বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশ হতে, সাহায্য পেয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগণের সৌভ্রাত্র্য হতে। ভিয়েতনামের পার্টি এই আন্তর্জাতিক সংহতিকে কোন দিন ছোট করে দেখেন নি। কিন্তু এই বিষয়েও তাঁদের নিজেদের সংগ্রাম মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। যে অনুপাতে তাঁরা নিজেদের সাগ্রামকে তীব্রতর করতে পেরেছেন, সেই অনুপাতে তাঁরা সাহায্য ও সমর্থন আদায় করতে পেরেছেন। আমরা ভুলতে পারি না যে প্রথম কয়েক বছর, বিশেষ করে ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বে থাকা পর্যন্ত তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়ন হতে

প্রত্যক্ষ সাহায্য বিশেষ পান নি। পরে পেয়েছেন এবং তার জন্য ভিয়েতনামের পার্টি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনৈক্য জনিত যে নেতিবাচক দিকটির কথা উল্লেখ করেছি তা প্রতিপদে তার অশুভ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। গত বছর যখন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ মরিয়া হয়ে ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ ও মাইন অবরোধ চালিয়েছিল, তখন ভিয়েতনামের নেতারা পৃথিবীর প্রত্যেকটি সমাজতান্ত্রিক দেশকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে, এই আক্রমণ সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ। এই ঘোষণা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তথাপি ঐক্যবদ্ধভাবে সামরিক প্রতিরোধে দাঁড়াতে পারলেন না। এই অবস্থায় ভিয়েতনামের পার্টি ও জনগণকে বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করতে হয়েছে। তাই চূড়ান্ত বিজয় এখনও অর্জন করতে হবে। তথাপি তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপর যুদ্ধ বিরতি চুক্তি চাপিয়ে দিতে পেরেছে, মার্কিন সৈন্য অপসারণে তাদের বাধ্য করেছে। বর্তমান বাস্তব অবস্থায় এ এক বিরাট ও ঐতিহাসিক জয়লাভ।

প্রবল শক্তিশালী আণবিক অস্ত্রধর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র শক্তিতে দুর্বল ক্ষুদ্র ভিয়েতনাম লড়ল ও এতবড় জয়লাভ করল কী করে? এটা পৃথিবীর জনগণের কাছে একটা পরম বিস্ময়। সারা বিশ্ব শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাকিয়ে আছে এই বিস্ময় সৃষ্টিকারী মহান জনগণ ও তাদের নেতাদের দিকে। কিন্তু দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের সংগঠক, নেতা ও কর্মীদের তো শুধু বিস্ময় প্রকাশ করলে বা শ্রদ্ধা দেখালে চলবে না। ভিয়েতনামের প্রতি যেমন তাদের কর্তব্য আছে, তেমনি ভিয়েতনাম হতে শিক্ষা নেবার প্রয়োজন আছে আরো বেশী, বিশেষ করে সংকট ও দমননীতি জর্জরিত ভারতের ও আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস-কবলিত পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক এবং মার্কসবাদী কর্মীদের। আমরা ইন্দোনেশিয়ায় গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিপর্যয় দেখেছি। সাম্রাজ্যবাদের অনুচর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতে লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্ট ও তাদের দরদীদের নিষ্ঠুর হত্যা মনকে ব্যথাতুর করে তুলেছে, ঘৃণায় ভরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভিয়েতনামের দৃশ্য সম্পূর্ণ পৃথক। এখানেও প্রাণ দিতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে, কিন্তু তারা জিতেছে, খোদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পর্যুদস্ত করেছে। যেমন করে এই বাহ্যতঃ অসম্ভব ঘটনা বাস্তবে সম্ভব হল?

প্রধানতঃ অস্ত্রের জোরে ভিয়েতনাম জেতে নাই। অস্ত্র তাদের ধরতে হয়েছে, এবং ভাল করেই ধরতে হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে ভিয়েতনামের জনগণকে অস্ত্র ধরতে বাধ্য করেছে। সশ লড়াই তাদের উপর

চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা অস্ত্র তৈরী করেছে ও উন্নত করেছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের কাছ হতে অস্ত্র তারা কেড়ে নিয়েছে; চীন, সোভিয়েত প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশ হতে অস্ত্র তারা পেয়েছে। তথাপি অস্ত্র শক্তিতে তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় কিছুই নয়, অতি দুর্বল। তাই ভিয়েতনামের প্রধান শক্তি অস্ত্র ছিল না, প্রধান শক্তি অস্ত্র ছিল তার জনগণ-যারা লড়েছে এবং প্রয়োজনমত অস্ত্র ধরেছে। ঐক্যবদ্ধ, সচেতন ও মরণপণ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ জনগণ। কেমন করে ও কী গুণে ভিয়েতনামের জনগণ অজেয় শক্তিতে পরিণত হল, তা আমাদের জানা ও তা হতে শিক্ষা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমত:, ভিয়েতনামের জনগণ তাদের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে ব্যাপকতম ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তাদের জয়ের প্রথম চাবিকাঠি এটাই। যদি দেশের মানুষের একটা বড় অংশ (সংখ্যালঘু হলেও) সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের পক্ষে থাকত, অথবা যদি সংখ্যাধিক অংশ নির্লিপ্ত থাকত, তাহলে অস্ত্র ও জনসমর্থনে বলীয়ান শত্রুর সামনে দাঁড়ান যেত না। নিঃসন্দেহে শ্রমিক-কৃষক ছিল এই ঐক্যের ভিত্তি স্তর। কিন্তু সেখানেই তা সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে আগ্রহী সমস্ত স্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং শত্রুকে এক ঘরে করতে পেরেছে। সায়গন সহরের লোকেরা শত্রুর সামরিক আক্রমণের মুখে প্রকাশ্যে চুপ করে থেকেছে বটে, কিন্তু তাদেরও বেশীর ভাগ মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করেছে। বিখ্যাত টেট অভিযানের সময় সায়গনের অভ্যন্তরে, এমন কি আমেরিকান সৈন্যদের বিলাস জাহাজেও শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ এই ঐক্যের পরিচয় দেয়। যেমন যেমন ঐক্যের পরিধি বেড়েছে, তেমনি তেমনিভাবে সংগ্রামে শক্তি ও গতিবেগ এসেছে। জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গড়ার মধ্য দিয়ে মুক্তি যুদ্ধ রূপ পেয়েছে। যখন অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়েছে, তখন ও তার আগে ঐক্য আরো প্রসারিত হয়ে পিতৃভূমি ফ্রন্ট হয়েছে। এই ঐক্য একদিনে গড়ে ওঠে নি, ঐক্যের পথে নানা জটিলতাও ছিল; বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল; বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের মধ্যে স্বার্থের বিভিন্নতা ছিল। সংগ্রামের গতি পথে এই সবকে অতিক্রম করে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

দ্বিতীয়ত:, ভিয়েতনামের জনগণ রাজনীতিগতভাবে অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছিল। জনগণ যদি কম সচেতন থাকত তাহলে শত্রুর আক্রমণে, মিথ্যা প্রচারে, প্রলোভনে তারা বিভ্রান্ত হত এবং তাহলে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে বা লড়তে পারত না। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ যেমন এক হাতে মৃত্যু ও ধ্বংস

এনেছে, তেমনি অন্য হাতে হাজার হাজার কোটি টাকা সাহায্যের বরাভয় দিয়েছে, শান্তির নামে ভাঁওতাবাজী চালিয়েছে। এসবগুলি ভিয়েতনামের জনগণকে ভোলাতে পারে নি। আমাদের দেশে আমরা দেখেছি কীভাবে শুধু "গরীবী হটানর" বুকনি দিয়ে বুর্জোয়া-জমিদার শাসকশ্রেণী দেশের বৃহৎ অংশকে ভাঁওতা দিয়েছিল। একথা সত্য যে, দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের পক্ষে জনগণকে ভাঁওতা দেওয়া যত সহজ, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে তত সহজ নয়; তাছাড়া জনগণের দীর্ঘ দিনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য আছে। তাই আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা ঠিক হয় না। তথাপি একদিকে মৃত্যু, অন্যদিকে বরাভয়—এর চাপ কম ছিল না। জনগণ খুব সচেতন না হলে, এ চাপ সহ্য করতে পারত না। মনে রাখতে হবে যে, ইন্দোনেশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদকে পিছনে রেখে তার অনুচরেরা জনগণের একাংশকে বিভ্রান্ত করতে পেরেছিল।

তৃতীয়তঃ, ভিয়েতনামের জনগণ হিংস্র শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বার মতো হিম্মত সঞ্চয় করেছিল। জনগণের জীবনের কঠিন সমস্যা নিয়ে তাদের সাধারণ আন্দোলনে শামিল করা এক জিনিস, আর বছরের পর বছর মৃত্যু ও ধ্বংস বরণ করে ভবিষ্যতের আশায় সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া অন্য জিনিষ। আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে গুণ্ডামী ও জালিয়াতী করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার পর তীব্রতর আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের মুখে সাময়িকভাবে হলেও ব্যাপক জনগণের মধ্যে বিহ্বলতা দেখা দিয়েছিল। এটা অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে যে, দুই ক্ষেত্রে সংগ্রামের প্রকৃতি ও স্তর সম্পূর্ণ পৃথক; ভিয়েতনামের পিছনে ছিল দীর্ঘ দিনের সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহ্য। এখানে প্রশ্ন তা নয়। আমি শুধু দেখতে চাই, কী অপূর্ব সাহস ও সংগ্রামী দৃঢ়তা অর্জন করেছে ভিয়েতনামের জনগণ। কমরেড লেনিনের একটা বক্তব্য এই প্রসঙ্গে মনে আসছে। তিনি যা বলেছেন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যতদিন জনগণের মধ্যে লড়বার ও 'বাঁচবার' মনোভাব প্রবল থাকবে, ততদিন বিপ্লবী সংগ্রামের অবস্থা আসেনি বুঝতে হবে; বিপ্লব তখনই হয়, যখন জনগণের মধ্যে লড়বার ও 'দরকার হলে মরবার মনোভাব' প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। সংগ্রামী ভিয়েতনামের জনগণ এই গুণই অর্জন করেছে।

উপরে যে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হল সেগুলি ভিয়েতনামের জনগণ আয়ত্ত করেছিল বলেই তারা অজেয় হয়েছে। এই তিনটি বিষয় পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়, এক সূত্রে গ্রথিত। কোনটা আগে ও কোনটা পরে, সে প্রশ্ন ওঠে না। ভিয়েতনামের সংগ্রাম এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে, যদি জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয় অর্থাৎ শত্রুকে জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, যদি তারা সচেতন হয়

অর্থাৎ শত্রু কোনভাবে তাদের বিভ্রান্ত করতে না পারে এবং নিজেদের মুক্তির লক্ষ্য সম্বন্ধে তারা অবিচল থাকে, এবং যদি তাদের লড়বার ও মরবার মতো হিম্মত হয়, তাহলে তারা পাহাড় হেলিয়ে দিতে পারে। দেশে দেশে স্থান কাল পাত্র ভেদে পার্থক্য থাকবে, কিন্তু ভিয়েতনামের এই সাধারণ শিক্ষা প্রত্যেক দেশের মার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক কর্মীদের সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন।

ভিয়েতনামের জনগণ আপনা হতেই এই সব যোগ্যতা অর্জন করে নি। কোন দেশেই তা হতে পারে না। এইখানেই রয়েছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে শিক্ষিত শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নেতার অপূর্ব যোগ্যতার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিত বুঝে ধাপে ধাপে জনগণকে সংগঠিত এবং সচেতন করেছেন, জনগণের নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাদের এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং ঝড় তুফানে দক্ষ নাবিকের মতো তাদের সংগ্রাম তরুনীকে নিয়ে বিজয়ের তীরে পারি দিয়েছেন। তাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে শুধু কন্ঠস্থ করেন নি, তাকে বুঝেছেন; তাঁরা কোন ছক্-কাটা পথে চলেন নাই, নিজের দেশ, জনগণ ও বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে লেনিনবাদ-মার্কসবাদের জ্ঞানকে প্রয়োগ করেছেন। নেতৃত্বের কাজ শুধু সঠিক নীতি নির্ধারণই নয়, সেই নীতিকে জনগণের নীতিতে পরিণত করা, সেই মতো জনগণকে সংগঠিত করা ও তাদের সংগ্রাম পরিচালনা করা। ভিয়েতনামের পার্টি এই সমস্ত কর্তব্যকে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন। শুধু কয়েকজন বিজ্ঞ নেতা থাকলেই জনগণকে এইভাবে সংগঠিত করা যায় না, প্রয়োজন অসংখ্য যোগ্য কর্মীর ও অনুরূপ সংগঠনের। ভিয়েতনামের পার্টি তাও গড়ে তুলেছেন। এমনি যোগ্য পার্টি নেতৃত্বই হল ভিয়েতনামের সাফল্যের মূল চাবি কাঠি।

ভিয়েতনামের সংগ্রাম বলতে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রধানতঃ সশস্ত্র সংগ্রামের ছবি। কিন্তু আসলে ভিয়েতনামের সংগ্রাম হল সশস্ত্র ও রাজনৈতিক উভয়-বিধ সংগ্রাম। সব সময় তাঁরা রাজনৈতিক সংগ্রামকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সংগ্রামের অন্যতম কৌশল হিসাবে আমরা দেখি যে যখন তাঁরা ময়দানে সংগ্রাম চালাচ্ছেন, তখনও আলোচনার টেবিলে বসতে রাজী হয়েছেন। এইভাবে চলেছিলেন বলেই ভিয়েতনামের নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত কৌশল পর্যুদস্ত করেছেন, সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের কোণঠাসা করেছেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে বেশী বেশী করে নিজেদের দিকে টেনেছেন এবং সশস্ত্র সংগ্রামে তাদের শামিল করতে পেরেছেন। ভিয়েতনামের পার্টি সত্যই আদর্শ পার্টি। এঁদের কাজকে নকল

করা নয়, এঁদের সংগ্রামের শিক্ষাকে আয়ত্ত করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

ইন্দো-চীনের সংগ্রাম শেষ হয় নাই, কিন্তু ভিয়েতনামের জনগণ যে বিরাট জয় অর্জন করেছে, তার উপর দাঁড়িয়ে তারা চূড়ান্ত জয়ের পথে এগিয়ে যাবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে ভিয়েতনামের সংগ্রাম ও বিজয় সাম্রাজ্যবাদের সংকটকে আরো গভীর করে তুলছে, সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করেছে এবং সারা দুনিয়ার জনগণের স্বাধীনতা ও গনতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের অনুকূল আবহাওয়াকে আরো অনুকূল করে তুলেছে।

এইবার আমি আমার দেশের ঘটনাবলীর দু-একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি নজর দিতে চাই। গত এক বছরে জনগণের বিরুদ্ধে জমিদার-পুঁজিপতি শ্রেণী-শাসনের আক্রমণ যেমন বেড়েছে, তেমনি জনগণের সংগ্রামও লক্ষণীয়-ভাবে বেড়েছে। এক বছর আগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র নবম কংগ্রেসে সঠিকভাবেই বলা হয়েছিল যে, বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণী শাসনের প্রতিভূ, কংগ্রেস নেতৃত্বে তাদের জনবিরোধী নীতির কোন মৌলিক পরিবর্তন না করেও শুধু নতুন বুকনি ও কৌশল নিয়ে জনগণের একটা ব্যাপক অংশকে প্রতারিত করতে পেরেছে এবং সেই মতো তাদের শ্রেণী-শাসনকে সংহত করেছে; সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়েছিল যে, কংগ্রেস শাসনের এই স্থায়িত্ব বেশী দিন স্থায়ী হবে না; জনজীবনের সংকট বাড়বে, জনগণ দ্রুত মোহমুক্ত হবে বা হচ্ছে; জনগণের সংগ্রাম বাড়বে। মার্কসবাদী কর্মীদের কাজ হল জনগনের মোহমুক্তির প্রক্রিয়াকে সাহায্য করা এবং বিভিন্ন পার্টির প্রভাবের সীমাবদ্ধতার গন্ডী কাটিয়ে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে শামিল করা। এই বিশ্লেষণ কত সঠিক ছিল তা আজকের ঘটনাবলীই প্রমাণ করছে।

এই এক বছরে ভারতের জনজীবনে প্রতিটি সংকট গভীর হতে গভীরতর হয়েছে। ভারতের এত ব্যাপক অংশে এক সঙ্গে এত গভীর খাদ্য সংকট আর কোন দিন দেখা যায় নি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দর কংগ্রেস রাজত্বে আগেও বেড়েছে; এখন তার গতিবেগ অনেক দ্রুত হয়েছে। বেকারী বৃদ্ধি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। জমিদার ও বৃহৎ পুঁজির সেবায় নিযুক্ত কংগ্রেস সরকার জনগণকে পিষে মারছে। তাই, ভূমিসংস্কারের চরম ব্যর্থতা আজ পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত সরকারী কমিটির (টাস্ক ফোর্স) রিপোর্টেও স্বীকৃত।

এক দিকে যখন এই সংকটের গভীরতা, অন্য দিকে তখন দেখা যাচ্ছে সারা ভারতে গণ-বিক্ষোভের প্রবল জোয়ার। কংগ্রেস নেতৃত্বের মিথ্যা প্রচারের ফানুস ফেঁটে যাচ্ছে এবং মিথ্যার কুহেলিক জাল ছিঁড়ে কংগ্রেস শাসনের

প্রতিক্রিয়াশীল কদর্যরূপ জনগণের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। জনগণের দ্রুত মোহমুক্তি ঘটেছে। সারা ভারতের সর্বত্র সংকট জর্জরিত জনগণের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ জমে উঠেছে এবং এই বিক্ষোভ নানাভাবে ফেটে পড়েছে— স্বতস্ফূর্ত ও সংগঠিত উভয় প্রকারের সংগ্রামে। তাই, গোটা ভারতবর্ষে গণ-সংগ্রামের এক নূতন জোয়ার দেখা দিয়েছে। এই সংগ্রামের বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে এর কয়েকটা দিক লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, সংগ্রামের ব্যাপকতা : ভারতের এমন কোন রাজ্য নেই বললেই চলে যেখানে সংগ্রাম চলছে না। এক সংগে এত বেশী রাজ্যে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল বন্ধ আর কখনও (গত ২৬ বছরে) হয়েছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এই সব সংগ্রামে ব্যাপক জনগণের অংশ গ্রহণ, তাদের সাহস ও দৃঢ়তা লক্ষ্যণীয়। লোকো রানিং শ্রমিকদের ও রাজস্থানের সরকারী কর্মচারী ধর্মঘট ও জয়লাভ তাৎপর্যপূর্ণ। মহারাষ্ট্রে খাদ্যের গুদামে আক্রমণ, উত্তর প্রদেশের সশস্ত্র পুলিসের সংগ্রামে—স্তঃফূর্ত হলেও এগুলির মধ্য দিয়ে গণ-বিক্ষোভের তীব্রতা বোঝা যায়। তৃতীয়তঃ, এই সংগ্রামের জোয়ার সৃষ্টিতে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা উল্লেখ যোগ্য; তাদের সংগ্রাম গণ-আন্দোলনের সূচনা করেছে এবং তাকে বিশেষ গতিবেগ দিয়েছে। চতুর্থতঃ, এই সব সংগ্রামে শ্রমিক, কর্মচারী, যুব-ছাত্র, কৃষক ও খেতমজুরদের ঐক্য ও সংহতি বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে। একের সংগ্রামে অন্যের সাহায্য এবং সকলে মিলে সাধারন ধর্মঘট ও হরতাল এই সময়ের বৈশিষ্ট্য। পঞ্চমতঃ, জনগণের সংগ্রামী মনোভাব বাড়ার ফলে বিভিন্ন পার্টি ও গণ-সংগঠনের প্রভাবাধীন জনগণেরমধ্যে ঐক্যের আগ্রহ বাড়িয়েছে, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সম্ভাবনা বেড়েছে, বহিঃপ্রকাশও ঘটেছে। এর প্রভাব পড়েছে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির উপর। তাদের নেতৃত্ব কংগ্রেসকে সমর্থন করার নীতি আঁকড়ে থাকছে, কিন্তু বাস্তব অবস্থার চাপে তারা কোন না কোন ভাবে আন্দোলনের কথা বলতেও বাধ্য হচ্ছে এবং তাদের কর্মীরা আন্দোলনে ছড়িয়েও পড়েছে। যদিও এই পার্টির নেতৃত্বের মধ্যেও কংগ্রেসের অপরাধকে আড়াল করার ও আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি চেষ্টা করছে বা করে চলেছে।

সারা ভারতের গণ-সংগ্রামের এই জোয়ারের পটভূমিকায় আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস কবলিত পশ্চিমবাংলায় ২৭শে জুলাই-এর বন্ধ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। গুণ্ডামী ও জালিয়াতী করে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে যখন শাসক-শ্রেণী পশ্চিমবংগে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসকে বাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন তাদের বিশেষমতলব ও চক্রান্ত ছিল। তারা

দেখেছিল যে ভারতের বেশীর ভাগ জনগণকে তারা সফলভাবেই ধাপ্পায় ভোলাতে পেরেছে, পারে নি শুধু পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরায়; এ গুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের ও জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামের তীব্রতা এবং কংগ্রেস বিরোধী গণতান্ত্রিক মনোভাব ছিল সবচেয়ে বেশী। শাসকশ্রেণী এতে ভয় পেয়েছিল। কংগ্রেস ভেবেছিল যে, ভবিষ্যতে সারা ভারতের অন্যত্রও সাধারণ মানুষ মোহমুক্ত হবে, সেই সম্ভাবনার মুখে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তি নির্বাচনে জিতলে বা প্রধান শক্তি হিসাবে বেরিয়ে এলে এবং তাকে ইতিমধ্যে ধ্বংস করতে না পারলে, পরবর্তীকালে সারা ভারতে গণ-সংগ্রামের পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গের অগ্রবর্তী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি তাদের শ্রেণী শাসনের পক্ষে আরো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। সেই জন্যই তারা চেয়েছিল অন্যান্য জনগণ মোহমুক্ত হবার আগেই পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করতে হবে এবং সে জন্যই নির্বাচনের পরেও তারা আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসকে বাড়িয়ে তুলেছে। ২৭শে জুলাই-এর বন্ধ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে শাসকশ্রেণীর এই মতলব সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

গত দেড় বছরের তীব্রতর সন্ত্রাস পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক শক্তিকে দাবাতে পারে নি, বরং ব্যাপক জনগণ সন্ত্রাস উপেক্ষা করে সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল হয়েছে। ২৭শে জুলাই প্রমাণ করেছে যে, কংগ্রেসী শাসকেরা জনগণ হতে আরো বেশী বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যারা কিছু দিন আগেও কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে, তারাও অনেকে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে গেছে এবং এই বন্ধে শামিল হয়েছে। কংগ্রেসী শাসকেরা যদি এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেষ্টা করেন, যে শ্রমিক, কৃষক ও এমনকি দোকানদাররা পর্যন্ত ২৭শে জুলাই ধর্মঘট-হরতালে যোগ দিলেও বেলা বাড়ার পর, বিশেষ করে ৯টা ও ১০টার পর পুলিসের সাহায্যে কংগ্রেসী মস্তানেরা পিস্তল ছোরা দেখিয়ে তাদের কিছু লোককে কাজে যোগ দেওয়াতে বা কিছু দোকান খোলাতে (যদিও তাতে কাজও হয় নি, দোকানে বিক্রিও হয়নি) পেরেছেন, তাহলে এটা হবে মূর্খের আত্মপ্রসাদ। এ থেকে তো এটাই প্রমাণিত হয় যে, ব্যাপক জনগণ সন্ত্রাসের আবহাওয়া ও সাত দিন ব্যাপী হুমকী উপেক্ষা করে সক্রিয় প্রতিবাদে যোগ দিয়েছেন, শুধুমাত্র সাক্ষাৎ ছুরির সামনে সকলে এখনও দাঁড়াতে পারেন নি, এই ঘটনার তাৎপর্য গভীর। বুঝতে হবে যে, ১৯৭২ সালের মার্চের পর এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জনসাধারণ সন্ত্রাসের মোকাবিলা করে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল হলেন। এ এক বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি।

জনগণের আস্থা হারিয়ে, এত খুন ও জেলের ব্যবস্থা করেও জনগণকে দাবাতে না পেরে যদি কংগ্রেসী শাসকেরা ছোরাছুরি, পিস্তল ও মেসিনগান এবং পুলিস, মিলিটারী ও সশস্ত্র মস্তানদের উপর নির্ভর করে জনগণের বুকের উপর চেপে থাকতে চান, যদি শাসকশ্রেণী এইভাবে জমিদার-পুঁজিপতিদের স্বার্থে দেশের জনগণকে পিষে মারতে চান, তাহলে তার ভবিষ্যত শাসকশ্রেণীর পক্ষে খুব শুভ হবে না, যেমন কোন দেশে হয় নি। শাসকশ্রেণী জনগণের উপর শেষ পর্যন্ত কোন্ পথ চাপিয়ে দেবে তা শাসকদের উপরই নির্ভর করে। তা নিয়ে এখন গণতান্ত্রিক কর্মীদের মাথা ব্যথার কোন প্রয়োজন নেই। আজকের পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য এই—যে শাসকশ্রেণী আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্রবর্তী ঘাঁটিকে ভেঙে দিতে চেয়েছিল কিন্তু তা দিতে পারে নি, বরং রক্ত-ঝরা দেহ নিয়েই এই ঘাঁটি আরো পোক্ত হয়েছে; জনগণের ঐক্য, দৃঢ়তা, সংগ্রামী শক্তি ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বেড়েছে। আর এরই উপর দাঁড়িয়ে মার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক কর্মীদের আরো আত্মবিশ্বাস নিয়ে জনগণের জীবন-জীবিকা ও গণতন্ত্রের স্বার্থে তাদের একতাবদ্ধ আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

দেড়-দু বছর আগের তুলনায় আজকের পরিস্থিতি গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে অনুকূল। তবে আগের শাসকশ্রেণী ভারতের বেশীর ভাগ স্থানে জনগণের বড় অংশকে ভুল বোঝাতে পেরেছিল ও তার হৃত প্রভাবকে বহুলাংশে পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল। সে দিন শাসকশ্রেণীর প্রভাবাধীন সমুদ্রে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক শক্তির অবস্থান ছিল অনেকটা দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন। আর আজ দেড় বছর পর অবস্থা পালটে গেছে। সারা দেশ আজ শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরার সংগঠিত গণতান্তিক শক্তি আজ আর বিচ্ছিন্ন নয়; সারা ভারতে অগ্রসরমান গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে মিলে এই অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলি আরো বেশী শক্তি সঞ্চয় করেছে। দেশব্যাপী বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের তরঙ্গশীর্ষে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক শক্তি শাসক শ্রেণীর আধা-ফ্যাসিস্ট হিংস্র আক্রমণকে প্রতিহত করে এগিয়ে চলেছে।

সারা দেশব্যাপী জনগণের সংগ্রামের জোয়ার এক বিশেষ প্রশ্ন সামনে এনেছে। সংগ্রামগুলির মধ্যে বেশী স্বতস্ফূর্ততার উপাদান রয়েছে। এমনি অবস্থায় যে প্রশ্ন খুব গুরুত্ব অর্জন করেছে, তা হল: শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও গণতান্ত্রিক শক্তি এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক সংগ্রামী জনগণকে দ্রুত সংগঠিত করে সঠিক দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, অথবা প্রতি-

প্রতিক্রিয়াশীল ও বিভেদকামী শক্তিগুলি এই সরকার বিরোধী ব্যাপক গণ-অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে তাদের নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করবে ও গণ-আন্দোলনকে বিপথগামী করবে? লক্ষ্য করতে হবে, যে গণতান্ত্রিক শক্তি যেমন বাড়ছে, তেমনি অনেক স্থানে গণতান্ত্রিক শক্তির আপেক্ষিক দুর্বলতার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি সক্রিয় হয়েছে এবং কিছু শক্তি বৃদ্ধিও করেছে। ভিয়েতনামের সংগ্রামের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি দেখিয়েছি, যে গণ-সংগ্রামের সঠিক অগ্রগতির জন্য শুধু সঠিক নীতিই যথেষ্ট নয়, সাংগঠনিক শক্তি ও যোগ্যতারও প্রয়োজন। এই কথা মনে রেখেই মার্কসবাদী ও গণ-তান্ত্রিক কর্মীদের সকলকে কাজ করতে হবে।

গত এক বছরের ঘটনাবলীর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী ও গণ-তান্ত্রিক কর্মীদের যথেষ্ট গর্ব করার বিষয় আছে। কিন্তু, সেই সাথে বুঝতে হবে যে, আত্ম-সন্তুষ্টির কোন অবকাশ নেই। গত নির্বাচনের সময় এখানে তৎপূর্বকালীন পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। তাই পশ্চিমবঙ্গে পুরানো দিন আর ফিরে আসবে না, জনগণ হতে তারা আরো বেশী বিচ্ছিন্ন হয়ে ও জনগণের সংগ্রামী শক্তি দেখে শাসকশ্রেণী আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। তাই শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর ও জনসাধারণের বেশী বেশী অংশকে আরো সংগঠিত ও রাজনৈতিক সচেতন করে এবং শাসকশ্রেণীর আক্রমণকে মোকাবিলা করার জন্য গণতন্ত্রের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের যে সম্ভাবনা বেড়েছে, তাকে কাজে লাগিয়ে মিলিত সংগ্রামের ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করতে হবে।

মনে রাখা দরকার যে, জনগণের সংগ্রামী শক্তি বাড়লেও এখনও যথেষ্ট দুর্বলতা আছে। গণতান্ত্রিক শক্তি ধবংস করার জন্য শাসকশ্রেণীর যে চক্রান্ত তা ব্যর্থ হলেও শাসকশ্রেণীর আক্রমণ ক্ষমতাকে নষ্ট করার মতো শক্তি এখনও শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক জনসাধারণ অর্জন করতে পারেনি। মনে রাখা দরকার, সারা ভারতে গণ-সংগ্রামের তুফান বইলেও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠিত শক্তি এখনও খুব দুর্বল। গণতান্ত্রিক শক্তির অসম বিকাশ এখনও বাস্তব ঘটনা।

গত এক বছর আমরা এগিয়েছি, জনগণের সংগ্রামী শক্তি বেড়েছে, আমাদের সকলের আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে। কিন্তু, পথ চলার এখনও অনেক বাকী। তাই মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরিস্থিতি বুঝে শাসকশ্রেণীর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল পথ বেয়ে এগুতে হবে। এই হল ১৯৭৩ সালের আহবান।

—নন্দন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০

১৮ আধা-ফ্যাসিষ্ট সন্ত্রাস ও বর্তমান কর্তব্য

পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি দিন দিন আরো ঘোরালো হয়ে উঠেছে। এই রাজ্যের শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের সামনে আগের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক কঠিন সংগ্রামের প্রশ্ন উপস্থিত হয়েছে। তাই, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর কর্তব্য আজকের পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে বোঝা, কোন দিকে বর্তমান অবস্থা যাচ্ছে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রাখা ও বোঝা এবং তার ভিত্তিতে চেতনার দিক দিয়ে, মনের দিক দিয়ে এবং সংগঠনের দিক দিয়ে নিজেদের ও কর্মীদের প্রস্তুত করা এবং সাধারণ জনগণকে সংগঠিত ও রাজনৈতিকভাবে প্রস্তুত করা।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণের জীবনে অর্থনৈতিক সংকট অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সারা ভারতের সামগ্রিক অর্থনীতির অংগ হোল পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি। তাই সামগ্রিক সংকটের ছাপ এর উপর পড়বেই। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এইটুকু বলাই যথেষ্ট নয়, এখানে সংকট সবচেয়ে ঘনীভূত রূপ নিয়েছে। তের শ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ এখানে গ্রাম্য অর্থনীতিকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে; জোতদার-মজুতদারের দ্বারা এখানে অর্থনীতি আরো বেশী অভিশপ্ত। দেশ বিভাগ এই অর্থনীতিকে আরো ভেংগেছে। তার উপর গত ২৪ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা ও পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক ব্যবহার জনজীবনে সংকট সৃষ্টি করেছে। দুর্ভিক্ষ ও দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি যতই আঘাত খেয়ে থাকুক না কেন, যদি এখানের অর্থনীতির সম্পদের বেশির ভাগকে এখানের জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হত এবং সেই সংগে জোতদারী-মজুতদারী ও একচেটিয়া পুঁজির অবাধ লুন্টনকে আঘাত দেওয়া হত, তাহলে তার উপর দাঁড়িয়েই এখানে অর্থনীতিকে দ্রুত গড়ে তোলা যেত।

ভূমিসংস্কারের প্রশ্ন নিয়ে খেলা করা হয়েছে, আর মজুতদারীকে পুষ্ট করা হয়েছে; বৃহৎ পুঁজিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা হয়েছে। কাঁচা মালের প্রয়োজনীয় পারমিট না দিয়ে ছোট ছোট শিল্পকে আঘাত দেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের অভ্যন্তরে নূতন সম্পদ সৃষ্টির পথকে সংকুচিত করা হয়েছে। অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গের নিজের সৃষ্ট সম্পদ হতে কেন্দ্রীয় সংহতির নামে তাকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে ও হচ্ছে। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের

প্রয়োজন খুব বেশী ; সেখানে পশ্চিমবঙ্গকে তার নিজের সম্পদ হতে সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত করা হচ্ছে। এত বেশী রক্তক্ষরণ করলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি যে ভেঙ্গে পড়বে, তাতে আশ্চর্য কী? আশ্চর্য এই যে, এর পরেও ভারতে শাসক কংগ্রেস নেতারা ও তাদের স্তাবকেরা একথা বলার স্পর্ধা রাখেন, পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন এবং তাঁরা পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য করছেন।

দীর্ঘদিন নোনা ধরতে ধরতে গোটা বাড়ি যেমন ভেঙে পড়তে আরম্ভ করে, তেমনি শাসকশ্রেণীর জনবিরোধী পুঁজিবাদী বিকাশের নীতির ঘুণ-ধরা ব্যবস্থার চাপে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ভেঙ্গে যাচ্ছে, সংকটের আবর্তে গোটা জন জীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ এবং অনিশ্চিত ও উদ্বেগপূর্ণ বর্তমান জনজীবনকে আলোড়িত করেছে। বেকারী আগেও ছিল, কিন্তু এখন তা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। পাঁচ-সাত বছর আগেও স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা পাঠ্য জীবন শেষে যেটুকু কাজের আশা করতে পারত, আজ তারা তাদের সে আশাও রাখতে পারছে না। তাদের সামনে অন্ধকার। শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের যদি এই অবস্থা হয়, অশিক্ষিতদের ততোধিক শোচনীয় অবস্থা হবে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। নূতন কর্ম সংস্থানের সুযোগ যে আরো সংকুচিত হয়েছে তাই নয়, যাদের কাজ ছিল তারাও তা হারাচ্ছে।

প্রায় সাড়ে চার শত কলকারখানা ও অফিস বন্ধ হয়েছে, এবং তার ফলে প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে গরীব কৃষক, বর্গাদার ও খেতমজুরদের অবস্থা হয়েছে আরো ভয়াবহ। বর্তমান আদমসুমারীর (১৯৭১) প্রাথমিক রিপোর্টে দেখা গেছে যে, গত দশ বছরে ক্ষেতমজুরদের সংখ্যা ১৫ শতাংশ হতে বেড়ে প্রায় ২৫ শতাংশ হয়েছে। এই গ্রামের গরিবরা যে কি করে বেচে আছে এটা ভাবতেই আশ্চর্য লাগে। কি অদ্ভুত জীবনী শক্তি, জীবন সংগ্রামে হতাশ হয়ে এরা হার মানতে চায় না। এমনি হার না মানার মনোভাব মধ্যবিত্তের একাংশ দেখাতে পারে না। তাই শোষকদের মধ্যে ছোট হলেও একটা অংশ হতাশজনিত মস্তানি ও উশৃংখলতার শিকারে পরিণত হয়। যদিও শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন এদের বেশির ভাগকে সুস্থ সংগ্রামের জোয়ারে টানতে পারে ও টানছে।

উপরে হতে আইন করে ভূমিসংস্কার করা সম্বন্ধে মেহনতী কৃষকদের মোহ আরো কেটে যাচ্ছে। গরীবী হটানোর বুলির আড়ালে জিনিসপত্রের দর ক্রমে বেড়েই চলেছে। ট্যাক্সের বোঝাও তাই। অথচ জীবিকার মূল্যমান হ্রাসের কল্পিত অজুহাতে শ্রমিকদের মজুরী কাটা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিকদের মহার্ঘ ভাতা মাসে ১২ টাকা কাটা শুরু হয়ে গেছে। সীমান্তের ওপর বাংলাদেশে মিলিটারী আক্রমণের ফলে ওখানের চটকলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের চটকল মালিকদের যখন দু-হাতে মুনাফা লোটার নূতন সুযোগ মিলেছে, ঠিক তখনই চটকল শ্রমিকদের মাসে প্রায় ৯ টাকা মহার্ঘ ভাতা কাটার ব্যবস্থা হচ্ছে।

এমনিভাবে যখন জনজীবন অর্থ সংকটে বিপর্যস্ত, ঠিক তখনই জনগণের বিরুদ্ধে, গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিস, সি. আর. পি, মিলিটারী ও ঘাতক গুণ্ডাদের মিলিত আক্রমণ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। শাসকশ্রেণীর স্বার্থে কংগ্রেসের কথামত দৈনিক মিথ্যা সাজানো মামলা, গ্রেপ্তার করা, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা, বিনা বিচারে আটক করা, ধরে নিয়ে গিয়ে দৈহিক নির্যাতন চালানো, গুলি করা, পুলিস আশ্রিত গুণ্ডাদের দিয়ে খুন করা—সব কিছু মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ইংরেজ আমলে ও পরে কংগ্রেস শাসনে পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী জনসাধারণ অনেক তীব্র পুলিসী আক্রমণ সহ্য করেছে।

১৯৫৯ সালে ও ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনের সময় নারকীয় পুলিসী অত্যাচার দেখা গেছে। ১৯৬৮ সালে বিশ্বাসঘাতক শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রিসভার পতনের পর রাষ্ট্রপতি শাসনে বর্বর পুলিসী আক্রমণ চলেছে। কিন্তু ১৯৭০ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেবার পর হতে যে আক্রমণ চলেছে এবং যা ধাপে ধাপে তীব্রতর হচ্ছে, তার সংগে অতীতের কোন আক্রমণের কোন তুলনাই হয় না। আজকের আক্রমণ দমননীতি বা পুলিসী অত্যাচার সম্বন্ধে প্রচলিত ধ্যান ধারণার বাইরে চলে গেছে। অতীতেও মিথ্যা মামলা সাজানো হয়েছে। কিন্তু, কথায় কথায় ও এমন কি বিনা অজুহাতে এত হাজার হাজার সাজানো মামলা দেখা যায় নাই। গ্রেপ্তারের সংখ্যা কত হাজারে দাঁড়িয়েছে তা বলা শক্ত। গ্রেপ্তারী পরোয়ানার সংখ্যা কম করে এক লক্ষের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে। এর সংগে যুক্ত হয়েছে পুলিস ও সি. আর. পি-র বেপরোয়া মার; আরো যুক্ত হয়েছে নির্যাতন ও খুন এবং তার সংগে মিলিটারীর কুম্বিং।

শুধু তাই নয়, পুলিস সি. আর. পি-র আক্রমণের সংগে সংগতি রেখে শাসকশ্রেণী সৃষ্ট গুণ্ডাদের দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হচ্ছে। গত বছর মে-জুন মাস হতে এই হত্যা শুরু করা হয়েছে এবং ধাপে ধাপে তাকে আরো সংগঠিত করা হচ্ছে। সংগে সংগে রাজনীতির পোষাক পরা এক ঘাতকবাহিনীকে পুষ্ট করা হচ্ছে। এর মধ্যে সাড়ে চার শতের বেশী মার্কসবাদী কর্মী ও সমর্থকদের খুন করা

হয়েছে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই প্রথম শাসকশ্রেণী পশ্চিমবঙ্গে খুনের পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। খুন এবং খুনীরা যে শাসকশ্রেণীর দ্বারা সংগঠিত তা বুঝতে জনসাধারণের এতটুকু অসুবিধা হয় না। যখন দেখা যাচ্ছে যে, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী বা গণ-আন্দোলনের কর্মী খুন হলে পুলিস আশ্চর্যজনকভাবে নীরব থাকে, "আততায়ী অপরিচিত" এই অজুহাতে খুনীদের সংগে খোলাখুলিভাবে সহযোগিতা করে। অন্য দিকে জনগণের আত্মরক্ষা প্রচেষ্টার ফলে কোন খুনী নিহত বা আহত হলে সমগ্র এলাকাকে পুলিশ তছনছ করে ফেলে।

রাজনৈতিক কারণে খুন ও খুনীদের সংগঠিত করতে গিয়ে শাসকশ্রেণী ভেংগে পরা সমাজের মধ্য হতে অপরাধ-প্রবণ শক্তিকে মাথা তুলতে সাহায্য করছে। ফলে শুধু রাজনৈতিক হত্যাই নয়, সাধারণ ছিনতাই, লুঠ, ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় প্রভৃতি সব কিছু অপরাধই বেড়ে যাচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষের নাগরিক জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই অশুভ শক্তির হাত হতে শাসক পার্টির সমর্থকও রেহাই পাচ্ছে না। সারা পশ্চিমবংগে সামগ্রিকভাবে একটা ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করা হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে দেখা গেছে যে, শোষক ও শাসকশ্রেণী ফ্যাসিবাদী আক্রমণ এবং মিলিটারী শাসন প্রতিষ্ঠার অজুহাত সৃষ্টির জন্য এমনি এক অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করে।

এক দিকে গভীর অর্থনৈতিক সংকট ও অন্য দিকে শাসকশ্রেণীর এই সংগঠিত আক্রমণ পশ্চিমবংগের জনগণ ও গণতান্ত্রিক শক্তির সামনে এক বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। অর্থনৈতিক আঘাতের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তীব্রতর ও ব্যাপকতর করা যখন সব চাইতে প্রয়োজন, ঠিক তখনই তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হচ্ছে। এই শেষোক্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি অর্জন করতে না পারলে, জনগণের দৈনন্দিন দাবির আন্দোলন করা দুষ্কর।

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, জমি রক্ষার জন্য, মজুরির জন্য কৃষক, ক্ষেতমজুর কেমনভাবে সংগ্রাম করবে, যদি না এই রাজনৈতিক আক্রমণের মোকাবিলা সে করতে পারে? ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে, বন্ধ কলকারখানা খোলার দাবিতে ও মহার্ঘভাতা বা বোনাসের জন্য শ্রমিক কীভাবে সংগ্রাম করবে? বেকারীর বিরুদ্ধে, জিনিষপত্রের উচ্চ মূল্যের বিরুদ্ধে জনগণ কী ভাবে দাঁড়াবে? তাই জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ তাদের দৈনন্দিন গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধেই আক্রমণ। সেই জন্যই শ্রমিক-কৃষকের দৈনন্দিন

দাবির আন্দোলন ও শাসকশ্রেণীর তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম আজ আরো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছে।

পুলিশ, সি. আর. পি, মিলিটারী ও গুণ্ডাদের আক্রমণ এমন পর্যায়ে উঠেছে, যখন রাষ্ট্র সম্বন্ধে কমরেড লেনিনের শিক্ষাকে নূতন করে স্মরণ করা প্রয়োজন হচ্ছে। রাষ্ট্র হোল এক শ্রেণীর হাতে অন্য শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখার সশস্ত্র শক্তি। বুর্জোয়া রাষ্ট্র সংখ্যালঘু শোষক (বুর্জোয়া) শ্রেণীর স্বার্থে শ্রমিক-কৃষক ও জনগণকে দাবিয়ে রাখার জন্য অত্যাচারের যন্ত্র। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর কতকগুলি আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক অধিকারের আড়ালে, এই মূল অত্যাচারের রূপটিকে ঢেকে রাখার চেষ্টা হয়। কিন্তু, এই গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি যখন শাসকশ্রেণীর কাছে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, তখন তারা নির্লজ্জভাবে এই অধিকারগুলি কেড়ে নিয়ে জনগণের সামনে নগ্ন ঘাতকের মূর্তি নিয়ে হাজির হতে দ্বিধা করে না। পশ্চিমবঙ্গে এই বিপজ্জনক প্রক্রিয়াই শুরু হয়েছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে মিলিটারি হল সবচেয়ে শক্তিশালী হিংসার যন্ত্র।

কিন্তু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাধারণত দেশ রক্ষার নাম করে মিলিটারিকে আড়ালে রাখা হয়, পুলিস দিয়েই সাধারণত প্রচলিত শোষন ব্যবস্থাকে আইন-শৃংখলার নামে রক্ষা করা হয় এবং শোষিত জনগণের জন্য কিছু আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করা হয়। এতে রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রকে ঢেকে রাখতে সুবিধা হয়। কিন্তু, চরম প্রতিক্রিয়াশীল পথে অগ্রসর হতে হলে তার সে চরিত্রকে আর ঢাকা দেওয়া যায় না। সে অবস্থায় তার একটা বিশেষ লক্ষণ হল, এক দিকে শাসকশ্রেণীর দ্বারা গঠিত ও রাষ্ট্রের দ্বারা আশ্রিত আধা-সরকারী বা বে-সরকারী জল্লাদ বাহিনী সৃষ্টি করা এবং বুর্জোয়া আইন কানুনেরও পরোয়া না করে তাদের দ্বারা বিপ্লবী কর্মীদের হত্যা করা। পশ্চিমবঙ্গে তারই লক্ষণ দিন দিন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সেই জন্যই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এই অবস্থাকে আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের রাজ বলে সঠিকভাবে বর্ণনা করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝতে হলে আর একটি বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এখানে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলার জন্য অর্থাৎ আসলে জনগণকে দাবিয়ে রাখার জন্য ৬০,০০০-এরও বেশী পুলিস আছে। আগেই বলা হয়েছে, যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণতঃ পুলিশকে দিয়েই এই কাজ করানো হয়। অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও এই পুলিস ইংরেজ আমলের ঔপনিবেশিক নিষ্ঠুরতায় ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

যুক্তফ্রন্টের আমলে পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়, তার প্রভাবে পুলিসের মধ্যে জনগণের সঙ্গে আগের তুলনায় একটু ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলার এক ক্ষীণ প্রচেষ্টা শুরু হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সঙ্গে দৈনন্দিন ব্যবহারে ভাল সম্পর্ককে (অবশ্যই শ্রেণীর স্বার্থের পরিধির মধ্যে) স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু, বিশ্ব ব্যাপী পুঁজিবাদী পচনের যুগে ভারতের শাসকশ্রেণীর পুলিসের ঔপনিবেশিক নিষ্ঠুর ঐতিহ্যকে সযত্নে তারা রক্ষা করতে চায়। তাই, পশ্চিমবঙ্গে পুলিসের মধ্যে ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যকে শিথিল করার ক্ষীণতম প্রচেষ্টাকে তারা আতংকের চোখে দেখে এবং একে অংকুরে বিনাশ করার জন্য গুণ্ডামির অপরাধে হাতে নাতে ধৃত ও শাস্তি প্রাপ্ত পুলিসদের কংগ্রেসী শাসকেরা নিস্কৃতি দেয় এবং যাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই এমন নন-গেজেটেড পুলিস কর্মচারী সমিতির অসংখ্য কর্মকর্তাদের কর্মচ্যুত করে। গত এক বছরের মধ্যে তথাকথিত উগ্রপন্থীদের দ্বারা শতাধিক সাধারণ পুলিস হত্যার পিছনে রহস্যও এইখানে খুঁজে পাওয়া যাবে।

গত বছর যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দেবার পর ভারতের শাসকশ্রেণী স্থির করল যে, পশ্চিমবঙ্গে ষাট সহস্রাধিক রাজ্য পুলিস থাকলেও এবং তার মধ্যে ঔপনিবেশিক নিষ্ঠুরতার ঐতিহ্য থাকলেও এখানের জনগণকে দাবানোর পক্ষে তা আর যথেষ্ট নয়। তাই, সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বাইরে থেকে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বাধীন প্রায় ৫০,০০০ সি. আর. পি. [সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিস] ও শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীকে [ইনডাসট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স] এখানে এনে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। অত্যাচারের যন্ত্র হিসাবে এই কেন্দ্রীয় পুলিস বাহিনী ভারতের শাসকশ্রেণীর এক নূতন আবিষ্কার। বিভিন্ন ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার দেখে এই বাহিনী তৈরী করা হয়েছে। এক রাজ্য হতে সংগৃহীত পুলিসকে অন্য ভাষাভাষী রাজ্যের জনগণকে পেটাবার জন্য ব্যবহার করার মধ্যে বিশেষ কুমতলব আছে।

প্রথমতঃ, এদের সঙ্গে রাজ্যের জনগণের কোন সম্পর্ক না থাকায় এরা কেন্দ্রীয় নির্দেশে রাজ্য পুলিসের চেয়ে অনেক বেশী হিংস্র হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে এদের ব্যবহার তাই প্রমাণ করেছে। দ্বিতীয়তঃ, এক রাজ্যের জনগণকে দাবানোর জন্য অন্য রাজ্য হতে সংগৃহীত পুলিস ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে ঐক্যের বদলে বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ করে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলন খুব শক্তিশালী বলে এই

উদ্দেশ্য সফল হতে পারছে না, কিন্তু শাসকশ্রেণীর অপচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। দেড় বছরের বেশী হল, এমনি ৫০,০০০ কেন্দ্রীয় পুলিস ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু তাতেও শাসকশ্রেণী নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। তাই নয় মাস হতে চলল, এখানে রাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র মিলিটারিকে নিয়োগ করা হয়েছে। চার ডিভিশন বা ৫০,০০০ মিলিটারী জনগণের বিরুদ্ধে নিযুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি পার্লামেণ্টে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই সি. আর. পি. ও মিলিটারী পশ্চিমবংগে থেকে যাবে।

সি. আর. পি. ও মিলিটারি আমদানির অজুহাত হিসাবে খুনোখুনি বন্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। এটা একেবারেই মিথ্যা এবং শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত বিসদৃশ চেষ্টা মাত্র। আজকের কোন খুনোখুনিই গণ-আন্দোলন হতে উদ্ভূত সংঘাতের পরিণতি নয়। এগুলি নিছক ব্যক্তি হত্যা, গুপ্ত হত্যা, হঠাৎ আক্রমণ এবং তার সংগে যুক্ত হয়েছে ছিনতাই, লুঠ ইত্যাদি। যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে কোন গুপ্ত হত্যা বা ব্যক্তি হত্যা ঘটেনি; এমনকি ছিনতাই ও হামলাবাজি একেবারেই ছিল না। তখন সাধারণ মানুষ কোন হামলাবাজির ভয় না খেয়ে নিশ্চিন্তে জনগণ রাস্তায় চলাফেরা করেছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে কোন লোক নিহত হয় নি তা নয়, কিন্তু তা ছিল মূলত কৃষক ও শ্রমিকের সংগ্রামের বিরুদ্ধে জোতদার ও মিল মালিকদের গুণ্ডাদের আক্রমণের পটভূমিকায় উদ্ভূত সংঘাত হতে। এতেও পশ্চিমবংগের নিহতের সংখ্যা ছিল নগণ্য।

যুক্তফ্রন্ট শাসনের তের মাসে নিহত হয়েছে এক শত কয়েকজন এবং তাদেরও বেশীর ভাগ সংগ্রামরত সাধারণ শ্রমিক ও কৃষক। তাই, খুনোখুনি বন্ধের জন্য সি. আর. পি, মিলিটারি আমদানির অজুহাত মিথ্যা কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। বরং দেখা যাবে যে, সি. আর. পি. এবং মিলিটারির আশ্রয়ে হত্যা ও উশৃংখলতা বেড়ে চলেছে। তাই, তারা এই অজুহাতে সাধারণ মানুষকে পেটাবে এবং হচ্ছেও তাই। হত্যাকারী ও গুণ্ডাদের চেনে পুলিস অফিসাররা। শাসকশ্রেণী ইচ্ছা করলে এদের দিয়ে জনগণের সমর্থন নিয়ে এ সব কাণ্ড অল্প দিনে বন্ধ করতে পারে। আসলে সি. আর. পি. ও মিলিটারি দিয়ে পশ্চিমবংগকে দমনের জন্য আনা হয়েছে।

আসলে শ্রেণী শাসনের স্বার্থে শ্রীমতী গান্ধী পরিচালিত শাসকবর্গ সত্যকার দেশ রক্ষার ব্যবস্থাকে দুর্বল করেছে। এর থেকে একদিকে প্রমাণিত হচ্ছে শাসকশ্রেণীর সংকট, অন্য দিকে প্রমাণিত হচ্ছে মার্কসবাদের এই সিদ্ধান্ত যে বুর্জোয়া-জমিদার শাসকশ্রেণীর কাছে দেশের স্বার্থ অপেক্ষা লুন্ঠনের স্বার্থই বড়। রাষ্ট্রের শ্রেণী-চরিত্র এ হতে আরো পরিষ্কার

হচ্ছে। ৬০,০০০ রাজ্য পুলিস থাকা সত্ত্বেও সাড়ে চার কোটি মানুষের দেশে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য বাইরে থেকে আমদানি করা লক্ষাধিক সি. আর. পি. ও মিলিটারি নিয়োগের ব্যবস্থা একটা বিপজ্জনক অবস্থার দিকে অংগুলি নির্দেশ করছে। বহু জাতি-ভিত্তিক ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিকারকে ধ্বংস করতে গিয়ে এই ভাবে দেশের সংহতি ও দেশরক্ষা ব্যবস্থাকেও আঘাত করা হচ্ছে।

সেই জন্যই জনগণের জীবন-জীবিকার আন্দোলনের অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা, সি. আর. পি. ও মিলিটারি প্রত্যাহার এবং রাজ্যগুলির জন্য অধিকতর ক্ষমতা ও অর্থের অধিকার—এই সমস্ত অধিকারের সংগ্রাম আজ সমস্ত মার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তির নিকট আরো অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। এর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির জন্য সংগ্রাম করা যায় না। ইতিহাস এই সংগ্রামেরই পুরভাগে দাঁড় করিয়েছে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে এবং সেই জনাই শাসকশ্রেণীর সমস্ত আক্রমণ এই পার্টির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এর জন্য গর্বিত। দুঃখের কথা এই যে সংশোধনবাদী দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি এবং কয়েকটি মধ্যবিত্ত পার্টি মুখে সমাজতন্ত্র ও বামপন্থীর বুলি আউড়ে ইতিহাসের শিক্ষা নিতে অস্বীকার করছে এবং শাসকশ্রেণীর হাতকেই শক্তিশালী করছে।

কেন পশ্চিমবংগের বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণীর এই হিংস্র আক্রমণ এবং কীভাবে তা ধাপে ধাপে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে তা একটু দেখা ভাল। এ সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন দেখি না, কারণ তা অনেকেই জানেন। আমি শুধু সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই। ভারতের বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে রাজ্য সরকারগুলির অতি-সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা মনে রেখে পশ্চিমবংগের মার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে মোটামুটি সঠিকভাবেই সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে ও অন্যান্য গণ-আন্দোলনে অভূতপূর্ব জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তাই জনগণের চেতনা ও সংগঠন দ্রুত বেড়েছিল। গ্রামের গরীবদের মধ্যে জাগরণ ছিল সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য। তাই, কমরেড লেনিন বারে বারে শ্রমিক-আন্দোলনের সংগে গ্রামের গরীবদের আন্দোলনের সংযোগ স্থাপনের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। পশ্চিমবংগে তা বাস্তব রূপ নিতে শুরু করে।

গণশক্তির এই বিপুল প্রসার দেখে এবং সারা ভারতে তার সম্ভাব্য প্রভাবের কথা ভেবে শাসকশ্রেণী আতংকিত হয়ে পড়ে। এরই পরিণতিতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানো হল এবং গণ-আন্দোলন দমনের জন্য রাজ্য

পুলিস ছাড়াও সি. আর. পি. আমদানি করা হল। এই নূতন আক্রমণের মুখে গণতান্ত্রিক শক্তির সামনে প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল, যে কোন মূল্যে অর্জিত অধিকার রক্ষা করা, বিচারের প্রহসনের কাছে মাথা না নোয়ানো এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন-প্রতিষ্ঠার জন্য পুনর্নির্বাচনের দাবি আদায় করা। শাসকশ্রেণী ভেবেছিল যে, একদিকে বাংলা কংগ্রেস, দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতিদের সাহায্যে কুৎসা চালিয়ে ও বিভেদ সৃষ্টি করে এবং অন্য দিকে পুলিস, সি. আর. পি-র আক্রমণ চালিয়ে মার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে দুর্বল করতে এবং ভেঙে দিতে পারবে। তারা তাতে ব্যর্থ হয়ে বিধানসভা ভেঙে দিতে বাধ্য হয় এবং ভবিষ্যত নির্বাচনের কথা মনে করে শাসকশ্রেণী আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

শাসকশ্রেণীর আক্রমণের দ্বিতীয় স্তর শুরু হল। পুলিস, সি. আর. পি-র আক্রমণ তীব্রতর করার সংগে যুক্ত করা হল গণ-আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের হত্যা করা! শাসকশ্রেণী ভাবল যে, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও তার পরিচালনার জনাই গণতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করা যাচ্ছে না, তাই এদের হত্যা করতে হবে। শাসকশ্রেণীর উচ্চ পর্যায়েই এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। একবার যদি শাসকশ্রেণী হত্যার সিদ্ধান্ত করে তখন হত্যাকারীদের দল সংগঠিত করতে অসুবিধা হয় না। ক্ষয়িষ্ণু সমাজের পতন হতে ক্ষুদ্র একটি ছাত্র-যুবকদের দল সংগ্রহ করে হিটলারের ব্রাউন সার্ট ও ইন্দোনেশিয়ার কামি এবং কাপির অনুকরণে ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসকে এই কাজের জন্য প্রস্তুত করা হতে লাগল। সমাজ বিরোধীদের রাজনীতির পোশাক পরিয়ে কাজে লাগানো চললো? হঠকারী রাজনীতির অনিবার্য পরিণতি হিসাবে অধঃপতিত নকশালপন্থীদের নরম-গরম পদ্ধতির সাহায্যে শাসকশ্রেণী এই ঘৃণ্য কাজে তাঁদের লাগাতে চেষ্টা করল।

১৯৬৭ সালে যে নকশালপন্থীদের শ্রীঅজয় মুখার্জি গুলিতে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, যাকে সমর্থন করেছিলেন শ্রীমতী গান্ধী এবং যা নিয়ে মার্কসবাদীদের সংগে শ্রীঅজয়বাবুর তীব্র মতভেদ ঘটেছিল। ১৯৭০ সালে সেই নকশালপন্থীদের শ্রীঅজয়বাবু ও শ্রীমতী গান্ধী উভয়েই ভাল ছেলে বলে পিঠ চাপড়ালেন, এবং সেই সংগে বারাসতে আটটি গুলি বিদ্ধ মৃতদেহ ফেলে দিয়ে শাসকশ্রেণী দেখিয়েছিল তাদের নির্দেশ না মানলে কি ফল হবে। তাদের নরম-গরম পদ্ধতির ফল আশানুরূপই হল। এমনি অবস্থায় গণতান্ত্রিক শক্তির ও শ্রমিকশ্রেণীর সামনে আগের কর্তব্যের সংগে আর এক কঠিন কর্তব্য যুক্ত হল—আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা। এই কর্তব্যের কথা বাদ দিয়ে অন্যান্য কর্তব্যগুলি পালন করার কথা চিন্তাও করা যেতে পারে না।

শাসকশ্রেণীর আক্রমণে ক্ষত বিক্ষত হয়েও বিপ্লবী গণশক্তি এই কঠিন পথেই এগিয়ে চলল।

এমনি অবস্থায় শাসকশ্রেণী সারা ভারতে সামগ্রিকভাবে নূতন নির্বাচনের পক্ষে তার অনুকূল অবস্থার কথা বিবেচনা করে এবং পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন না করলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের ঝুঁকি নিতে বাধ্য হল, তখন তার আক্রমণকে আর এক ধাপ বাড়িয়ে দিয়ে তৃতীয় স্তরে তুলল। পুলিস, সি. আর. পি-র আক্রমণ ও গুপ্ত হত্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে মিলিটারি আমদানি করে সন্ত্রাসের আবহাওয়াকে বাড়িয়ে তোলা হল। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। একদিকে সংসদীয় গণতন্ত্রের অংগ হিসাবে নির্বাচন, অন্য দিকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ঠিক বিপরীত আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস। শাসকশ্রেণী ভেবেছিল— যে এর দ্বারা তারা কৃত্রিমভাবে নির্বাচনে জিততে পারবে।

কেরালা, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবংগ বাদে শাসকশ্রেণীরা সর্বত্রই বিপুলভাবে জিতল। শাসক-গোষ্ঠীর হিসাব ঠিকই ছিল, যে জনগণকে প্রতারিত করার ক্ষমতা তাদের এখনও আছে। ২৩ বছর জনগণের শত্রুতা করে শুধু নয় "গরিবী হটানোর" নূতন বুলি আউড়ে ও কিছু উপর ব্যবস্থা নিয়ে তারা জনগণকে প্রতারিত করে বিপুল ভোটে জিততে পারল। আদি কংগ্রেস, জনসংঘ ও স্বতন্ত্র পার্টি দক্ষিণ দিক থেকে শাসক কংগ্রেসের বিরোধিতা করে এবং দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি বাম দিক থেকে শাসক কংগ্রেসকে সমর্থন করে শাসক-গোষ্ঠীর এই প্রতারণার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিলে। সেই সংগে এও বোঝা গেল-যে শক্তিশালী মার্কসবাদী পার্টি না থাকলে শাসকশ্রেণীর নূতন নূতন প্রতারণার কৌশলের সামনে জনগণের অভাব বা স্বতঃস্ফূর্ত অসন্তোষ ভেসে যায়। এই বিরাট সংসদীয় সাফল্য স্বভাবতঃই শাসক-গোষ্ঠীর মধ্যে আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে তুলল।

কিন্তু পশ্চিমবংগ তাদের পায়ে কাঁটার মত যন্ত্রণা দিতে লাগল। এখানে প্রতারণার সংগে মিলিত হয়েছিল আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসমূলক আক্রমণ। তথাপি এখানে সংগ্রামী গণশক্তির কাছে শাসক-গোষ্ঠীকে সংসদীয় সংগ্রামেও হার মানতে হল। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের শুধু শক্তি-বৃদ্ধিই হল না। তারা একক বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হল। বিভেদকামী পার্টিগুলি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল ও তার সুযোগ নিয়ে শাসক কংগ্রেস কিছু শক্তি বৃদ্ধি করল, কিন্তু তথাপি তা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পিছনে পড়ে থাকল। স্বভাবতঃই, এই অবস্থা দিল্লীর শাসক-গোষ্ঠীকে আরো ক্ষিপ্ত করে তুললো। এর সংগে যুক্ত হল

ভবিষ্যত সম্বন্ধে আতংক। শাসকশ্রেণী জানে যে জনগণের উপর বোঝা তারা চাপাবেই। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাজেটে তা চাপানো হয়েছে। তাই কিছুটা সময় গেলেও অন্যান্য রাজ্যে তীব্র ও ব্যাপক গণ-আন্দোলন আবার দানা বেঁধে উঠবে। ইতিমধ্যে তার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। এমন অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে কঠিন সংগ্রামে পোড়-খাওয়া গণতান্ত্রিক সংগ্রাম যদি আরো এগিয়ে যায় তাহলে তা সারা ভারতের গণ-সংগ্রামকে শাসকশ্রেণীর পক্ষে বিপজ্জনকভাবে শক্তিশালী করে তুলতে পারে। তার আগেই পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে দাবিয়ে দিতে হবে।

এই সব কারণেই শাসক-গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গের জনগণের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণকে নির্বাচনের পর আর এক ধাপ বাড়িয়ে তুললো। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাথমিক নিয়ম ভংগ করে বৃহত্তম পার্টিকে মন্ত্রিসভা গঠনে বাধা দেওয়া হল, এক চরম প্রতিক্রিয়াশীল জোট তৈরী করা হল এবং জোটের সরকারকে শিখণ্ডীর মত সামনে রেখে পুলিস, সি. আর. পি-র আক্রমণ, মিলিটারির কুম্বিং, বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক, মার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক কর্মীদের হত্যা—সব কিছুকে বাড়িয়ে তোলা হল। বিভিন্ন ঘাতক দলগুলিকে শাসক কংগ্রেসের একক নেতৃত্বে জড়ো করার প্রক্রিয়া শুরু হল। শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে আরো কঠিন কর্তব্য উপস্থিত হল। একদিকে জনগণের সংগঠিত শক্তি এবং অন্য দিকে অত্যন্ত সংকুচিত সংসদীয় ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে গণতান্ত্রিক শক্তি এই আক্রমণের মোকাবিলা করে চললো।

জনগণের এই প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রতিক্রিয়াশীল জোটের মধ্যে সংকট সৃষ্টি করল এবং তার চাপে এই জোটের মন্ত্রিসভার পতন ঘটল। তাই, দিল্লীর শাসকগোষ্ঠী এতে আরো প্রমাদ গনল ও আরো মরিয়া হয়ে উঠল। সেই জন্যই সংসদীয় গণতন্ত্রের সাধারণ নীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে আগে বিধান সভা ভেংগে দেওয়া হোল, আবার প্রেসিডেন্টের শাসন কায়েম করা হল এবং সারা ভারতে আর কোথায়ও যা হয় নাই, এখানে তাই করা হল: নিজেদের অনুগত রাজ্যপালকে কার্যতঃ সরিয়ে দিয়ে শাসক কংগ্রেসের একজন নেতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে এখানের শাসন ব্যবস্থার মাথায় সোজাসুজি চাপিয়ে দেওয়া হল। এর অর্থ হল প্রত্যক্ষভাবে শাসনযন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে ও ঘাতক বাহিনীকে ব্যবহার করে একদিকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য এবং অন্য দিকে শাসক কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নগ্ন চেষ্টা চলবে।

তাই দেখা যাচ্ছে, যে সি. আর. পি ও মিলিটারির অভিযানকে বাড়িয়ে

তোলা হয়েছে। ঘাতক বাহিনীগুলিকে শাসক কংগ্রেসের নেতৃত্বে সংহত করার প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করা হয়েছে। খুনাখুনি বন্ধের নামে সমস্ত পার্টির মিটিং ডাকা এই পরিকল্পনার বাইরে কিছু নয়। এর আগে পর্যন্ত শাসক গোষ্ঠী চেষ্টা করেছে নিজেরা খুন করিয়ে মার্কসবাদীদের ঘাড়ে দোষ চাপাতে। কিন্তু, অভিজ্ঞতার কষ্টি পাথরে—এই মিথ্যা ধরা পড়ে গেছে। সেই জন্যই হত্যাকাণ্ড আরো সংহত করার সংগে সংগে খুনোখুনি বন্ধের নামে সাধু সেজে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু, এ কায়দায়ও আর চলছে না। দেখা যাবে যে একদিকে মিটিং চালান হচ্ছে, আর তারই আড়ালে সি. আর. পি, মিলিটারির হামলা বাড়ানো হচ্ছে এবং গণতান্ত্রিক কর্মীদের ধারাবাহিকভাবে হত্যা করা হচ্ছে। এ এক অসহনীয় পরিস্থিতি। নীরবে খুন হতে হবে, আর তার প্রতিবাদ করলেই সি. আর. পি., মিলিটারির মার খেতে হবে।

এমনিভাবেই পশ্চিমবংগের শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ এক বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। উপরে বর্ণিত ঘটনা প্রবাহ দেখলেই বোঝা যাবে যে, আজকের আক্রমণ অত্যন্ত সাংঘাতিক হলেও এটা শাসকশ্রেণীর শক্তির পরিচয় দেয় না। জনগণকে প্রতারিত ও দমন করতে ব্যর্থ হয়েই শাসক-গোষ্ঠী তার আক্রমণকে ধাপে ধাপে তীব্রতর ও বহুমুখী করেছে। ঘটনাবলী এও দেখিয়ে দিচ্ছে যে, আক্রমণ যতই কঠিন হোক না কেন, পশ্চিমবংগের গণতান্ত্রিক শক্তি তার মোকাবিলা করেই নিজেকে রক্ষা করেছে ও এগিয়ে চলেছে। সমগ্র রাষ্ট্র শক্তি যদি আক্রমণ চালায় তাহলে ক্ষয়ক্ষতি কিছু হবেই এবং তা হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু তা সত্বেও জনগণ দৃঢ়পণ করেছে। এর মধ্যেই রয়েছে ভবিষ্যতের আত্ম-বিশ্বাসের বাস্তব ভিত্তি।

একটা সহজ সত্য বুঝতে হবে, কঠিন হলেও তা বুঝতে হবে। পশ্চিমবংগে এখন আর বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের সাধারণ অবস্থা নাই। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার বলতে যা বোঝায় তা কোন দিনই পশ্চিমবংগে পুরোপুরি ছিল না। কঠোর দমন ব্যবস্থা সব সময় কম বেশি থেকেছে। এই সীমাবদ্ধতা সত্বেও মোটামুটি সংসদীয় গণতন্ত্রের সুযোগ ছিল। মিটিং করার, মিছিল করার, আন্দোলন করার, খুন না হবার, নির্বাচিত মন্ত্রীসভা থাকার অধিকার ছিল। আগে এই অবস্থার মধ্যে থেকে আন্দোলন গড়ে উঠেছে ও বেড়েছে। তখন এই অবস্থার উপযোগী সংগঠন ও মানসিকতা গড়ে উঠেছে। এখন সংসদীয় গণতন্ত্রের সেই বাস্তব অবস্থা নাই। আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবংগ চলেছে। এই আধা-ফ্যাসিস্ট অবস্থাও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। ধাপে ধাপে এরও তীব্রতা বাড়ছে।

তাই, বর্তমানে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সংগ্রামের সাংঘাতিক গুরুত্ব আছে। এই অবস্থার মোকাবিলা করার মত সংগঠন, চেতনা ও মানসিকতা প্রয়োজন। অতীত অবস্থার অভ্যাসের টান কাটাতে হবে।

আজকের পরিস্থিতির আরো এক জটিলতা হল ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অত্যন্ত অসম বিকাশ। আমাদের মত বহু জাতি ভিত্তিক বিরাট দেশে অসম বিকাশ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের দেশে নানা কারণে এটা বড় বেশি দেখা যাচ্ছে। একদিকে শাসকশ্রেণী সংসদীয় গণতন্ত্রকে ব্যবহার করেই সামগ্রিকভাবে ক্ষমতা রক্ষা করছে। যতদিন সম্ভব এ ব্যবস্থাকে বজায় রাখতে সে স্বভাবতঃই আগ্রহী থাকবে। অন্য দিকে পশ্চিমবংগে শাসক শ্রেণী মিলিটারী নামিয়ে দিয়েছে ও সংসদীয় গণতন্ত্রকে জলাঞ্জলি দিয়ে আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এই অসম অবস্থা পশ্চিমবংগের শ্রমিকশ্রেণীর সামনে কর্তব্যকে আরো কঠিন করে তুলেছে। আবার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় নাই।

এমনি অবস্থায় যদি পশ্চিমবংগে আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের মোকাবিলা করার সংগে সংগে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে জনগণকে সংগঠিত করা যায়, যদি সারা ভারতের জনগণকে পশ্চিমবংগের বিপজ্জনক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করা যায় এবং যদি সর্বত্র গণতন্ত্রের শক্তিকে পুষ্ট করা যায়, তাহলে এখানে শাসক-গোষ্ঠীর রক্তাক্ত হাতকে কিছুটা ঠেকিয়ে রাখা যাবে। তা সঠিকভাবে করছেন ও করবেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। পশ্চিমবংগে শ্রেণী সংগ্রাম ও শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম অত্যন্ত তীব্র। এখানের মার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক কর্মীরা অনেক সংগ্রাম, অনেক নির্যাতন, অনেক আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বৈপ্লবিক আদর্শকে সামনে রেখে এই অবস্থায় গণ-সংগ্রামকে উন্নীত করেছেন। সংগ্রামে যেমন অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, অনেক মূল্যবান নেতা ও কর্মীকে হারাতে হয়েছে, অনেক ব্যথা বেদনা অন্তরে সঞ্চিত হয়েছে, তেমনি অনেক ঐতিহ্যপূর্ণ অভিজ্ঞতাও সঞ্চিত হয়েছে, মনটাও শক্ত হয়েছে। কোথাও মাথা বন্ধক না দিয়ে, মার্কসবাদের মূল নীতিগুলিকে ধ্রুবতারার মত সামনে রেখে এবং নিজেদের বাস্তব অবস্থায় তাকে প্রয়োগ করেই এই অবস্থা সৃষ্টি করা গেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আমাদের পশ্চিমবাংলার অগণিত মার্কসবাদী, গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক কর্মী আগামী দিনের কঠিনতর দায়িত্ব যোগ্যতার সংগে পালন করতে পারবেন।

—'নন্দন' শারদীয় (ভাদ্র-আশ্বিন) ১৩৭৮ (১৯৭১)

১৯ গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম অথবা "সশস্ত্র বিপ্লব" ?

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ যখন পুলিসী রাজ কায়েমের চক্রান্তের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার কঠিন সংগ্রামে আরো ঐক্যবদ্ধভাবে ও সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে, যখন এই সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের দাবী জনগণের সংগ্রামী দাবীতে পরিণত হয়েছে, ঠিক তখনই কলকাতা ও মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে দেওয়ালে এক ধাঁচের পোস্টার দেখা যাচ্ছে, তাতে লেখা থাকছে "মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন নয়, আইন অমান্য নয়, চাই সশস্ত্র সংগ্রাম"। যে সংসদীয় গণতন্ত্র হোল বুর্জোয়াশ্রেণী শাসনেরই একটি রূপ, সেই গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধ অধিকারও আজ বৃহৎ বুর্জোয়া-জমিদার শাসক শ্রেণীর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। কারণ, ঘনীভূত সংকটের পটভূমিকায় এই সীমাবদ্ধ অধিকারকেই কাজে লাগিয়ে শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণ শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করে তুলছিল। তাই, সংসদীয় গণতন্ত্রকে হত্যা করে পুলিসী রাজ কায়েমের চেষ্টা হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম বিশেষ তাৎপর্য গ্রহণ করেছে। এই সংগ্রামই ব্যাপকতম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করতে ও তাদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এ সংগ্রাম না করার অর্থ হোল প্রতিক্রিয়ার আক্রমণকে পথ ছেড়ে দেওয়া। এমতাবস্থায় উপরোক্ত পোস্টারগুলির ক্ষতিকারক তাৎপর্য বোঝা প্রয়োজন। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে, যে এর লক্ষ্য হোল গণতন্ত্রের সংগ্রাম ও মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের দাবী হতে জনগণ এবং তাদের দৃষ্টিকে অন্য দিকে সরিয়ে রাখা। পোস্টারদাতাদের বিষয়ীভূত উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তাদের বক্তব্যের বাস্তব ফলাফলের সঙ্গে কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকারীদের উদ্দেশ্য হুবহু মিলে যাচ্ছে। এটা আশ্চর্যজনক ও বেদনাদায়ক হলেও বাস্তবে সত্য।

কংগ্রেস নেতৃত্ব, বিশ্বাসঘাতক ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের দল ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী—যারা পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ পুঁজি ও জোতদারদের স্বার্থে ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলন দমনের জন্য পুলিসী সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, তারা—বোধগম্য কারণেই এই গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম ও মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের বিরোধী। কারণ, তারা জানে এবং

সঠিকভাবেই জানে যে, এর ফলে শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী জনগণের সংগ্রামী শক্তি বেড়ে যাবে। এতে বিপ্লব হবে না ঠিক—এই আন্দোলনের আশু লক্ষ্যও তা নয়, কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে থাকলেও এই আন্দোলন সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় বিপ্লবী শক্তিগুলির বিকাশে সাহায্য করবে। পুলিসী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন শাসকশ্রেণী ও অন্য দিকে চক্রান্তকারীদের মুখোশ আরো খুলে যাবে। অন্য দিকে তেমনী মেহনতী মানুষের সাহস ও সংগ্রাম ক্ষমতা স্বভাবতই বাড়বে। এর ফলে সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। ক্রমবর্ধমান শোষণ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণী সংগ্রামও তীব্রতর হবে।

শাসকশ্রেণী যদি গণশক্তিকে আত্মসমর্পণ করাতে বা গুঁড়িয়ে দিতে না পারে এবং যদি মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের দাবী মানাতে তাকে বাধ্য করা যায়, তাহলে সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর ঘটবে না। কিন্তু শাসকশ্রেণী একথাও বোঝে যে তার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির—যার মধ্যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান—তাদের ক্ষমতা বাড়বে এবং তার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর ও জনসাধারণের সংগঠন এবং সংগ্রাম করার গণতান্ত্রিক অধিকার বেশী মিলবে। যদি শাসকশ্রেণী তখনও পুলিস ও মিলিটারীর দ্বারা এই অধিকারকে হত্যার জন্য আরো এগিয়ে যায়, তখন তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও জনগণের আরো বেশী হবে। এক কথায় শ্রেণী সংগ্রাম আরো উচ্চ পর্যায়ে উঠবে।

এই সব কারণেই শাসকশ্রেণী এবং তাদের পদলেহীরা গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম ও মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের দাবীর বিরোধী। কিন্তু, এই সব কথা তারা খোলাখুলি স্বীকার করতে পারে না। তারা তাদের বিরোধিতার অজুহাত হিসাবে শান্তি-শৃংখলার কথা তোলে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিংগাপ্পা আরো এগিয়ে গিয়ে বলেছেন—যে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য গণতন্ত্র রক্ষা নয়, এ হোল সশস্ত্র বিপ্লবের আবরণ। তিনি জানেন যে গণতন্ত্র হত্যার চক্রান্তকে আড়াল করার জন্য এবং গণ-সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড দমন-নীতির সাফাই দেবার জন্য তিনি আগে হতে এই অসত্য কথা বলে রাখছেন।

বৃহৎ বুর্জোয়া-জমিদার শাসনের প্রতিনিধি কংগ্রেস ও তার পদলেহীদের বিরোধীতার অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু আশ্চার্য লাগে যে পোস্টারদাতারাও একই রকমের বিরোধিতা করছেন। তফাৎ হোল এই যে, এঁরা বিপ্লবী বুলির আড়ালে তা করছেন। এঁদের অজুহাত হোল, এই

গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম ও মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের দাবী বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে ক্ষতিকর। এতে নাকি শাসকশ্রেণীর সুবিধা হবে। এখন চাই সশস্ত্র সংগ্রাম। উভয় পক্ষই "সশস্ত্র বিপ্লব" কথাটি ভিন্নভাবে ব্যবহার করে আন্দোলনের বিরোধীতা করছেন। এক পক্ষ বলছেন, যেমন নিজলিংগাপ্পা বলছেন এই গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম হোল সশস্ত্র বিপ্লবের আবরণ; আর অন্যপক্ষ বলছেন, যে এই সংগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লবের পথে বাধা। কী চমৎকার মিল। পোস্টারদাতারা হয়ত চটে গিয়ে বলবেন—যে তাঁদের কুৎসা করা হচ্ছে, কারণ তাঁরা সত্যই সশস্ত্র বিপ্লব চান এবং এখনই, এই মুহূর্তে চান। কিন্তু এটা তো না জানার কথা নয় যে বিপ্লব কয়েকজন নেতা বা কর্মী করেন না, বিপ্লব করে জনসাধারণ। শাসকশ্রেণী যখন জনগণের অগ্রগতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্র যন্ত্রকে ব্যবহার করে সে পথে যেতে জনগণকে বাধ্য করে এবং জনগণ ধাপে ধাপে নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝে তা করেন। বিপ্লব মানে কী এবং জনগণের কী প্রস্তুতি দরকার তাও নভেম্বর বিপ্লব, চীন বিপ্লব, ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ ও ইন্দোনেশিয়ার প্রতিবিপ্লব দেখে না বোঝার কথা নয়। জনজীবনের সংগে যাদের সামান্যতম যোগাযোগ আছে এমন কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন প্রত্যেক কর্মীকেই স্বীকার করতে হবে—যে ব্যক্তি বিশেষের মাথায় যাই থাকুক না কেন, পশ্চিমবংগের বাস্তব পরিস্থিতি বর্তমানে সে রকম নয়।

এমতাবস্থায় উপরোক্ত পোস্টারের বাস্তব অর্থ হোল গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম হতে জনগণকে সরিয়ে নিয়ে নিষ্ক্রিয় রাখা এবং বড়জোর কিছু প্ররোচনা সৃষ্টি করা। কমরেড লেনিন কতই না সঠিক কথা বলেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে, সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদীরা পার্লামেন্টের মাধ্যমেই সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের কথা বলে যেমন শাসকশ্রেণীকে সাহায্য করে, তেমনি অতিবিপ্লবীরা বিপ্লবী বুকনীর আড়ালে অন্য দিক দিয়ে বিপ্লবী সংগ্রামের ক্ষতি করে শাসকশ্রেণীকে সাহায্য করে। পোস্টারদাতারা সকলে একথা না জানলেও যারা তাদের দিয়ে পোস্টার লেখাচ্ছেন তাঁরা জানেন।

যাঁরা এই সব পোস্টার দিচ্ছেন তাঁরা বেশীর ভাগ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি হতে বহিস্কৃত ও পার্টি বিরোধী একটা ক্ষুদ্র বুকনিবাজ চক্র। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা থাকাকালীন সময়ে এরা একইভাবে যুক্তফ্রন্টের বিরোধিতা করেছেন ও তার উৎখাত কামনা করেছেন। এ ক্ষেত্রেও কংগ্রেসের লক্ষ্যের সংগে তাঁদের লক্ষ্য মিলে গিয়েছিল, তবে এখনকার মতই তাঁদের অজুহাত ছিল ভিন্ন। কংগ্রেস ও কায়েমী স্বার্থের যুক্তি ছিল—যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ও বিশেষ করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক, কর্মচারী ও কৃষকদের মধ্যে পুঁজিপতি এবং জোতদারদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি

করছে, শান্তি শৃংখলা বিপন্ন করছে এবং পুলিসকে নিস্ক্রিয় করে রাখছে, তাই একে উৎখাত করা দরকার। তা না হলে বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ দেখা দেবে। কংগ্রেসের পদলেহী ডা: ঘোষের বিশ্বাসঘাতক চক্রও তাঁদের বিশ্বাস-ঘাতকতার সাফাই হিসাবে এই যুক্তি দিয়েছেন।

অপর দিকে অতি-বিপ্লবীদের যুক্তি ছিল—যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ও বিশেষ করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের সর্বনাশ করছে এবং বৃহৎ পুঁজিপতি ও জোতদারদের স্বার্থ রক্ষা করে তাদের দালালি করছে, তাই একে উৎখাত করা দরকার।

উভয়ের যুক্তি পৃথক হলেও আক্রমণের লক্ষ্য ও দাবী ছিল এক—মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রমণ কর ও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে উচ্ছেদ করা। এটা আশ্চর্য মিল নয় কী? কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়াশীলদের যুক্তি ছিল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিই নকশালবাড়ি সৃষ্টি করেছে, আর অতি-বিপ্লবীরা যুক্তি দিয়েছে যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিই পুলিস পাঠাবার অংশীদার হয়ে বিপ্লবকে আঘাত করেছে। যদি এক মুহূর্তের জন্য মেনেও নেওয়া যায় যে কমিউনিস্ট পার্টি ভুল করেছে, তাহলেও ভাবা দরকার যে এ কী ধাঁচের উদ্ভট বিপ্লবের ধারণা, যেখানে পুলিস-মিলিটারীর সম্মুখীন হতে হবে না এবং সামান্য পুলিস এলেই যে-বিপ্লব হাওয়ায় মিলিয়ে যায়? একেই বলে বিপ্লবের ছেলে খেলা। আসলে তা কৃষকদের একটি সুস্থ জমির সংগ্রামকে "ক্ষমতা দখলের সশস্ত্র সংগ্রাম" বলে জাহির করে এবং এই জমির আন্দোলনকে বড় জোতদারদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত করার বদলে ছোট-বড় সকলের বিরুদ্ধেই চালিত করে। এই অতি-বিপ্লবী বাক্যবাগীশেরা কৃষক সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, একে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কায়েমী স্বার্থকে খোরাক জুগিয়ে দিয়েছে। নকশালবাড়ির আন্দোলন জংগী গণ-সংগ্রামের প্রতীক নয়, এ হোল চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন হঠকারিতা ও সংকীর্ণতার এক জগাখিচুড়ি। সেই জন্যই প্রত্যেকটি বিষয়ে এদের বক্তব্য ও কাজ গণ-সংগ্রামকে এগিয়ে যেতে সাহায্য না করে বরং প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যকেই সাহায্য করছে।

এর কারণ বোঝার জন্য এঁদের বক্তব্যগুলি আলোচনা করা দরকার। এদের বক্তব্য সাধারণভাবে হোল—যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন ও তাতে মার্কস-বাদী কমিউনিস্ট পার্টির অংশ গ্রহণের ফলে জনগণের মধ্যে পার্লামেন্টারী মোহ ছড়ানো হয়েছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নাকি পার্লামেন্টের মাধ্যমে সমাজের মৌলিক রূপান্তরের কথা প্রচার করে চরম সুবিধাবাদীতে পরিণত হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ও কংগ্রেস মন্ত্রীসভার মধ্যে কোন

পার্থক্য নাই, বরং যুক্তফ্রন্ট জনগণকে ভাঁওতা দিয়ে গণ-সংগ্রামের বিকাশে ক্ষতি করেছে। জনসাধারণ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে, শুধু ডাক দেওয়া প্রয়োজন।

শেষোক্ত বিষয়টি আমরা পরের দিকে মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন প্রসঙ্গে আলোচনা করব। অন্য বক্তব্যগুলি এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন। এদের প্রত্যেকটি বক্তব্য ভুল। পার্লামেন্টের মাধ্যমে মৌলিক রূপান্তরের কথা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বলেছে, একথা বলার চেয়ে জঘন্য মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। ভুল পথের সাফাই-এর জন্য কুৎসাই প্রয়োজন হয়। আমাদের পার্টি প্রথম হতে বলে এসেছে, আমাদের প্রত্যেকটি পার্টি নেতা, এমনকি মন্ত্রীরা পর্যন্ত প্রতিনিয়ত জনগণের কাছে একথা প্রচার করেছেন—যে এ পথে মৌলিক রূপান্তর তো হবেই না, এমনকি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ঘনীভূত সংকটকেও ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় গেলে জনগণের আন্দোলনকে সাহায্য করতে পারবে, তাদের আন্দোলনের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রসারিত করবে। শ্রমিক, কৃষক, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদের শ্রেণী সংগ্রামকে বাড়িয়ে নিয়ে যাবে ও তার মধ্য দিয়ে কিছু আংশিক দাবিও আদায় করতে পারবে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার কথাই পার্টি বলেছে। এই নীতিকে প্রয়োগ করতে গিয়ে পার্টির কোন ভুল হয়নি বা কোন দুর্বলতা ছিল না একথা আমরা দাবী করি না। কিছু ভুল আমরা সংশোধন করেছি, তা সত্ত্বেও ভুল ও দুর্বলতা থেকেছে। কিন্তু মোটামুটি এই নীতি অনুযায়ী কাজ হয়েছে বলেই শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাপকতা ও গভীরতা বেড়েছে এবং সেই জন্যই বৃহৎ পুঁজি ও জোতদারেরা এত ক্ষিপ্ত হয়েছে, বিশেষ করে আমাদের পার্টির উপর।

হঠকারীরা প্রশ্ন করে, পুলিসকে কী গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ বন্ধ করা গেছে? আমলাতন্ত্রকে কী জনগণের স্বার্থে ঠিকমত ব্যবহার করা গেছে? না, যায় নাই। তা গেলে তো মার্কসবাদই মিথ্যা হয়ে যেত। কোন মার্কসবাদী এমন ধারণাই পোষণ করতে পারে না। সেই জন্যই তো পার্টি নিয়মিত এই সবের শ্রেণী চরিত্র ব্যাখ্যা করেছে, এবং অনেক সময় যুক্তফ্রন্ট ও মন্ত্রীসভা হতে পৃথক হয়েও তা করেছে। এটা না করলেই ভুল হোত এবং তা হোত সংশোধনবাদ।

কিন্তু প্রশ্ন হোল : যে কংগ্রেস আমলের মত বৃহৎ পুঁজি ও জোতদারেরা কী শাসনযন্ত্রকে তাদের হুকুমমত গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পেরেছে? না, পারে নাই। মুষ্টিমেয় হটকারী না বুঝলেও গণ-সংগ্রামে লিপ্ত শ্রমিক, কৃষক জানে যে তারা আগের থেকে অনেক বেশী গণতান্ত্রিক

অধিকার পেয়েছিল এবং তাকে ব্যবহার করে নিজেদের সংগঠন ও আন্দোলনকে বাড়তে এবং কিছু দাবী আদায় করতে পেরেছিল। শুধু তাই নয়, এই সময়ে জনগণ পুলিস, আমলাতন্ত্র ও এমনকি বিচার বিভাগের পর্যন্ত শ্রেণী চরিত্র নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা কিছু বুঝতে শিখেছে।

যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যোগ দেওয়ায় পার্লামেন্টারী মোহ বেড়েছে—না, তা কাটাতে সাহায্য করেছে তাও বোঝা দরকার। মার্কসবাদী তত্ত্ব বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হতে বিচ্ছিন্ন কোন গোঁড়ামির মন্ত্র নয়। জনগণ নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা যতদিন কোন তত্ত্বের নির্ভুলতা না বোঝে, ততদিন তা সমাজ পরিবর্তনকারী বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয় না। বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে বুর্জোয়াশ্রেণী শাসনেরই একটি রূপ একথা প্রত্যেক মার্কসবাদীই জানেন। কিন্তু, এই কথা বলে মার্কসবাদীরা যদি যুক্তফ্রণ্ট করতে অস্বীকার করত তাহলে জনগণের চেতনাকে ডিঙিয়ে যাওয়া হত, তাতে পার্লামেন্টারী মোহ এতটুকু কাটত না, বরং আরো বেশী জেঁকে বসত। কারণ, তাহলে কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা গঠিত হত এবং তার জন্য জনগণ কমিউনিস্ট পার্টিকেই দায়ী করত। সংশোধনবাদী ও অন্যরা মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের আরো সুযোগ পেত। জনসাধারণের এই ধারণা থেকে যেত, যে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা হলে হয়ত তাদের মূল সমস্যা পার্লামেন্টারী পথেই ধীরে ধীরে সমাধান হতে পারত অর্থাৎ পার্লামেন্টারী মোহ দৃঢ় থাকত।

অন্য দিকে যদি পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার শ্রেণী চরিত্র নিয়ত ব্যাখ্যা না করে শুধু যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভাকে জনগণের সহায়ক শক্তি বলে প্রচার করা হয়—যা প্রধানত: সংশোধনবাদী ও বুর্জোয়া উদারনীতিবিদেরা করে—তাহলে পার্লামেণ্টারী মোহ কাটাতে সাহায্য করা হয় না। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী নিয়েই এই প্রশ্নটিকে বিচার করেছে। তাই, যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভার অস্তিত্ব জনগণের মধ্যে পার্লামেণ্টারী মোহ বাড়ায় নাই, বরং এই সময়ে জনগণ এক চমৎকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা তারা কিছুটা বুঝতে পেরেছে। মার্কসবাদীদের প্রচার ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা পরে আরো বেশী বুঝবে। কিছু নেতা বুঝলেই শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণ এই নেতাদের শ্রীমুখের বাণী শুনেই আপনা হতে সব বুঝে যাবে, এর চেয়ে অর্বাচীন অ-মার্কসীয় ধারণা আর কিছু হতে পারে না এবং অতি-বিপ্লবীরা এই রোগেই ভুগছে।

এরা দাবী করেছিল, যে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা থাকার ফলে নাকি গণ-

আন্দোলন ও শ্রেণী সংগ্রাম ব্যাহত হবে। কিন্তু বাস্তব জীবন দেখাচ্ছে যে, শ্রেণী সংগ্রাম ও জনগণের সংগ্রাম করার ক্ষমতা বেড়েছে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিলের পর নিষ্ঠুর দমননীতি সত্ত্বেও জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। পুডিং-এর মিষ্টতা খেয়েই বোঝা যাচ্ছে। তবে কেউ যদি মিষ্টতাকেই তিক্ত বলে তাহলে তার স্থান স্বাভাবিক জীবনে থাকতে পারে না।

যুক্তফ্রণ্টের আমলে শ্রেণী সংগ্রাম যদি না বেড়েই থাকে তাহলে বৃহৎ পুঁজি ও জোতদারেরা এত ক্ষিপ্ত হল কেন, রাতের অন্ধকারে এমনভাবে এই মন্ত্রীসভাকে বাতিল করা হোল কেন এবং কেনই বা জনগণ এই আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়ছে? অতি-বিপ্লবীদের দেউলিয়াপনা ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু তারা দমবার পাত্র নয়। তাই তারা এর এক অদ্ভুত কৈফিয়েৎ বের করেছে, যে এ সব হোল ধনিকশ্রেণীর সাজানো কৃত্রিম ব্যাপার: পাগলামিরও সীমা নাই দেখছি।

এদের বক্তব্যের ফলাফল দেখেও কিন্তু এঁরা শিখছেন না। তাই এখন এঁরা গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম হতে জনগণকে সরিয়ে নেবার (অবশ্য বিপ্লবের নামে) ব্যর্থ চেষ্টায় নেমেছেন। আমি প্রথমেই দেখিয়েছি গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম ও মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন দাবীর বিরুদ্ধে এদের শ্লোগান কীভাবে বাস্তবে কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়াশীলদের উদ্দেশ্যকেই পুষ্ট করছে (আমি এদের বিষয়ীভূত উদ্দেশ্যের কথা বলছি না)। নীতির যথার্থতা বাস্তবের কষ্টি পাথরেই বিচার করা যায় এবং সেই বাস্তবের বিচারে এদের বক্তব্য খুবই ক্ষতিকর এবং গণ-সংগ্রামের বিকাশের পরিপন্থী। এখন এঁদের বক্তব্যকে একটু তত্বগত দিক দিয়ে বিচার করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। কারণ এঁরা তত্ত্বের বড় বড় কথা বলে কিছু লোককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন।

এঁদের শ্লোগান হোল "আইন অমান্য নয়, মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন নয়, চাই সশস্ত্র বিপ্লব"। এই বক্তব্যের তত্ত্বগত ভিত্তি দু-রকম হতে পারে: (১) সংসদীয় গণতন্ত্র, পুলিসী রাজ ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; অন্তত শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তার কোন মূল্য নাই। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণীর কোন স্বার্থ নাই। সব অবস্থায় সব সময়ের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর কাছে একমাত্র বিকল্প হোল: হয় বিপ্লব, নয় যে কোন রকমের বুর্জোয়া-শাসন। এই বুর্জোয়া শাসনের রকমফের নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর মাথা ব্যাথার কোন প্রয়োজন নাই। (২) ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতি বিপ্লবের জন্য পরিপক্ক। তার জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের চেতনা ও সংগঠনের দিক দিয়ে প্রস্তুত হয়েই আছে। এই অবস্থায় গণতন্ত্রের জন্য

সংগ্রামও তাদের পিছনে টেনে রাখে। সমগ্র বিষয়টি এইভাবে উত্থাপন করলে যে কোন ব্যক্তি—যাঁর মার্কসবাদের অ আ ক খ জ্ঞান আছে এবং যাঁর সামান্য কাণ্ডজ্ঞান আছে তিনিই বুঝবেন, যে এই দুইটি ধারনাই সম্পূর্ণ ভুল এবং নিছক পাগলামি মাত্র।

মার্কসবাদের মতে সংসদীয় গণতন্ত্র—তা সে দেখতে যতই গণতান্ত্রিক হোক না কেন—তা শেষ বিচারে হোল বুর্জোয়া শ্রেণী শাসন, বুর্জোয়া-শ্রেণীর একনায়কত্ব। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার, প্রচার ও সংগঠনের সমান অধিকার—যা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অংগ, এগুলি আসলে হোল আনুষ্ঠানিক সমানাধিকার। কারণ, ধনিকশ্রেণী ও জমিদারদের মালিকানার প্রভুত্ব অসংখ্য বাস্তব (রিয়েল) বিধি নিষেধের জালে সমানাধিকারকে সীমাবদ্ধ করে রাখে। জীবন ধারণের জন্য এই শোষকদের উপর নির্ভরশীল শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণ এই সমানাধিকার প্রয়োগ করতে পারে না।

তাছাড়া রাষ্ট্রের আসল শক্তি হিসাবে আমলাতন্ত্র, পুলিস ও সৈন্যবাহিনী ধনিকশ্রেণীর স্বার্থেরই প্রতিভূ। যখনই জনসাধারণ শোষণের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে এগিয়ে যায়, তখনই ধনিকশ্রেণীর পক্ষে পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর আসল ক্ষমতা হিসাবে সামনে আসে। বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের এই শ্রেণী চরিত্র সম্বন্ধে মার্কসবাদী মনীষীরা স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে গেছেন এবং এ সম্বন্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে শিক্ষিত করার মৌলিক কর্তব্য মার্কসবাদীদের সামনে রেখে গেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস এই মার্কসবাদী বিশ্লেষণের নির্ভুলতা বারে বারে প্রমাণ করেছে। তাই, বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্বন্ধে কোন মোহ বা শ্রেণীর উর্ধ্বে ধারণা সৃষ্টি করাকে মার্কসবাদী নেতারা চরম অপরাধ ও ধনিকশ্রেণীর সেবা বলে আক্রমণ করেছেন। যাঁরা আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি দেখে শ্রেণী সংগ্রামের চরমতম বিকাশের বদলে পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার মাধ্যমে ধাপে ধাপে সমাজের মৌলিক রূপান্তরের কথা প্রচার করেছেন, সেই সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁরা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করেছেন। আধুনিক সংশোধনবাদীরা নূতন অবস্থায় "সৃজনশীল মার্কসবাদের" নাম করে মার্কসবাদের এই মৌলিক ধারণাকেই আঘাত করেছে। তাই, এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এক স্থায়ী ও অপরিহার্য কর্তব্য।

কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের এই শ্রেণী রূপ ব্যাখ্যা করার সংগে সংগে মার্কসবাদী মনীষীরা বুর্জোয়াশ্রেণী শাসনের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে নির্লিপ্ততার মনোভাবের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে সচেতন করে গেছেন। ফ্যাসিবাদ, পুলিস-রাজ ও স্বৈরতন্ত্র—এগুলিও বর্তমানে বুর্জোয়া শাসনের ভিন্ন রূপ। বুর্জোয়া গণতন্ত্রও এই শ্রেণী শাসনের অন্য রূপ। কিন্তু, এই উভয়কেই তারা

গুলিয়ে ফেলেন নি। এই উভয়ের শ্রেণীগত মিল সত্বেও এদের পার্থক্য শ্রমিকশ্রেণীর কৌশলের দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসবাদের মতে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার শ্রমিকশ্রেণীর পরিপক্কতার লক্ষণ, ভোটের অধিকার, সভা সংগঠন প্রচার ধর্মঘট প্রভৃতি সম্বন্ধে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে সচেতন করতে, সংগঠিত করতে, আংশিক দাবীর সংগ্রাম পরিচালিত করতে ও সাময়িকভাবে শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করতে প্রভৃত পরিমাণে সাহায্য করে। তাই, শ্রমিকশ্রেণী এই অধিকার সম্বন্ধে নির্লিপ্ত তো নয়ই, বরং অত্যন্ত আগ্রহান্বিত।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষায়তন। এই সীমাবদ্ধ অধিকারও শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়ার কাছ হতে দান হিসাবে পায় নাই। এর জন্য জনগণকে সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং অনেক বুকের রক্ত দিয়েই সংগ্রাম করতে হয়েছে। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী যখন এতদূর সচেতন ও সংগঠিত হতে পারে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধ পরিধিকে ভেঙে শ্রমিক নেতৃত্বে নূতন রাষ্ট্র স্থাপনের দ্বারা ব্যাপকতম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তখনই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় এবং তখন তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু তার আগে পর্যন্ত বুর্জোয়া গণতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজন। সন্দেহবাদীদের উত্তর দিয়ে কমরেড লেনিন স্পষ্ট বলেছিলেন যে, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রামকে ব্যাহত করেই না, বরং তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। তাই, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করাও শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে। অন্য দিকে দেখা যায়, যে শ্রমিকশ্রেণী যখন এই গণতান্ত্রিক অধিকারকে কাজে লাগিয়ে শ্রেণী সংগ্রামকে বাড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন বুর্জোয়া গণতন্ত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছেই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় এবং তখন ধনিকশ্রেণীই এই গণতন্ত্রকে হত্যা করে পুলিসী রাজ ও ফ্যাসিবাদের অর্থাৎ প্রত্যক্ষ গুণ্ডা শাসন কায়েম করে। এই অবস্থায় পুলিসী রাজ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য সংগ্রাম করা এবং সেই সংগ্রামে যাদের ঐক্যবদ্ধ করা যায়, তাদের সকলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া একান্ত কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। বিপ্লবী বুকনির আড়ালে এটা করতে অস্বীকার করার বাস্তব অর্থই হোল ধনিকশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকে সাহায্য করা।

হিটলারের অভ্যুদয়ের সময় জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি এই ভুলই করেছিল। তারপর কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম অধিবেশন হয়ে গেছে। তারপর পৃথিবীর দেশে দেশে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। এর পরও যারা গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামকে অস্বীকার করে তারা শুধু ভুলই করে না,

করে নিকৃষ্ট অপরাধ। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বদলে পুলিসী রাজ হলে জনগণ তাড়াতাড়ি বিপ্লবে এগিয়ে যায় এমন অর্বাচীন ধারণা যদি কারো মাথায় থাকে তাহলে তাদের পাকিস্তানের দিকে তাকাতে বলব।

অল্প কথায় বলতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চরিত্র না বোঝা, এ সম্বন্ধে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে সচেতন না করা এবং এর দ্বারাই সমাজের মৌলিক রূপান্তর সম্ভব বলে মোহ সৃষ্টি করা যেমন নগ্ন সংশোধনবাদী বিচ্যুতি, তেমনি স্বৈরতন্ত্র ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার না করা, এবং শ্রেণী সংগ্রামের চরমতম স্তরে বিকাশের পূর্ব পর্যন্ত এই সীমাবদ্ধ গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্যও সংগ্রাম করতে অস্বীকার করা বা তার বিরোধিতা করা হোল নিকৃষ্ট অতি-বিপ্লবী ছেলেমী বিচ্যুতি। এই উভয় বিচ্যুতির বিরুদ্ধেই দৃঢ় সংগ্রাম করে ভারতে মার্কসবাদীদের অগ্রসর হতে হচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে স্বৈরতন্ত্রের বা গণতন্ত্রের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য হবে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সংগে গণতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়ানো—শুধু দাঁড়ানো নয়, এ এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া। কিন্তু, যখন দেশের বাস্তব পরিস্থিতি ও শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রস্তুতি এমন পর্যায়ে যায় যে, সীমাবদ্ধ বুর্জোয়া গণতন্ত্র অথবা বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক নেতৃত্বে জনগণের ব্যাপকতম গণতন্ত্র বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়, তখন শ্রমিকশ্রেণী নিঃসন্দেহে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পরিধি ভেঙে শেষোক্ত সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়ায়। এর থেকেই আমরা পূর্বের উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রশ্নে এসে যাচ্ছি—ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি কী?

প্রথমেই বিপ্লবী হিংসা ও সশস্ত্র সংগ্রাম সম্বন্ধে মার্কসবাদী তত্ব ভালভাবে জানা দরকার। অতি-বিপ্লবীদের পোস্টার ও লেখাগুলি দেখলে মনে হয় যেন সশস্ত্র সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর খুব অভিপ্রেত এবং কিছু নেতা বাড়ীর ছাদ হতে ডাক দিলেই যেন জনসাধারণ তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এমনি ধারণা থাকলে তা সম্পূর্ণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের স্রষ্টাদের মতে হিংসা, শ্রমিক-শ্রেণীর জীবনাদর্শনে বিরোধী; শ্রমিকশ্রেণী শান্তিপূর্ণভাবেই সমাজের রূপান্তর ঘটাতে চায়। ইতিহাসের গতিপথে যখনই তার সামান্যতম সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, তখনই শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ নেতারা তাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সমস্যা হোল শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা নয়। প্রশ্ন হোল ধনিক ও জমিদারশ্রেণী শান্তিপূর্ণভাবে পরিবর্তন হতে দেয় কিনা। মার্কসবাদ এই বাস্তব সত্যকে তুলে ধরে যে. প্রত্যেকটি শোষক রাষ্ট্র শক্তিশালী পুলিস-মিলিটারী পীড়ন অস্ত্রে সজ্জিত এবং এই

পীড়ন ব্যবস্থাকে তারা দিন দিন শক্তিশালী করে যাচ্ছে। বাস্তব ইতিহাস দেখিয়ে দিচ্ছে যে, শাসকশ্রেণী স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করে না, তারা এই অত্যাচারের সমগ্র যন্ত্র নিয়ে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এমতাবস্থায় জনগণের সামনে দুটি পথই খোলা থাকে—হয় আত্মসমর্পণ অথবা সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম। শ্রমিকশ্রেণী হিংসা বা সশস্ত্র সংগ্রাম কামনা করে না, শাসকশ্রেণী এটা তার উপর চাপিয়ে দেয়। তাই যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হয়। ইতিহাসের এই নির্মম শিক্ষা মনে না রাখলে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ সে শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে তারা তাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করতে পারে না, শাসকশ্রেণীর হিংসা জনগণকে গ্রাস করে। রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব, ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ ও ইন্দোনেশিয়ায় সাময়িক বিপর্যয় এই শিক্ষাকে আরো নগ্নভাবে তুলে ধরেছে। তাই, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) তার পার্টি প্রোগ্রামে সঠিকভাবেই শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের জন্যে শ্রমিকশ্রেণীর মহান আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করার সংগে ইতিহাসের উক্ত শিক্ষার প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে।

মার্কসবাদ আরো শিক্ষা দেয়, যে বিজ্ঞাপন দিয়ে বা বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে বিপ্লবী সংগ্রামে নামানো যায় না। যারা শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে প্রাণহীন হুকুম তামিল করার পুতুল মনে করে তারাই এইভাবে ডাক দিয়ে বিপ্লব করার কথা ভাবে। শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মার্কসবাদী শিক্ষার তাৎপর্য বুঝতে শেখে এবং শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী অবস্থানে এসে পৌঁছায়। বিপ্লবী সংগ্রাম দাবী করে সর্ব্বোচ্চ দৃঢ়তা, ত্যাগ, আত্মবিশ্বাস ও সাহস। ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এই সব গুণগুলি কত উচ্চ পর্যায়ের হওয়া প্রয়োজন। অনেক আঁক বাঁক ও অনেক সংগ্রামের কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই জনগণ এই চেতনা ও গুণ আয়ত্ত করতে পারে। মার্কসবাদীদের কাজ হোল ধাপে ধাপে শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের উপযুক্ত করা ও জনগণকে উপযুক্ত হতে সাহায্য করা। কথায় কথায় বিপ্লবের বুকনি দিয়ে সস্তায় এ কাজ করা যায় না। জনগণের চেতনার স্তর বুঝে তাকে অগ্রসর হতে সাহায্য করতে হয়।

কোন্ পরিস্থিতিতে বিপ্লবী পরিবর্তন সম্ভব হয় সে সম্বন্ধেও মার্কসবাদী তত্ত্ব পরিস্কার। নেতা ও কর্মীরা বুঝলেই বিপ্লব হয় না, দুঃখ দুর্দশা বাড়লেই বিপ্লব হয় না। কমরেড লেনিনের মতে বিপ্লবী পরিস্থিতি তখনই সৃষ্টি হয়, যখন শাসকশ্রেণী বোঝে যে পুরনো উপায়ে আর শাসন করা যাচ্ছে না এবং যখন শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণও বোঝে যে আর

পুরানো ব্যবস্থাকে তারা আর সহ্য করতে পারছে না। অর্থাৎ শুধু অর্থনৈতিক সংকটই নয়, রাজনৈতিক সংকট চরমে ওঠে। বাস্তব অবস্থা থাকলেও বিপ্লব হয় না, যদি না শ্রমিকশ্রেণী জনসাধারণের চেতনা, সংগঠন ও সংগ্রামে দৃঢ়তার দিক দিয়ে প্রস্তুত থাকে অর্থাৎ যদি বিষয়াভূত (অবজেকটিভ) পরিস্থিতির সংগে বিষয়ীভূত (সাবজেকটিভ) পরিস্থিতি তৈরী না হয়। নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্বন্ধে কমরেড স্তালিন বলেছেন, যে জনগণের চেতনার পিছনে থাকা যেমন ক্ষতিকর, তেমনি জনগণের চেতনা হতে অনেক এগিয়ে গিয়ে ক্ষুদ্র অগ্রণী বাহিনীকে মার খাইয়ে দেওয়াও তেমনি ক্ষতিকর।

এই সব মার্কসবাদী তত্ত্বের আলোকে বিবেচনা করা দরকার যে ভারতের ও পশ্চিমবংগের বর্তমান পরিস্থিতি কী? শ্রেণী সংগ্রাম বাড়ছে, কিন্তু তা বিপ্লবী পর্যায়ে আসে নাই। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটি সঠিকভাবেই বলছে, যে অর্থনৈতিক সংকট আরো ঘনীভূত হচ্ছে, রাজনৈতিক সংকটের প্রাথমিক স্তর শুরু হয়েছে ও তা বাড়ছে, কিন্তু এখনও বিপ্লবী পর্যায়ে যেতে অনেক বাকী। অন্য সব কথা বাদ দিলেও সারা ভারতে জনগণের চেতনা ও সংগঠনের অবস্থা দেখা যাক। ভারতের বেশীর ভাগ স্থানেই কমিউনিস্ট শক্তি দুর্বল। একথা ঠিক যে ভারতের মত বিশাল দেশে সব স্থানের সমান পরিপক্কতা হতে পারে না এবং তার উপর সব কিছু নির্ভর করাও ঠিক নয়। কিন্তু একথাও ভুললেও চলবে না যে একটি দেশলাই কাঠি বৃক্ষহীন তৃণভূমিতে আগুন জ্বালাতে পারে, কিন্তু স্যাঁতসেঁতে জায়গায় পারে না। অন্য স্থানের কথা ছেড়ে দিলেও পশ্চিমবংগের অবস্থা দেখা যাক। কোন সন্দেহ নাই যে এখানে শ্রেণী সংগ্রাম অনেক বেশী তীব্র, কিন্তু এখানেও তার দুর্বলতা প্রকট। আজও শ্রমিকশ্রেণীর বেশীর ভাগ অংশ হয় বুর্জোয়া প্রভাবে, নয় তো অর্থনীতিবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে রয়েছে।

হঠকারীরা হয়ত বলতে চাইবেন যে শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজন নাই, গ্রামের গরিব কৃষকই বিপ্লব করবে। এ চিন্তাধারা চীন, ভিয়েতনাম বিপ্লবের শিক্ষার ব্যভিচার ছাড়া কিছু নয়। চীনের তুলনায় আমাদের দেশে শ্রমিকের সংখ্যা ও অবস্থিতি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হোল এই যে, শত্রুর সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে চীন-ভিয়েতনামে গ্রামে ঘাঁটি করে এগুতে হয়েছে ঠিকই এবং এ শিক্ষা নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে। কিন্তু চীনে শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক চেতনা ও সংগঠনের দিক দিয়ে মোটেই পিছিয়ে ছিল না, তারা অগ্রণীরই কাজ করেছে, তবে বিপ্লবের কৌশল হিসাবে শহরে—যেখানে শত্রুর সামরিক শক্তি কেন্দ্রীভূত, সেখানে সশস্ত্র প্রতিরোধের ভূমিকা তারা সঠিকভাবেই গ্রহণ করে নাই।

শ্রমিকশ্রেণীর কথা বাদ দিলেও দেখা যাবে, যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গরিব কৃষকদের চেতনা ও সংগঠন এখনও বেশ দুর্বল। দীর্ঘদিন সংস্কারবাদী প্রভাব থেকে এদিকে মার্কসবাদীরা তাদের দায়িত্ব পালন করে নাই। এই দুর্বলতা কাটানো শুরু হয়েছে। এখানে ভুললে চলবে না, যে এখনও বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির যথেষ্ট প্রভাব আছে। কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক জনসাধারণেরও চেতনার মান দেখতে হবে। পার্টি সমর্থন করছে বলেই তারা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত একথা মনে করা খুবই ভুল। এই যখন বাস্তব পরিস্থিতি তখন পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবী অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং গণতন্ত্রের সংগ্রাম অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর হয়ে গেছে, একথা মনে করার মত অর্বাচীন দায়িত্বজ্ঞানহীন ধারণা আর কিছুই হতে পারে না। একথা মনে করা ও প্রচার করার একমাত্র অর্থ হোল প্রতিক্রিয়াশীলদের কার্যত সাহায্য করা। পোস্টারদাতা অতি-বিপ্লবীরা ঠিক এই কাজই করছেন।

এরা স্থানে অস্থানে সময়ে অসময়ে কমরেড মাও সে-তুং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উদ্ধৃত করেন "বন্দুকের নলই হোল ক্ষমতার উৎস"। এরা এমনভাবে এটাকে ব্যবহার করেছেন, যেন শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ নয়, অস্ত্রই সব কিছু নির্ধারণ করে। কমরেড মাও সে-তুং যখন একথা বলেছিলেন, তখন চীনের জনসাধারণ সশস্ত্র প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নিযুক্ত। তখন জনগণ ও মুক্তি যোদ্ধাদের সংগে সম্পর্ক হয়ে উঠেছে জল ও মাছের সম্পর্কের মত। জনগণের রাজনৈতিক প্রস্তুতিকে ধরে নিয়েই তিনি সশস্ত্র সংগ্রাম সম্বন্ধে মার্কসবাদের একটি তত্ত্বকে তাঁর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এমনি পরিস্থিতিতে কমরেড লেনিন বলেছিলেন, "অস্ত্র, অস্ত্র, অস্ত্র," তাই বাস্তব পরিস্থিতি না দেখে, স্থান কাল বিবেচনা না করে কমরেড মাও সে-তুং-এর কথাকে অন্য অবস্থার প্রয়োগের ইংগিত করা মার্কসবাদের ব্যভিচার ছাড়া আর কিছু নয়।

আমি আগেই দেখিয়েছি কিভাবে অতি-বিপ্লবীদের বক্তব্য শাসকশ্রেণী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সাহায্য করছে। বিপ্লবী খোকামি ও হঠকারিতার এই পরিণতি হতে বাধ্য। আমি প্রথমেই বলেছি, যে এদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে আমি কিছু বলছি না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে এদের সংগঠকদের মধ্যে কি সন্দেহভাজন ব্যক্তি আছে যারা এক সময় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট কর্মীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিসের কাছে ওকালতি করেছে, পরে পার্টি হতে বিতাড়িত হয়ে অতি-বিপ্লবী হয়ে পড়েছে। আবার এমনও অনেক আছেন যাঁদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলার নাই, তাঁরা হলেন হঠকারী ঝোঁকের শিকার। এই ঝোঁক হল দেশের পেটি-বুর্জোয়া সুলভ অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান সংকটের মাঝে পেটি-বুর্জোয়া চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সুলভ নৈরাজ্য-

বাদের অভিব্যক্তি। পেটি-বুর্জোয়ারা হোল হয় মুসড়ে যাওয়া, নয় এখনই কিছু করা, হয় আত্মসমর্পণ, নয় আত্মহত্যা।

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে এর ক্ষেত্র আছে, যেমন ক্ষেত্র আছে সংশোধনবাদের। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নীতিগত ও সংগঠনগতভাবে সংশোধনবাদের মোকাবিলা করছে, কিন্তু তার প্রভাবের জের আজও রয়েছে। তেমনি পার্টির মধ্যবিত্ত প্রধান গঠন ও মার্কসবাদী জ্ঞানের দুর্বলতার ফলে হঠকারী ঝোঁকের ক্ষেত্র বেড়েছে। পার্টি হতে বিতাড়িত পার্টি বিরোধী চক্রটি খুব দুর্বল এবং তাদের প্রভাব সামান্য হলেও এই ঝোঁকের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় কমিটি ঠিকই বলেছে—যে সংশোধনবাদী ধ্যানধারণার ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করার সংগে সংগে এই ঝোঁকের বিরুদ্ধেও সচেতন হতে হবে। সংশোধনবাদ ও অতি-বিপ্লবীপনা—দুয়ের বিরুদ্ধে সতর্ক না হয়ে শ্রমিকশ্রেণী ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তাদের কর্তব্য সমাধার পথে এগুতে পারেন না।

পশ্চিমবংগের বাস্তব পরিস্থিতি আজ শ্রমিকশ্রেণী ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের সামনে যে আশু গুরু কর্তব্য উপস্থিত করেছে—তা হোল: প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম। যে গণতন্ত্রের পতাকা বুর্জোয়ারা ধুলায় ফেলে দিয়েছে, শ্রমিকশ্রেণীকে তাকে রক্ষা করতে হবে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমস্ত গণতান্ত্রিক শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হবে, শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর হবে, জনগণের চেতনা বাড়বে এবং ভবিষ্যতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধ পরিধি ভেঙে শ্রমিক নেতৃত্বে জনগণের ব্যাপকতম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মত অবস্থা সৃষ্টি হবে।

এই গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামের আশু দাবী হোল মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন। সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি প্রধান কথা হোল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার। প্রতিক্রিয়াশীলেরা এই ভোটাধিকারের চেয়ে বর্তমান কলুষিত বিধান সভাকে বড় করে দেখাতে চায়। কিন্তু বোঝা প্রয়োজন যে শ্রেণী সংগ্রামের ধাক্কায় কিছু বিশ্বাসঘাতক ক্ষমতা লোভীর নিকৃষ্ট বেইমানীর ফলে নির্বাচিত বিধান সভা তার বিপরীতে পরিণত হয়ে গেছে। বর্তমান আইন সভা প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যাভিচার মাত্র। তাই যেতে হবে জনসাধারণের কাছে, সীমাবদ্ধ হলেও প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের কাছে। সেই জন্যই মধ্যবর্তী-কালীন নির্বাচনের দাবি প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করেছে। মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন সব সমস্যার সমাধান করে দেবে না, কিন্তু প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তিকে শক্তিশালী করবে।

—নন্দন, মাঘ, ১৯৬৭

২০ সুন্দরবনের কথা

পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণার দক্ষিণ দিকে সুন্দরবন ও তার আশপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কিছু খবর দৈনিক কাগজের পাতায় পড়ে আমরা সহরবাসীরা বিস্ময় বোধ করছি—কোন এক জায়গায় মাছের ভেড়িকে কে বা কারা দখল করে নিয়েছে, কখনো বা লুট করে নিয়েছে। আমরা শুধু বিস্ময় নয় দুশ্চিন্তায় শংকিত বোধ করছি—সাধারণ এই সব চরিত্র মানুষের পরিশ্রমলব্ধ ফল যদি এই রকম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির যদি ন্যূনতম নিরাপত্তাটুকু না থাকে তা'হলে আমরা বাঁচবো কী করে ? যুগগত আশংকা ও বিস্ময়ের মাঝে একটা উৎসুক্যও সময়ে সময়ে উঁকি মারছে,—এসব কেন হচ্ছে ? কারা করছে ?

সহরের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা গ্রামীণ জীবন থেকে এত বিচ্ছিন্ন, তার সরাসরি সম্পর্ক এতই ক্ষীণ যে সেখানকার জটিলতা তার কাছে অজানা। সুতরাং, উৎসুক মন জবাব খুঁজে পায় না, মন থেকে আশংকা ও ভীতিও যায় না। কিন্তু, আমরা যদি একবার মনোযোগ দিয়ে এ'দিকে চোখ মেলে তাকাই তা'হলে এ'সবের অর্থ খানিকটা খুঁজে পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের পশ্চিমে হুগলী ও পূর্বে মেঘনা নদীর মাঝখানে বাংলাদেশের বিখ্যাত সুন্দরবন অঞ্চল। বংগ বিভাগের ফলে সুন্দরবনের অধিকাংশ অঞ্চল বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে যা অবশিষ্ট তা কোন জায়গাতেই ৫০ মাইলের বেশী নয়। দক্ষিণে সমুদ্রের লবণাক্ত জলের ঝাপটা আর নদীগুলির মন্থর গতি এই অঞ্চলে একটা লবণাক্ত কাদামাটির জায়গায় পরিণত করেছে।

কৃষি কার্যের জন্য দুর্গম জংগল পরিষ্কার করা এ অঞ্চলে আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দির প্রায় সূচনায়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে প্রশাসন বিভাগ এই উদ্দেশ্যে ইজারা দিয়ে জমি বিলি করেন। প্রারম্ভেই জমির মালিকরা তাদের অধিকৃত জমির সীমানা বাড়িয়ে বন্যাঞ্চলের অনেকটাই দখল করে নেয়—যে অঞ্চল আইন সংগতভাবে কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, তা প্রত্যেকেরই। জরীপ বিভাগের অষ্টাদশ শতাব্দির বিখ্যাত রেনেল্ল মানচিত্রে তা আঁকা হয়ে আছে। তারপর উনবিংশ শতাব্দির গোড়ায় লেঃ হদেশের মানচিত্রে দেখা যায় উক্ত অঞ্চলগুলিকে বিভিন্ন ব্লকে জরীপ বিভাগ

বিভক্ত করেছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে লট বা "লাট"। সুন্দরবনে এই লাট জমির ইজারা নেওয়া থেকেই লাটদারী প্রথার উৎপত্তি।

বহু বছর ধরে বাইরের বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রমিক আনিয়ে কৃষি কার্যের জন্য জংগল সাফ করা ছাড়াও মৎস্যচাষ আরম্ভ হয় লাভজনক বাণিজ্য হিসাবে, প্রাকৃতিক কারণেই অতি সহজেই মাছের ঝাঁক সমুদ্রের খাড়ি দিয়ে প্রবেশ করত ভিতর দিকে। জায়গাটিকে ঘিরে ফেললেই একটি ভেড়িতে তা রূপান্তরিত হয়ে যায়। সেই মাছ সহরের চাহিদাকে মেটাতে যদি সরবরাহ করা যায় তা'হলে তা অত্যন্ত লাভজনক। লাটের মালিকরা লবণাক্ত জলাশয়কে বাঁধ দিয়ে ঘিরে মৎস্যচাষ আরম্ভ করল, এমন সময় এই জলাশয়কে বিস্তীর্ণ করার উদ্দেশ্যে বাঁধ কেটে প্রজাদের খাজনা দেওয়া জমিও লবণাক্ত জলে ডুবিয়ে দিত—এমন নজির সরকারী দলিল দস্তাবেজে অঢেল পাওয়া যায়। ধানচাষ থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা ভূমিহীন খেত মজুরে পরিণত হোত। সুন্দরবনে ভেড়ির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হোল এই।

সুন্দরবনের আরও একটু উত্তরে ধাপা-সোনারপুর-লবণহ্রদ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যে ব্যাপক মৎস্যচাষ প্রচলিত আছে তারও ইতিহাস অতি প্রাচীন।

১৮৬৫ সালে লবণহ্রদ পুনরুদ্ধার সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উদ্ধার করা জমি ইজারা দেওয়া আরম্ভ হয় মৎস্যচাষ ও কৃষি কার্যের জন্য লবণ হ্রদ নামেই বোঝা যায় যে, সমুদ্রের জল এ অঞ্চল প্রবেশ করত। এই অঞ্চল দিয়ে সমুদ্রাভিমুখী প্রবাহমান বিদ্যাধরী নদীই ছিল লবণাক্ত জল প্রবেশের রাস্তা। কালের গতিতে আবর্জনা নিক্ষেপের ফলে স্বল্পশক্তি ও অ-গভীর বিদ্যাধরী মজে যাওয়ার ফলে লবণহ্রদের সংগে সমুদ্রের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বৃষ্টির জল পেয়ে জায়গাটা হলো মিঠে জলে খন্ড খন্ড জলাশয়—সেখানে ভালোই মৎস্যচাষ হতে পারে। কী সুন্দরবন অঞ্চল, কী এই সব অঞ্চল জমির মালিকরা বা ইজারাদারীরা প্রকৃত মৎস্যজীবীদের নিকট থেকে প্রাপ্য খাজনার অতিরিক্ত কর আদায় করতেন, তার নজীর সরকারী পুঁথিপত্রের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে।

মৎস্যচাষের জন্য আরও একটি অভিনব উপায়ে জমির তথা ভেড়ির মালিকরা সর্ব সাধারণের সম্পত্তি প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছিলেন। প্রাকৃতিক কারণে নদী যখন কোথায়ও বাঁক নিয়ে পাশ্ববর্তী অঞ্চল দিয়ে চলে গেছে তখন বাঁকের গোড়ায় বাঁধ দিয়ে নদী থেকে বিচ্ছিন্ন করে জায়গাটিকে ব্যক্তিগত ভেড়িতে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

কোম্পানির শাসনের দাক্ষিণ্যে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে

জমিদাররা বিনা পরিশ্রমে প্রকৃত উৎপাদনকে সর্বস্বান্ত করে নিশ্চিন্ত মনে খাজনা আদায় করে দিন যাপন করছিলেন। তার ওপর প্রথম আঘাত এল ১৯৫৫ সালে ১৫ই এপ্রিল তারিখে, যে দিন মধ্যসত্বভোগী জমিদারের অধিকার বিলুপ্ত করে রায়তের সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করা হোল নতুন জমিদারী বিলোপ আইনের মাধ্যমে। উক্ত আইনে বলা হোল—২৫ একর চাষের জমি নিজের অধিকৃত রাখার পর বাকী উদ্বৃত্ত জমি সরকারের হাতে বর্তাবে এবং তা ভূমিহীন কৃষক অথবা ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে বিলি করা হবে। উক্ত আইনের আরও বলা হোল—মাছের ভেড়ির জমির কোন সীমা থাকবে না।

আইনের এই ছাড়ের সুযোগ জমিদাররা গ্রহণ করলেন এক অভিনব উপায়ে। বাস্তব জীবন থেকেই এর নজির পাওয়া যাবে।

ধরা যাক সোনারপুর অঞ্চলের কোন এক জমিদার তাঁর জমির হিসাব সরকারের কাছে দাখিল করার সময় জানালেন—তাঁর কম বেশী ২০০ একর জমিতে ভেড়ি আছে যেখানে মৎস্য চাষ হয়। ফলে সরকার তা হাত দিলেন না। বহু দিন পর সরজমিনে অনুসন্ধানে দেখা গেল, কম বেশী মাত্র ৩৬ একর জমিতে ভেড়ি আছে—বাকীটা উৎকৃষ্ট ধানের জমি, যাকে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় সালি জমি। অনুসন্ধানে জানা গেল এটাও কোন দিনই মৎস্য চাষ ছিল না।

উপরোক্ত নজির গেল আইনকে ফাঁকি দেওয়ার উদাহরণ। কিন্তু, একেবারে বল প্রয়োগে কৃষক উৎখাত করে সম্পূর্ণ অপরের জমি নিজের দখলে নিয়ে আসার ঘটনাও আছে। চলে আসা যাক ২৪ পরগণার আর এক অঞ্চলে, ধরা যাক জয়নগর। প্রজা ও তার উপ-প্রজার সংখ্যা মিলে সর্বসাকুল্যে প্রায় ৫০ জন কৃষক প্রায় ৩০০ একরের কাছাকাছি জমিতে ধানচাষে নিযুক্ত। কোন এক ভদ্রলোক সুদূর বারুইপুর অঞ্চল থেকে এলেন যিনি জয়নগর থানার কেউ নয়, সেখানে তার কোনও সম্পত্তিও নেই। তিনি জোর করে সেই জমি দখল করলেন. প্রজা উৎখাত করে মাটির বাঁধ দিয়ে জায়গাটিকে ঘিরে ফেলে সেই ধানি জমিকে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত ভেড়িতে রূপান্তরিত করলেন।

আজ ২৪ পরগণা জেলাতে এই আলোড়ন নিবদ্ধ বলে আমাদের সমস্ত দৃষ্টি আজ সেদিকে নিবদ্ধ। কিন্তু সারা বাংলা দেশ জুড়ে এ বছর অসংখ্য উদাহরণ ছড়িয়ে আছে সেখানে জমির সম্পত্তি নিজের পরিশ্রমে অর্জিত হয় নি। —কৃষক উৎখাত করে, সর্ব সাধারণের সম্পত্তি প্রাকৃতিক সম্পদকে দখল করে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মধ্যবঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলায় চলে আসুন। ভাগীরথীর গতি পরিবর্তনের ফলে কোন এক জায়গায় বিলের

সৃষ্টি হয়েছে। কোন এক প্রাচীন জমিদার সে তাকে দখল করে ভেড়িতে রূপান্তরিত করেছেন, পরে তা ধানি জমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

সরকার যখন এই সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে দখলীকৃত জমি উদ্ধারের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত, তখন প্রকৃত উৎপাদক ভূমিহীন বা উৎখাত কৃষক সম্প্রদায়ের সাহায্য গ্রহণ অনিবার্য। সেই লুক্কায়িত জমির সন্ধানে তাঁরাই হলেন সবচেয়ে যোগ্য অনুসন্ধানকারী। তাঁরাই সমবেতভাবে এই জমি দখল করে চাষ করছেন। এই হচ্ছে তথাকথিত ভেড়ি দখল ও জবরদখলের ইতিহাস ও মর্ম কথা। এ কাজ বে-আইনী বা আইনী তা বিচার সাপেক্ষ। কিন্তু, জমিদারী আইনকে সম্পূর্ণ লংঘণ করা সন্দেহাতীতভাবে বে-আইনী। কৃষক তথা প্রকৃত উৎপাদকের এ জমিতে সত্ত্বের দাবী যে ন্যায় সংগত তা স্বীকার না করা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র।

এ কথা দিনের আলোর মত স্পষ্ট যে ভেড়ি দখলকে কেন্দ্র করে বিক্ষুব্ধ কৃষি সমাজে যে আলোড়ন তা অন্যায় লুটপাট নয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ নয়, দরিদ্র রায়তের তার ন্যায্য সম্পত্তির উপর অধিকার পুনরুদ্ধারের অভিব্যক্তি। বহু যুগ বঞ্চনার দায়ে তা কখনো মাত্রারিক্ত। কিন্তু, মূল সত্য তাতে মিলিয়ে যাবে না বা যাচ্ছে না।

—১৯৬৯ সাল।

২১ কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার স্মরণে

কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার-এর প্রতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ

আমাদের প্রিয় কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার আর আমাদের মধ্যে নাই। ১৯১৫ সালের ৫ই আগস্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৪ সালের ২৩শে জুলাই মাত্র ৫৯ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটেছে। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ ভ্রান্ত এবং একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকবর্তীকাই সমগ্র বিশ্বের পদ-দলিত মানুষের মুক্তির পথকে আলোকিত করতে পারে বলে যাঁর দৃঢ় প্রত্যয় এসেছিল, সেই বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

তাঁর জীবন ছিল সম্পূর্ণ আত্মত্যাগের জীবন—স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রতি উৎসর্গিত।

১৯৩০ সালে, অতি তরুণ বয়সে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। পরে, ১৯৩২ সালে বৃটিশ সরকারকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণের জন্য তিনি দণ্ডিত হন এবং আন্দামানের সেলুলার জেলে তাঁকে পাঠানো হয়।

আন্দামানে কারাবাসকালেই কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার সাম্যবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং জেলে কমিউনিস্ট কনসলিডেশনের সদস্য হন।

দেশব্যাপী শক্তিশালী আন্দোলনের ফলে বৃটিশ সরকার আন্দামান বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হলে, ১৯৩৮ সালে মুক্তি লাভের পর কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার বিপ্লবী আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভা গঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

তিনি অনেক বৎসর যাবত সারা ভারত কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কৃষক ও খেতমজুরদের পক্ষে এবং জমিদারদের শোষণের বিষাক্ত চরিত্র উদঘাটনের বলিষ্ঠতায় তাঁর শানিত কন্ঠ যেমন ধ্বনিত হয়েছে পশ্চিমবংগ বিধানসভার চত্বরে, তেমনি হয়েছে সারা দেশেও।

১৯৬৭ সালে এবং আবার ১৯৬৯ সালে যে কয় মাস তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন, সেই স্বল্পকালীন সময়ে,

সীমাবদ্ধ ভূমি সংস্কারের কাজটিও যে কিভাবে করা যেতে পারে, তার একমাত্র পথটি—যেমন আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর না করে কৃষক ও খেতমজুরদের সংগঠিত করে তাদের নিজেদের দ্বারাই ভূমি সংস্কার কার্যকরী করা—তিনি তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

সংশোধনবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য রূপে শেষ পর্যন্ত যাঁরা কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৯৫৯-৬২ সালে চীন-ভারত বিরোধে যাঁরা নেতৃত্বের আধিপত্যকারী অংশের নগ্ন সংকীর্ণ-জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের সামনের সারিতে। ঘটনার পরিণতিতে যখন এই পার্টিতে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল তখন পার্টি ত্যাগ করতে তিনি কোন দ্বিধা করেন নি এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। পার্টির অভ্যন্তরে যখন বাম-সংকীর্ণতাবাদ উগ্র আকারে তা প্রকাশ পেল, তখন তিনি সেই ঝোঁকের বিরুদ্ধে ও পার্টির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতির স্বপক্ষে সংগ্রাম করেন এবং পার্টির ঐক্য ও শক্তিকে সংহত করেন।

যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই বহু বিষয়ে স্বচ্ছন্দ-চারনায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতায় বিস্মিত হয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা, শ্রোতাদের তিনি মুগ্ধ করে রাখতে পারতেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ বিতার্কিক, লেখক, পার্টি সংগঠক এবং জনগণের নেতা। ১৯৪৮ সালে পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হলে, তিনি গ্রেপ্তার এড়িয়ে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত গোপনে থেকে পার্টি ও গণ-সংগ্রামের কাজকর্ম সংগঠিত করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সভাগুলিতে তাঁর অবদান ছিল মহান।

সারা জীবন তিনি কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রাণ দিয়ে কাজ করে গেছেন। বিপ্লবের বর্তমান স্তরে এই কাজটিতেই আমাদের পার্টিকে বিশেষভাবে শক্তি নিয়োগ করতে হচ্ছে।

বৃটিশ ও কংগ্রেস—উভয় সরকারের আমলেই তাঁকে দীর্ঘকাল কারাগারে কাটাতে হয়েছে। দীর্ঘ কারাবাস ও গোপন জীবন যাপনের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তা সত্ত্বেও যে উৎসাহ নিয়ে তিনি পার্টির স্বাভাবিক কাজকর্ম পরিচালনা করতেন, তা যে কোন যুবকেরও ঈর্ষার বিষয় হতে পারত।

কেন্দ্রীয় কমিটি এই মহান বিপ্লবীর সম্মানে পার্টির রক্ত পতাকা অবনমিত করেছে। তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটি জানাচ্ছে অন্তরের সুগভীর সমবেদনা।